চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র

ভবতোষ দত্ত

জিজ্ঞাসা
কলিকাতা ২৯ ॥ কলিকাতা ৯

দ্বিতীয় সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৬৮, এপ্রিল ১৯৬১

প্রকাশক : শ্রীশকুমার কুণ্ড
জিজ্ঞাসা
১৩৩এ, রাসবিহারী এভিনিউ । কলিকাতা ২৯
১এ ও ৩৩, কলেজ রো । কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর : শ্রীসুনীলকৃষ্ণ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস
১২১, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট । কলিকাতা ৪

উৎসর্গ

আমার অধ্যাপক

মোহিতলাল মজুমদার

স্মরণে

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ :

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-রচিত কবিজীবনী

কাব্যবাণী

বঙ্কিমচন্দ্র-রচিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব

মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ

(আজহার উদ্দিন খান-সহযোগে)

মোহিতলালের শ্রেষ্ঠ কবিতা

ভূ মি কা

দশ বৎসরের ব্যবধানকে কোনো বইয়ের পুনঃপ্রকাশের পক্ষে নিশ্চয়ই অল্প বলা চলে না। তবু এ-বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা আমাকে উৎসাহিত করেছে, ব্যক্তিগত কারণে যত-না, অন্যবিধ কারণে তার চেয়েও বেশি।

বঙ্কিমচন্দ্র ঔপন্যাসিক রূপে সর্বজনস্মরণীয় পুরুষ। কিন্তু তাঁর বিপুল প্রবন্ধরাজি, তাঁর দার্শনিক তত্ত্ব-সমন্বিত 'ধর্মতত্ত্ব', অসাধারণ পরিশ্রমসিদ্ধ 'কৃষ্ণচরিত্র'-গ্রন্থ কিংবা তাঁর অসামান্য গীতার ব্যাখ্যা নিয়ে এখনও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিস্তৃত অনুসন্ধান ও বিচারের প্রয়োজন আছে। বঙ্কিম-মনীষার এই দিক্‌টিকে প্রায় উপেক্ষিতই বলা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তার মূল্য সম্বন্ধে যে উল্লেখ ও আলোচনা মাঝে মাঝে আজকাল হয়ে থাকে, সে-সবই সাময়িক কালের ভাবাবেগ-চালিত সৌখীন সিদ্ধান্ত মাত্র। এ কালের সংস্কারমুক্ত বিশ্বতোমুখী চেতনায় বঙ্কিমী আদর্শ দূরাপসারিত হয়ে গেছে বলে প্রগতিবাদী বিদগ্ধজন মনে করে থাকেন। বঙ্কিমের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাবসম্পদ দেশাত্মবোধ ;-এ-ও এখন সংকীর্ণ বলে উপহসিত। তাঁর ধর্মব্যাখ্যাও একালে কারো কারো কাছে পণ্ডশ্রম রূপে গণ্য। বঙ্কিমের দীর্ঘ চিন্তা, গভীর অধ্যয়ন এবং যুক্তিবদ্ধ ব্যাখ্যা যে আমাদের কাছে ঔদাসীন্য দ্বারাই পুরস্কৃত হচ্ছে তা নয়, একালের কোনো কোনো জাতীয় দুর্ভাগ্যের জন্যও বঙ্কিমকে দায়ী করা হয়ে থাকে!

এটা দুঃখের বিষয় বলেই মনে করি। কারণ জাতি- ও সমাজ-গঠনে বঙ্কিমের জীবনব্যাপী চিন্তা ও নিরলস প্রয়াসের ইতিহাস ও তথ্যের বিশ্লেষণ তেমন হয় নি। বঙ্কিম যে-যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন, সে-যুগে ধর্মকে বাদ দিয়ে কেউ কোনো চিন্তা করে নি, করা হয়তো সম্ভবও ছিল না। বঙ্কিম তাঁর হিন্দুধর্মের অর্থপরিধিকে কতখানি বিস্তারিত করে বিশ্বদিগন্তের কাছাকাছি পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন, এই পরিপ্রেক্ষিকাতে তাঁকে দেখাই যথার্থ দেখা। বঙ্কিম যে-মানবধর্মের কল্পনা করেছেন সে-ধর্ম পরবর্তীকালের রবীন্দ্রকল্পিত মানবধর্ম থেকে ভিন্ন ধরনের বটে, কিন্তু মানবতার যে-লোকগ্রাহ্য সংজ্ঞা তিনি দিয়েছিলেন, তার উপরেই দাঁড়িয়ে আছে আমাদের জীবনবোধ। হিন্দু বা মুসলমান বলে বিভেদসৃষ্টি জাতিগঠনের দিক্ দিয়ে নিরতিশয় হানিকর। বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুর শাস্ত্র-পুরাণের দিক দিয়ে জীবনসত্যের পর্যালোচনা করেছিলেন, সে-কথাও সত্য। মুসলমান-সমাজের পক্ষে কোনো প্রত্যয় স্থাপনের অধিকার তাঁর

ছিল না। তিনি যদি হিন্দু-সমাজকে আধুনিক কালের জায়মান ভারতীয় জাতীয়তার মহত্তর চেতনায় চেতনাবান্ হতে প্রণোদিত করে থাকেন, তবে সেখানেই তাঁর প্রয়াসের সার্থকতা। রামমোহন বা বিদ্যাসাগর কেউই হিন্দু-সমাজের বাইরে অন্যতর সমাজের সংস্কারের জন্য আন্দোলন করেন নি। তাঁদের অধিকারসীমা তাঁরা জানতেন। প্রশ্ন এই হতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্র সত্যই কি হিন্দুকে উদার হতে শিক্ষা দিয়েছেন? এটা বোঝবার উপায় তাঁর ধর্মতত্ত্বের তত্ত্বগুলিকে বিশ্লেষণ করে দেখা। ধর্মকে তিনি জাতীয়তাবোধে প্রযুক্ত করেছেন। ফলে অনেকেরই ধারণা: তাঁর জাতীয়তা 'হিন্দু জাতীয়তা'। এ-কথাও সম্পূর্ণ সত্য কিনা সন্দেহ। তৎকালীন মুসলমান-সমাজের শিক্ষা ও উদ্যমের ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা হিন্দু-সমাজের জাগ্রত জাতীয় চেতনার সঙ্গে সমপদক্ষেপে চলতে পারে নি। এ-ক্ষেত্রে বঙ্কিমের চিন্তার ত্রুটি যদি কোনো দিক্ দিয়ে থেকেও থাকে, তথাপি আধুনিক জাতীয়তাবাদ-সৃষ্টিতে তাঁর সাধু অভিপ্রায়কে বুঝতে না-চাওয়া আমাদেরই অক্ষমতা মাত্র। কারণ আর যাই হক বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস বুঝতেন না এ-অপবাদ বিশ্বাস করা অসম্ভব। ইতিহাসের রাজপথ প্রসারিত হয়ে গিয়েছে ভবিষ্যৎ-দিগন্তে, সেখানে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানেরও যাত্রা। এদেশে আর কোনোদিনই মুসলমান-বর্জিত হিন্দুভারত সম্ভব নয়। তাই জাতি বলতে একালে আর সাম্প্রদায়িক জাতিকে বোঝাবে না, বোঝাবে একটি ভৌগোলিক সীমায় বসবাসকারী সহমর্মী জনগোষ্ঠীকে। এই আধুনিক অর্থে 'জাতি' কথাটির স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রই।

তবু যে ইতিহাস-বিধাতার বিধানে ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে মুসলমান-প্রধান এবং হিন্দুপ্রধান দুটি বাঙালী জাতিসত্তা গড়ে উঠল তারই বা ব্যাখ্যা কী? বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা এর জন্য কতখানি দায়ী? এখানেও বঙ্কিমচন্দ্রের একটি অনুপম উপলব্ধির ইশারা পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রই আমাদের মধ্যে বাঙালী জাতিসত্তাবোধের জাগরণ ঘটান—সেটা সংকীর্ণতাদুষ্ট ছিল না। তার প্রমাণ ভারত-ইতিহাস এবং ভারত-সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালী জাতীয়তার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। বাঙালী সর্বভারতীয় সংস্কৃতিরই উত্তরসাধক। এই ঐতিহ্যগর্বকেও কেউ কেউ বঙ্কিমচন্দ্রের পশ্চাৎমুখিনতা বলে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এ কথা কী করে অস্বীকার্য যে উনিশ শতকে জাতীয়তাবোধের উৎস ছিল ঐতিহ্যচেতনাতেই? সেই জন্যই বাঙালী জাতীয়তা কখনও ভারতীয় জাতীয়তা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় নি।

কিন্তু স্বতন্ত্র বাঙ্গালী জাতীয়তা ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে অধুনা বাংলাদেশ নামে অভিহিত ভূখণ্ডে। বঙ্কিমচন্দ্র 'বাঙ্গালার কলঙ্ক' প্রবন্ধে গঙ্গারাষ্ট্র (গাঙ্গারিডি) নামে চিহ্নিত করেছেন যে-অঞ্চলকে, সে-অঞ্চল একালে রাঢ় নামে পরিচিত। এই

রাঢ়ের সঙ্গেই অনায়াস-যোগ ছিল উড়িষ্যা, বিহার ও অন্যান্য ভারতীয় অঞ্চলের। সে তুলনায় পদ্মা-পারবর্তী অঞ্চল দূরবর্তী এবং দুর্গম। স্বভাবতই সেই অংশের মুসলমান-প্রধান জনগোষ্ঠী ভাষাবন্ধনে যত ঐক্যবদ্ধ হল তার ঐতিহ্যবোধ তত সমৃদ্ধ হল না। ঐতিহ্যগর্ব করতে গেলে তাদের তাকাতে হত আরব এবং পারশ্যেরই দিকে। সেটা এতই সুদূরের এবং অপরিচিত যে সে-দিকে না তাকিয়ে—এমন কি পশ্চিম পাকিস্তানের মুখাপেক্ষী না থেকে সেই জনসমাজ ভাষার অবলম্বনেই স্বতন্ত্র জাতীয়তার সৃষ্টি করে তুলেছে। বাংলা ভাষাই হয়ে দাঁড়াল তাদের সবচেয়ে বড়ো মমতার বিষয়। যে-বাঙালী চেতনাকে বঙ্কিম জাগিয়ে তুলেছিলেন সেই চেতনা সেখানে বেগবান্ হয়ে উঠেছে ধর্মান্ধতায় নয়, ভাষাগর্বে। আজ এ-কথা স্মরণ করবার দিন এসেছে। এই প্রসঙ্গে আমার একটি লেখার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। লেখাটির নাম 'বাঙালি জাতীয়তা' (রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৬ জানুয়ারি ১৯৭২)।

হয়তো মনে হবে, এ-চিন্তা নেহাৎই আত্মপ্রসাদ মাত্র, বাস্তবসম্মত নয়। কারণ বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে মুসলমান-সমাজ এখনও দ্বিধামুক্ত হন নি। কিন্তু ইতিহাসের পটভূমিতে বঙ্কিমের অভিপ্রায় ও কল্পনাকে যথাযোগ্য বিচার করে দেখা সম্ভব একদিন হবেই, কারণ তাঁর চিন্তা ছিল ঐক্যসন্ধানী। এই ঐক্যই—বঙ্কিমের নিজস্ব তাত্ত্বিক ভাষায়, 'সামঞ্জস্য',— তাঁর আধুনিক জীবন-চেতনারই মর্মকথা। জ্ঞানে বিজ্ঞানে সাহিত্যে রাষ্ট্রে— সর্বক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যে 'সত্যের আহ্বান' জানিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের মনোলোকেই তার সূচনা দেখা দিয়েছিল বলেই রবীন্দ্রনাথ একদিন বলেছিলেন—

'বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজি শিক্ষার পরিণত শক্তিকেই রূপ দিতে প্রবৃত্ত হলেন বাংলা ভাষায় বঙ্গদর্শন মাসিক পত্রে। বস্তুত নবযুগপ্রবর্তক প্রতিভাবানের সাধনায় ভারতবর্ষে সবপ্রথম বাংলা দেশেই য়ুরোপীয় সংস্কৃতির ফসল ভাবিকালের প্রত্যাশা নিয়ে দেখা দিয়েছিল, বিদেশ থেকে আনীত পণ্য আকারে নয়, স্বদেশের ভূমিতে উৎপন্ন শস্যসম্পদের মতো।'

—ছাত্রসম্ভাষণ, ৫ ফাল্গুন, ১৩৪৩

আমার এই বই বঙ্কিম-মনীষার আধুনিক রূপটিকে আবিষ্কার করবার চেষ্টাতেই রচিত। এ কালেও তাঁর বাণীর সার্থকতা যদি অনেক ক্ষেত্রেই অনুভব না করতাম তাহলে হয়তো এ বই লেখাই হত না। আশা করি এর বিভিন্ন অধ্যায়ে পাঠক তার পরিচয় পাবেন।

এই সংস্করণে 'বঙ্কিমচন্দ্র ও সংস্কৃত সাহিত্য', 'বঙ্কিমচন্দ্রের দেশধ্যান' এবং 'কমলাকান্তের ভাবনা'—এই তিনটি নতুন অধ্যায় সংযুক্ত হল। উল্লেখ করা প্রয়োজন, প্রথম প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত জনার্দন চক্রবর্তী-সম্পাদিত 'রাধাগোবিন্দ নাথ-স্মারক গ্রন্থে'র জন্য লিখিত হয়েছিল। পূর্ব-সংস্করণের অন্যান্য প্রবন্ধের কোনো কোনোটি এতে পরিমার্জিত হয়েছে, বিশেষ ভাবে 'বঙ্কিমচন্দ্র ও ভারত-সংস্কৃতি' এবং 'বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচিন্তা' প্রবন্ধ দুটি। শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিতব্য 'শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-স্মারক গ্রন্থে' মল্লিখিত 'বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যতত্ত্ব' প্রবন্ধটিও এই প্রসঙ্গে পঠিতব্য। আমার এই গ্রন্থ অনেকদূর মুদ্রিত হয়ে যাওয়ার পর আমার শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমলেন্দু বসু মহাশয়ের একটি প্রবন্ধ আমার দৃষ্টিতে আসে। এই মূল্যবান্ প্রবন্ধটির নাম 'The Wind from the East': Response of Some English Poets to the 'Gita'. বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন-তত্ত্ব আলোচনার সূত্রে এই প্রবন্ধের বক্তব্য বিচিত্র ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করে। আমার কৌতূহলের উত্তরে অধ্যাপক মহাশয় আমাকে একখানি দীর্ঘ পত্রও লিখেছিলেন ম্যাথু আরনলডের সঙ্গে ভগবদ্‌গীতার পরিচয়ের প্রমাণ বিশদ করে। এ জন্য তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

এই বইয়ের প্রবন্ধগুলি 'বিশ্বভারতী পত্রিকা' 'এক্ষণ' 'দেশ' 'বিশ্ববাণী' 'সাহিত্যের খবর'-এ প্রকাশিত হয়ে সুধীজনের সানুরাগ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এ জন্য পত্রিকার সম্পাদক এবং পাঠকগণের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। বর্তমান সংস্করণের উল্লেখ-সূচী প্রস্তুত করার কাজে আমাকে সাহায্য করেছেন শ্রীমতী গার্গী দত্ত এবং আমার কল্যাণীয়া কন্যাদ্বয় শ্রীমতী কারুবাকী এবং শ্রীমতী বিপাশা। নানা সাফল্য-বেদনার আলোছায়ায় পরিকীর্ণ বাঙালী সংসারে এই নিবিড় আকর্ষণের স্নিগ্ধ মাধুর্যই নিশ্চিত সান্ত্বনা, তার শান্তি।

ভবতোষ দত্ত

সূচী

বঙ্কিম-মনীষার উন্মেষ

যাত্রীর মশাল চাই রাত্রির তিমির হানিবারে,
সুপ্তি-শয্যাপার্শ্বে দীপ বাতাসে নিভিছে বারেবারে।

—রবীন্দ্রনাথ

১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র যখন কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করেছেন তখন বাংলার একটা যুগও শেষ হয়েছে। রামমোহন তাঁর আধুনিক চিন্তাধারাকে দেশে ছড়িয়ে দিয়েছেন, নব্যবঙ্গের দল তার সূত্র তুলে নিয়ে ইংরেজি শিক্ষা এবং যুক্তি দিয়ে আমাদের পুরনো জীর্ণ সমাজের সমালোচনা করেছে। আর ধর্মসভা চেষ্টা করেছে সেই সমাজকে অটুট রাখতে। তত্ত্ববোধিনী সভা এদিকে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে যাচ্ছিল—জাতীয় মর্যাদা রক্ষা করে ধর্মসংস্কার করতে. কিন্তু নানা দ্বন্দ্ব সংশয়ে প্রথমে স্থির আদর্শে পৌছতে পারছিল না; অবশেষে অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের যুক্তিবোধের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে ব্রাহ্মধর্মের ধ্রুব লক্ষ্য প্রস্তুত হয়ে উঠল। রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাংলায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনার সূত্রপাত করেছেন বিবিধার্থসংগ্রহে, আর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ধীর গম্ভীর সংযত ভাষায় তত্ত্বালোচনার আদর্শ স্থাপন করেছে। ডিরোজিওর শিষ্যরাও সমাজকল্যাণমূলক আদর্শে তাদের যুক্তিকে প্রয়োগ করতে আরম্ভ করেছে। এ সবই ঘটেছে বঙ্কিমের ছাত্রাবস্থায়। বিদ্যালয়ে তিনি যখন উচ্চতর শ্রেণীতে পড়ছেন সেই সময় শিক্ষা নিয়েও নানা আলোচনা চলছে; হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত হয়েছে; শিক্ষাবিভাগ স্থাপিত হয়েছে; লর্ড ডালহৌসী শিক্ষা সম্বন্ধে পরিকল্পনা পাঠালেন ১৮৫৪ সালে; জন স্টুয়ার্ট মিলও ভারতবর্ষের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে মন্তব্য পাঠালেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হল এবং বঙ্কিমচন্দ্র সেখান থেকে প্রথম বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। এই সময়ে কলকাতার সমাজে নতুন চিন্তা কী ভাবে রূপ নিচ্ছিল তার বর্ণনা করেছেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়[১]—

'ফলতঃ ভারতবর্ষীয় এবং তত্ত্ববোধিনী সভার আনুপূর্বিক ক্রমে কার্য পর্যালোচনা করিলে সুস্পষ্টরূপেই প্রতীত হয় যে যতদিন তত্ত্ববোধিনী সভা বল প্রকাশ করিতে না পারিয়াছিলেন, তাবৎকাল ভারতবর্ষীয় সভাও আপন প্রকৃত কার্যে অভিনিবিষ্ট হইতে পারেন নাই। কিন্তু হার্ডিঞ্জ সাহেবের অধিকার কালের মধ্যেই এই উভয় কার্য

১ ভূদেব মুখোপাধ্যায়, 'বাংলার ইতিহাস' তৃতীয় অধ্যায়।

সুসম্পন্ন হইয়া উঠিল। তত্ত্ববোধিনী সভা নব্যদলের ধর্মপ্রণালী সংস্থাপিত করিলেন এবং একজন সুবিজ্ঞ বাঙালী (রামগোপাল ঘোষ) ভারতবর্ষীয় সমাজের সভাপতি হইয়া রাজকার্য বিষয়ে সভার স্থির দৃষ্টি জন্মাইলেন। সচরাচর অনেকেই বলিয়া থাকেন যে এই দেশীয় লোকেরা স্বয়ংসিদ্ধ হইয়া কোন কার্যই করিতে পারেন না, আর ইহারা যাহা করিতে পারেন তাহাও অপরের অনুকৃতি মাত্র হয়। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম এবং ভারতবর্ষীয় সমাজ এই দুইটিই অপরের সহায়তা অথবা অনুকৃতির ফল নহে। ঐ দুই সভার দ্বারাই হিন্দু সমাজের ভাবী পরিবর্তন সমূহের বীজ উপ্ত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় মিসনারিদের সহিত অনুক্ষণ সংঘর্ষে হিন্দু সমাজে যে ধর্ম সম্বন্ধে ও আচার সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসার উদ্রেক হইয়া ব্রাহ্মধর্মের আবির্ভাব হয়, তাহার ফলেই সনাতন হিন্দুর ধর্ম ও হিন্দু আচার সম্বন্ধে সাধারণ লোকের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞানের উন্মেষ হইতেছে। হিন্দুয়ানী যে কোন প্রকার সংস্কার বা উন্নতির বিরোধী নহে তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়া যাইতেছে।'

এই শেষের কথাটি মূল্যবান্। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রতিষ্ঠিত ধর্মসভার সঙ্গে ওই শতাব্দীর শেষের দিকের হিন্দুধর্মের পুনর্গঠনের পার্থক্য কোথায় ছিল, এতে সেটাই বোঝা যাচ্ছে। ধর্মসভা কোনোরকম সংস্কারেরই প্রয়োজন বোধ করে নি। ঈশ্বর গুপ্তের মতো ব্যক্তিও একসময়ে ধর্মসভার উৎসাহী সভ্য থেকে পরে তত্ত্ববোধিনী সভার সংস্পর্শে এসে উদারতর ধর্মচিন্তার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। স্বাধীন চিন্তা দিয়ে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলেও নেহাৎই অনুভূতি দিয়ে ধর্মবিষয়ক কবিতায় এই প্রয়োজনবোধকে তিনি প্রতিফলিত করেছিলেন[১]—

লোকাচারে দেশাচারে জাতিপ্রথা ব্যবহারে,
নাহি হয় সত্যের প্রকাশ।
সত্যের হইলে দাস, এ সকল হয় নাশ
সমাজেতে করে উপহাস ॥
সমাজেতে যদি রই সত্য সভা ছাড়া হই
তোমা ছাড়া হতে তবে হয়।
সত্য আর লোকাচার আলো আর অন্ধকার
একাধারে কেমনেতে রয়?

সংবাদপ্রভাকরের সম্পাদকীয় প্রবন্ধেও ঈশ্বর গুপ্ত মন্তব্য করেছিলেন[২]—

'সে সময়ে প্রতিযোগি পক্ষের উন্নতির উচ্ছেদ করণের মানসে অনেক ধনাঢ্য ও

১ পারমার্থিক ও নৈতিক কবিতা, 'তত্ত্ব'

২ সংবাদপ্রভাকর মঙ্গলবার ১৬ই মে ১৮৪৮।

দলপতিবর্গ পরস্পর স্থির প্রতিজ্ঞায় দলবদ্ধ করত একত্র হইয়া ধর্মসভা স্থাপিত করেন কিন্তু জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য ইচ্ছা সত্যের কি নির্মল প্রতিভা, দলাধ্যক্ষ মহাশয়েরা যে অভিপ্রায়ে সভা করিয়া দ্বেষানলে দগ্ধ হইলেন সে ব্যাপারে কৃতকার্য হইতে পারিলেন না, "ধর্ম্ম" আপনি আপনার রক্ষক হইয়া তাঁহাদিগের মর্ম্মভেদ ও শর্ম্মচ্ছেদ করিলেন।'

ঈশ্বর গুপ্ত সাধারণ বাঙালী সমাজেরই প্রতিনিধিস্থানীয় ছিলেন। রক্ষণশীল ঈশ্বর গুপ্তের মত-পরিবর্তন বাঙালীর চিন্তাধারার পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে।[১] বঙ্কিমচন্দ্র তখন হুগলী কলেজের ছাত্র। কলকাতার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ ছিল সংবাদপ্রভাকর পত্রিকার মারফৎ। তখনও বঙ্কিমের চিন্তাশক্তি জাগে নি কিন্তু বালকের শিক্ষা এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে গড়ে তুলতে যারা সাহায্য করছিল, সংবাদপ্রভাকর তাদের অন্যতম ছিল নিশ্চয়ই। তিনি এই পত্রিকায় শুধু যে কবিতাই পাঠাতেন তা নয়, কবি ঈশ্বর গুপ্তের উপদেশ এবং অন্তরঙ্গতাতেও তিনি মুগ্ধ ছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের রুচি তিনি সমর্থন করতে না পারলেও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার অভাব বঙ্কিমের কোনোদিনই ঘটে নি। বঙ্কিম চন্দ্রের মৃত্যুর দু'তিন বছর আগে তিনি কাঁচড়াপাড়ায় ঈশ্বর গুপ্তের বাড়ী একবার জন্মের মত দেখতে গিয়েছিলেন বলে শোনা যায়।[২]

সংবাদপ্রভাকর ছাড়া কলকাতার বিদ্বৎসমাজের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের আর কোনো যোগসূত্র ছিল কিনা সন্দেহ। এই সময় তিনি অনন্যচিত্তে অধ্যয়নে নিমগ্ন। তখনকার কলেজের পাঠ্যতালিকায় প্রধানত ছিল নীতিশাস্ত্র, ভূগোল, গণিত এবং ইংরেজি সাহিত্য। বি-এ পরীক্ষায় তিনি পড়েছিলেন ইংরেজি-গ্রীক-ল্যাটিন, সংস্কৃত-বাংলা-হিন্দী-উড়িয়া, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত-পদার্থবিদ্যা, দর্শন, প্রাণিতত্ত্ব। বঙ্কিমচন্দ্র আগাগোড়াই সাহিত্য এবং ইতিহাসের অনুরাগী ছিলেন। ইতিহাসানুরক্তির কথা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিশেষ করেই উল্লেখ করে গিয়েছেন।[৩] কাব্যের চেয়ে ইতিহাসেই তাঁর সখ ছিল বেশি। বিশেষ করে ইউরোপের ইতিহাস তাঁর খুব ভালো পড়া ছিল। রেনার্শাসের ইতিহাস নাকি তিনি খুব ভালো করেই আয়ত্ত করেছিলেন। তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল, য়ুরোপীয় রেনার্শাসের প্রকৃতির অনুসরণে বাংলারও নবজাগরণ ঘটুক। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর এই সংবাদ যদি সত্য হয়, তবে বলতে হবে বঙ্কিমচন্দ্র সমসাময়িক বাংলার গতিপ্রকৃতির সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। এর জন্য তাঁর ইতিহাসের দূরত্বের

১ এ বিষয়ে বিস্তৃততর আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-রচিত কবিজীবনী', ১৯৫৮ অবতারণা পৃ ৪০-৫২ এবং মৎসম্পাদিত 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব ১৯৬৯।

২ শচীশ চট্টোপাধ্যায়, 'বঙ্কিম-জীবনী' পৃ ৯৫।

৩ বঙ্কিম-প্রসঙ্গ পৃ ১৫৮।

প্রয়োজন হয় নি। ইতিহাস সম্বন্ধে এই ঔৎসুক্য যে নবীন জাগ্রত মনের লক্ষণ তাতে সন্দেহ নেই। বস্তুত ধর্মসংস্কার বা নৈতিক সংস্কারের চিন্তার চেয়েও যেন ইতিহাসকে জানাই তাঁর প্রথম কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি যখন খুলনায়, তখন তিনি কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য হন, ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সভ্য ছিলেন। বঙ্কিমের রচনায় তথ্যসংকলন এবং গবেষণাধর্মিতার যে লক্ষণ আছে তার দৃঢ় ভিত্তি তিনি যত্ন সহকারেই প্রস্তুত করেছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের মুসলমান ও ইংরাজ রাজত্বের ইতিহাস যথাসাধ্য তো পড়েছিলেনই, উপন্যাসেই শুধু যে তিনি এই জ্ঞান কাজে লাগিয়েছিলেন তা নয়, ইতিহাসবোধ তাঁর যুক্তিনিষ্ঠা, কার্যকারণের ধারাবাহিকতা এবং জীবনের প্রত্যক্ষ তথ্যকে স্পষ্ট সুবিন্যস্তরূপে আয়ত্ত করার মতো ধীশক্তিকে প্রস্তুত করেছিল। হিন্দু কলেজের প্রথম যুগের ছাত্ররা ইংরেজি শিক্ষা পেয়ে ইতিহাস দর্শন এবং কাব্যের দিকেই ঝুঁকেছিলেন। এর মধ্যে তাঁদের শিক্ষা এবং রুচিকে নতুন ছাঁচে গড়ে দিয়েছিল ইতিহাস। ইতিহাসের অনুক্রমকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েই তারা তত্ত্বের আলোচনা করেছেন। প্রাচীন এবং নবীনের স্বরূপকে নির্ধারিত করেছেন ইতিহাস-জ্ঞান দিয়েই। তখনও তাঁদের কোনো স্থায়ী জীবনদর্শন গড়ে ওঠে নি বলে প্রাকৃতিক নিয়মের মতো ইতিহাসের নীতিই ছিল তাদের একমাত্র নীতি। সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভায় আলোচিত বিষয়ের মধ্যে ইতিহাসের প্রাধান্য দেখলে এ কথাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। এই আধুনিক প্রবৃত্তি বঙ্কিমচন্দ্রের পিপাসু মনকে আচ্ছন্ন করেছিল।

কিন্তু নব্যবঙ্গের ইতিহাসানুরাগের সঙ্গে তাঁর পার্থক্যও ছিল। নব্যবঙ্গের মনস্বী যুবকেরা ইতিহাসের জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে নিজের সমাজে পরিবর্তন আনতে উৎসুক হয়েছিলেন—নানা নৈতিক সংস্কারে তাঁদের উৎসাহের অন্ত ছিল না। এই উৎসাহের পিছনে অনুকরণস্পৃহা, আবার তার সঙ্গে মানবিক প্রেরণাও হয়তো ছিল। দীর্ঘকাল বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর চার পাশের পরিবর্তনের মধ্যে নিরপেক্ষ দর্শকের মতোই ছিলেন। সভ্যতা ও সংস্কৃতির গতিপ্রকৃতি তিনি বিচার করেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটি উৎকণ্ঠা তাঁর চিত্তকে করেছে মথিত। তিনি নিজেই বলেছেন[১]—

'অতি তরুণ অবস্থা হইতে আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত—'এ জীবন লইয়া কি করিব?' সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার লোক-প্রচলিত উত্তর পাইয়াছি; তাহার সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য অনেক ভোগ ভুগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি। যথাসাধ্য

১ ধর্মতত্ত্ব, ১১ অধ্যায়

পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি, অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছি এবং কর্মক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি। সাহিত্য বিজ্ঞান ইতিহাস দর্শন দেশী বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি।'

এই ক্ষুধা একটা উচ্চতর অভাববোধ থেকেই উৎপন্ন। এ রকম অভাববোধ ধর্মসাধকদের মধ্যে এক এক সময়ে দেখা দেয় বলে শোনা যায়। কিন্তু সেই অর্থে বঙ্কিম ধর্মসাধক ছিলেন না। তিনি পরিপূর্ণ গৃহী ছিলেন, জীবনের রস ও সৌন্দর্য তিনি উপভোগ করেছেন। সে জীবন অধ্যাত্ম-জীবন নয়। প্রেম ও কাম, লোভ ও ঈর্ষায় ফেনিল মানবহৃদয়ের সুধারস তিনি উপন্যাসের পাত্রে পরম অনুরাগের সঙ্গে পরিবেশন করেছেন। 'কমলাকান্তের দপ্তর' এর 'পতঙ্গ'-প্রবন্ধটি পড়লে বেশ বোঝা যায়, জীবন বলতে তিনি কি বোঝেন। ধর্মসাধকদের কাউকে কাউকে তিনি চোখের সামনেই দেখেছিলেন ; কিন্তু তাঁদের সাধনা তাঁকে সম্পূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারে নি। তিনি প্রবৃত্তির ধ্বংস বা নিরোধ চান নি ; এমন একটা অর্থ খুঁজেছেন যা জীবনকে অবিকৃত রেখেও ঊর্ধ্বায়িত করে।

বঙ্গদর্শন প্রকাশের পূর্বে তিনখানি বাংলা উপন্যাস এবং একখানি ইংরেজি উপন্যাস ছাড়া তাঁর আর কোনো লিখিত উপকরণ নেই যার থেকে বঙ্কিমের মনীষার উপক্রমণিকাটি পড়ে নিতে পারি। তার জীবনের যে কয়েকটি বিবরণ পাওয়া যায় তার থেকে এ রকম ধারণাই হয় যে বাল্যকালে সংবাদপ্রভাকরে কয়েকটি লেখা দেবার পর বাংলা লেখা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। তিনি এই সময় ইংরেজি সাহিত্যই পড়তেন। কারণ পাঠযোগ্য বাংলা বই তখন বিশেষ ছিল না। তখনকার সাহিত্যের পরিবেশের আলোচনা বঙ্কিমচন্দ্র করেছিলেন দুটি প্রবন্ধে, A Popular Literature of Bengal[১] এবং Bengali Literature[২]। সংস্কৃতপন্থী এবং ইংরেজিপন্থী এই দুই শ্রেণীর লেখকদের মধ্যে স্বভাবতই দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকদের উপরেই তাঁর ভরসা ছিল, যদিও বাংলা লেখা সম্বন্ধে সাধারণত এদের অনেকেরই অবজ্ঞা ছিল অপরিসীম। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে ইংরেজির ভক্ত ছিলেন। তাঁর যা জিজ্ঞাস্য, ইংরেজি জ্ঞান থেকেই তার উত্তর খুঁজতেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার বিকাশ ও বলিষ্ঠতা, জটিলতা ও বৈচিত্র্য তাঁকে আকৃষ্ট করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন নারীসুলভ লালিত্যের ফলে বাঙালী চিত্ত দীর্ঘকাল মেরুদণ্ড হারিয়েছে। কোনো বলিষ্ঠ সত্যের উপলব্ধি কবিদের ছিল না। কবিরাই তো উচ্চতর জীবনসত্যের মহিমায় মানবজীবনকে আশীর্বাদে পরিণত করতে পারেন। কিন্তু দীর্ঘ

১ Transaction of the Social Science Association, 1870

২ *Calcutta Review* 1871

মধ্যযুগে সে সত্য কোথায় হারিয়েছে! বঙ্কিমচন্দ্র বলছেন, দুটি বস্তু মাত্র এর মধ্যে বাঙালী মনীষাকে সমৃদ্ধ করেছে—স্মৃতি এবং ন্যায়। নব্যন্যায়ের আলোচনা বাঙালীর মাতৃভাষায় যদি হত তা হলে বাঙালী চেতনা কত সবলই না হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু নব্যন্যায় সংস্কৃত ভাষাতেই থাকল পণ্ডিত-সভায় বদ্ধ আর স্মৃতি বাঙালীকে টেনে নিয়ে গেল আচারের জটিল জালে[১]।

বঙ্কিম সাহিত্যের সঙ্গে খুঁজেছেন মনীষাকে। তাঁর নিজের মধ্যে যে সত্যজিজ্ঞাসা জেগেছিল, তার জন্য অনেক বিচিত্র ধরণের বই তিনি পড়েছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম দর্শন। কলেজের শিক্ষায় ইংরেজি দর্শনে তাঁর জ্ঞান লাভ হয়েছিল। সিনিয়র পরীক্ষায় তিনি খুব সম্ভব মিলের লজিক এবং রীডের Inquiry পড়েছেন। দর্শনের ইতিহাসে Scottish School নামে পরিচিত হ্যামিলটন, ডুগাল্ড স্টুয়ার্ট এবং রীড নব্যবঙ্গেরও দার্শনিক ছিলেন। এই দর্শন নব্যবঙ্গকে যে প্রকৃতির মননক্রিয়ায় দীক্ষিত করেছিল, বঙ্কিমও তাতেই দীক্ষিত হয়েছিলেন। বিশুদ্ধ যুক্তিবাদ এবং পর্যবেক্ষণ, আরোহ-রীতিতে যা লভ্য বঙ্কিমচন্দ্র তাকে আয়ত্ত করেছিলেন। ধ্যানগম্য বা প্রত্যয়সিদ্ধ উপলব্ধিতে (Intuition) তাঁর আস্থা ছিল না। কালীনাথ দত্ত লিখেছেন[২]—

'বঙ্কিমবাবুর এতগুলি সদ্‌গুণ সত্ত্বেও তাঁহার জীবনে ঈশ্বর বিশ্বাসের অভাবে আমার বড় কষ্ট হইত। আমি থিওডোর পার্কারের 'Ten Sermons' নামক পুস্তকখানি তাঁহাকে পড়িতে দিলাম। তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন এবং সপ্তাহান্তে তাহা আমাকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন 'Such worst English I have never read.', আমি পার্কারের লেখার ও ইংরেজির খুব ভক্ত ছিলাম। তাঁহার হেয়জ্ঞানসূচক মন্তব্যে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলাম।'

১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র The Study of Hindu Philosophy[৩] নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাতে তিনি বলেন পাশ্চাত্য দেশে সভ্যতার একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ দেখতে পাই আর ভারতবর্ষে দেখতে পাই মনীষার এমন একটি ধারা যাতে শিক্ষণীয় অনেক কিছু আছে কিন্তু সে-ধারা রুদ্ধগতি ও ক্ষয়িষ্ণু। এখনো টোলে দর্শন শিক্ষার ব্যবস্থা আছে কিন্তু সে শিক্ষা অনুর্বর নিষ্ফল। হিন্দু দর্শনকে দুভাবে পড়া যেতে পারে—শুধুই

১ **English Works,** ***A Popular Literature of Bengal.***

২ বঙ্কিম-প্রসঙ্গ পৃ ২২০। বঙ্কিমচন্দ্র পার্কার এবং নিউম্যান পড়েন সম্ভবত ১৮৬৪-৬৬ তে বারুইপুর-ডায়মণ্ডহারবারে থাকাকালে। ১৮৭৪-এ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'বিড়াল' প্রবন্ধে ব্যঙ্গোক্তি—'তুমি যদি চাহ, তবে পাঠার্থ তোমাকে আমি নিউমান ও পার্কারের গ্রন্থ দিতে পারি।'

৩ ***Mookerjee's Magazine*** **1873 May**

তত্ত্বের জন্য অথবা ভারতীয় ইতিহাসের গতিকে বোঝার জন্য। যে চিন্তা জাতীয় সমাজের পরিবর্তনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করেছে, সেটাই জানা এখন আমাদের দরকার হয়ে পড়েছে। নিছক তত্ত্বের জন্য হিন্দু-দর্শন পড়ার দরকার আছে বলে মনে হয় না। আজকের দেশীয় পণ্ডিতদের মধ্যে মৌলিক চিন্তার বড়ই অভাব। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের পদ্ধতি অনুসরণ করেই দুঃসাহসভরে আমাদের আরো এগিয়ে যেতে হবে। বঙ্কিমচন্দ্র যখন এই কথাগুলি লিখছেন তখন বঙ্গদর্শনের বিভিন্ন প্রবন্ধে আধুনিক পদ্ধতিতে ইতিহাস এবং তত্ত্বজিজ্ঞাসা পরিবেশিত হচ্ছে। বঙ্কিম তখন নব্যবঙ্গের মতই সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদী।

কিন্তু নিছক বস্তুজিজ্ঞাসা তাঁকে তৃপ্তি দিতে পারে নি যদিও প্রাকৃতিক নিয়মের জ্ঞানের অবলম্বনও তিনি কখনও বর্জন করেন নি। পাশ্চাত্য দর্শন তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি নির্মাণ করেছিল সত্য কিন্তু পরে তিনি সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনের প্রতিও আকৃষ্ট হয়েছিলেন। অবশ্য কলেজে সংস্কৃত না পড়লেও পরে ভাটপাড়ার শ্রীরাম শিরোমণির কাছে রঘুবংশ কুমারসম্ভব মেঘদূত শকুন্তলা পড়েছিলেন। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখে-ছিলেন, পিতার উপদেশে এবং সংস্কৃত বই পড়ে তাঁর মনে ধর্মভাবের উদ্রেক হয়। মাতামহ সেকালে সংস্কৃত শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তার দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত গ্রন্থের সংগ্রহ তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে দিয়েছিলেন। তার মধ্যে জ্যোতিষ তন্ত্র প্রভৃতি প্রায় সব রকমের বই ছিল। পূর্ণচন্দ্র অবশ্য বলেছেন, এই শিক্ষার ফলেই নাকি বঙ্কিম শশধর তর্কচূড়ামণির উপদেশে আকৃষ্ট হন নি। কথাটা ঠিক নয় বলেই মনে হয়। কারণ বঙ্কিম যে হিন্দুধর্মের কল্পনা করেছিলেন তার মধ্যে প্রথম যুগের ইতিহাস-চেতনা এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিচয় মিশে সে ধর্মকে স্বতন্ত্র এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করে তুলে-ছিল। প্রথম যুগের পাশ্চাত্য শাস্ত্র এবং পরে সংস্কৃত সাহিত্য পাঠ তাঁর তরুণ বয়সের জীবনজিজ্ঞাসার উত্তর-সন্ধানে সাহায্য করেছে। দুই সভ্যতার দুই চিন্তাসম্পদে তাঁর মনীষাও পূর্ণতা লাভ করেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যজীবনে সমাজের অবস্থাও বিবেচ্য। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে জুলাই মাসে বঙ্কিমচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলেন। তার আগে সিনিয়র শ্রেণীতে তিনি হুগলী কলেজে পড়েছেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষা এবং ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে বি-এ পরীক্ষা দিলেন। বি-এ পরীক্ষা পাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হয়ে যশোহর চলে যান। তারপর থেকে তাঁকে মেদিনীপুর খুলনা বারুইপুর মুর্শিদাবাদ বারাসত হুগলী হাবড়া বারাসত যাজপুর ভদ্রক প্রভৃতি স্থানে চাকরী উপলক্ষে ঘুরে বেড়াতে হয়। মাঝখানে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের এ্যাসিসটাণ্ট সেক্রেটারীরূপে অস্থায়ী

ভাবে কয়েক মাস কাজ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যকর্ম প্রাধানত মফস্বলেই হয়েছিল। সেকালে কলকাতায় যে-সব আন্দোলন চলেছে তার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ কিছু ছিল না। তাঁর রচনার মধ্যে সমসাময়িক সামাজিক আন্দোলনের উল্লেখ অথবা মন্তব্য বিরল। তাঁর প্রবন্ধে সাংবাদিকতার লক্ষণ নেই। মানুষের যে ভাবনা নিত্যকার তাই বঙ্কিমকে অধিকার করেছিল। মূল শাস্ত্রের সঙ্গে পরিচয়ের সাহায্যে তাকে পরীক্ষা করে দেখেছেন। এ জন্য মনে হতে পারে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ বইঘেঁষা। অবশ্য ইংরেজিতে যাকে scholarly ও বাংলায় যাকে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বলে, সে-আলোচনা বই-ঘেঁষাই হয়ে থাকে। সাংবাদিকতাধর্মী না হওয়াই তার গুণ। অনেকেই যখন সম্প্রদায়-গঠনে ব্যস্ত কিংবা সমাজ-সংস্কারে মনোযোগী বঙ্কিমচন্দ্র তখন মনুষ্যত্বের ধ্রুব আদর্শ-সন্ধানে নিরত। বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয়বান্ বলিষ্ঠ মানুষ জীবনের কর্তব্য স্বাধীনভাবেই নির্ণয় করে নিতে পারে, সেই জন্যই যেন মনুষ্যত্বের মূল উপাদানগুলি কি, তিনি তারই সন্ধান করছিলেন। তিনি কর্মী পুরুষ ছিলেন না, তিনি ছিলেন চিন্তাশীল মনীষী।

ইতিহাস ইত্যাদি পড়ে মানুষের সভ্যতার গতি-প্রকৃতি যেমন তিনি বোঝবার চেষ্টা করেছিলেন তেমনি তাঁর সময়ের বাংলা দেশের নানা আন্দোলন ও পরিবর্তনের মধ্যে অভাব ও পূর্ণতাকেও দেখতে পেয়েছিলেন। বঙ্কিম যখন হুগলী কলেজের ছাত্র তখনই একটা সামাজিক বিপ্লব ঘটতে দেখলেন। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে বিধবা-বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হয়। সেই বৎসরেই বিধবা-বিবাহের অনুষ্ঠানও হয়। তারপরেই সিপাহী যুদ্ধ। এই যুদ্ধের তরঙ্গ কলকাতায় এসে পৌঁছে নি বটে কিন্তু এই নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলেছে। বাঙালী ভদ্রলোকেরা ইংরেজদের পক্ষেই ছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত সিপাহী যুদ্ধকে বিদ্রূপ করে কবিতা লিখেছেন। রঙ্গলালও ইংরেজ রাজত্বের স্থায়িত্ব কামনা করে-ছেন[১]। কিশোরীচাঁদ মিত্র ইংরেজদের সমর্থনে বই লিখেছেন[২] এবং এ রকমের আরও দৃষ্টান্ত আছে। ঈশ্বর গুপ্ত সিপাহীদের বিদ্রূপ করলেও বিদেশের ঠাকুর ফেলে স্বদেশের কুকুরকে স্নেহ করতে বলেছিলেন। দেশপ্রাণতার এই দ্বৈধরূপ বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাতেও আছে। কিন্তু বঙ্কিমের মনীষায় সে আর দ্বিধারূপে ছিল না—একটা সুসঙ্গত ব্যাখ্যায় পরিণত হয়েছে। পরবর্তীকালে এই ব্যাখ্যা খুব স্বাভাবিক ও সঙ্গত হয়ে গিয়েছে। জাতীয়তার উদ্‌গাতা রবীন্দ্রনাথও পাশ্চাত্য ও ভারতবর্ষের নিবিড় সহ-

১ 'পদ্মিনী উপাখ্যান'-এর উপসংহার অংশ দ্রষ্টব্য।

২ কিশোরীচাঁদ মিত্রের বইয়ের নাম *The Mutinies, the Government and the People*, 1858. 'By a Hindu' নামে প্রকাশিত।

যোগিতাতেই কল্যাণের পূর্ণ রূপ দেখতে পেয়েছিলেন। সিপাহী যুদ্ধের সময় বঙ্কিম ছাত্র, কিন্তু ইংরেজদের জয়ে তাঁর কোনো সন্দেহ ছিল না।[১]।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র যখন খুলনায় তখন একটা বড়ো ঘটনায় তিনি জড়িয়ে পড়লেন। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হিন্দু প্যাট্রিয়টে নীলকরদের সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখে বাংলা দেশে নতুন চেতনার উদ্বোধন করলেন। হরিশচন্দ্র সিপাহী-বিদ্রোহের সময় ইংরেজদের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন কিন্তু নীল-আন্দোলনের সময় তিনি নীলকরদের বিরুদ্ধে ইণ্ডিগো কমিশনের নিকট সাক্ষ্য দিলেন। সেই বছরেই ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পন' প্রকাশিত হল। এদিকে বঙ্কিমচন্দ্র খুলনাতে এক নীল হাঙ্গামার তদন্তের ভার পেলেন। নীলকরদের উৎপীড়ন সম্পর্কেও তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞান হল। এ বিষয়ে বঙ্কিমের কোনো মন্তব্য আমার চোখে পড়ে নি। কিন্তু আর কিছু না হোক, জাতীয় আত্মমর্যাদাবোধ এবং বাঙালীর বাহুবল—এই দুই দিক সম্বন্ধেই তিনি সচেতন হতে আরম্ভ করেছিলেন, অনুমান করা যায়। তাঁর অনেক উপন্যাসেই বাঙালী জমিদারের কীর্তিকলাপ এবং লাঠিয়ালদের মারামারির চিত্র আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পরিবার জমিদার ছিল না, তাঁর পিতা রাজকার্যই করেছেন। সুতরাং তাঁর উপন্যাসে যুদ্ধবিগ্রহের যে খণ্ডচিত্র পাওয়া যায় তা অনেকটাই এই সময়ের চাকরী-জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই নেওয়া, তাতে সন্দেহ নেই। অবশ্য এটাও ঠিক যে বঙ্কিমচন্দ্র যদি তাঁর চারপাশে শুধু চাকরীজীবী বাঙালীদেরই দেখতেন তবে বাঙালীদের সম্পর্কে তাঁর আশা ও গৌরববোধ ততখানি গড়ে উঠত কিনা বলা যায় না। শুধুই বাংলার প্রাচীন ইতিহাস তাঁকে কতখানি অনুপ্রাণিত করেছিল বলা কঠিন। স্কুল-বা কলেজপাঠ্য ইতিহাস তাঁকে ততখানি তৃপ্তি দেয় নি। অকুণ্ঠভাবে প্রশংসা করতে পেরেছেন বাংলা দেশের এমন ইতিহাস তিনি পেয়েছেন অনেক পরে। সে বইখানি ছিল রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রথম শিক্ষা বাংলার ইতিহাস'।

নীল আন্দোলন তাঁর মনে যে জাতীয় আত্মমর্যাদাবোধের উদ্রেক করে থাকবে তার পরিপোষণ অন্যভাবেও হচ্ছিল। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র যখন বারুইপুরে, রাজনারায়ণ বসু সেই সময়ে 'জাতীয় গৌরবেচ্ছাসঞ্চারিণী সভাস্থাপনের প্রস্তাব' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তারই দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে নবগোপাল মিত্র ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দের ১২ই এপ্রিল আশুতোষ দেবের বেলগাছিয়ার ভিলায় চৈত্রমেলার অয়োজন করলেন। দেশানুরাগ জাগিয়ে তুলবার উদ্দেশ্যে জাতীয় শিল্পপ্রদর্শনী, দেশীয় খেলাধূলা, ব্যায়াম, জাতীয় সঙ্গীত, কবিতাপাঠ ইত্যাদির আয়োজন হয়। এই হিন্দুমেলাতেই ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে

১ শচীশ চট্টোপাধ্যায়, 'বঙ্কিম-জীবনী' পৃ ১০৫-৬

রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দুমেলার উপহার' নামে কবিতা প্রথম পড়েন। হিন্দুমেলার আয়োজন দেশে যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার করেছিল। বিভিন্ন কাগজেও এর বিবরণ বেরিয়েছিল। বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর ইংরেজিতে লেখা আত্মচরিতে এ সময়ের জাতীয়তাবোধের ক্রমজাগরণের ইতিহাস দিয়েছেন। বঙ্কিম-সাহিত্যে জাতীয়তাবোধের উদ্বোধনের সঙ্গে এই দেশব্যাপী নবচেতনাও যুক্ত। শুধু ইংরেজবিতাড়ন বা জাতিবৈরই জাতীয়তার জাগরণ ঘটায় নি। নিজের ধর্ম দেশ সমাজ সম্পর্কে গৌরববোধ নানাভাবেই দেখা দিয়েছে। দেবেন্দ্রনাথ খ্রীস্টধর্মান্তরণের বিরুদ্ধে যে আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন, সেখান থেকেই নিজের ধর্ম সম্বন্ধে একটা আত্মমর্যাদাবোধ জেগে উঠেছে। তারপর কেশবচন্দ্রের সহযোগিতায় ধর্মান্দোলনের মধ্যে দিয়ে এই মর্যাদাবোধ বৃদ্ধি পেতে থাকে। উচ্চতর ধর্ম লাভ করবার জন্য কিংবা উচ্চতর নীতির-জন্য বিদেশের আদর্শ বরণ করবার দরকার নেই, এই বোধ অনেকটাই আশা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল, বিপিনচন্দ্রের স্মৃতিকথায় তার বর্ণনা আছে। কেশবচন্দ্র অবশ্য খ্রীস্টধর্মের প্রভাব একটু বেশি করেই স্বীকার করেছিলেন এবং সেই তুলনায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী স্বাদেশিকতার অনু-প্রেরণাকে অনেক বেশি উজ্জীবিত রেখেছিল। রাজনারায়ণ বসু এবং নবগোপাল মিত্র দুজনেই আদি ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ও নেতৃস্থানীয় ছিলেন। হিন্দুমেলার সঙ্গেও ঠাকুর-পরিবারের যোগ ছিল খুবই বেশি।

বঙ্কিম যখন বাইরে বাইরে কাটাচ্ছেন, কলকাতায় তখন কেশবচন্দ্রের প্রেরণায় নানা সংস্কারান্দোলন আরম্ভ হয়েছে। কেশবচন্দ্র বঙ্কিমের সমবয়সী, প্রেসিডেন্সি কলেজে ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে আইনবিভাগে দুজনে সহপাঠী ছিলেন। কালীনাথ দত্তের বিবরণেই জানা যায়[১]—

'নববিধান-প্রবর্তক মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনকে বঙ্কিমবাবু একজন প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি (genius) মনে করিতেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়নের সময় দুইজনে এক শ্রেণীতে পড়িতেন। কলেজ ছাড়িয়া কেশবচন্দ্র অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার অসাধারণ বক্তৃতাশক্তির জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রেই দেশবিখ্যাত হইয়া পড়েন। আমি তখন বারুইপুরে অল্পদিন মাত্র বঙ্কিমবাবুর অধীন আছি। যখন তাঁহার 'দুর্গেশনন্দিনী' আলোকের মুখদর্শন পর্যন্ত করে নাই—যখন তাঁহার যশঃসূর্যের অরুণোদয়ের লেশমাত্রও পরিদৃশ্যমান হয় নাই, সেই সময় কলিকাতার কোনস্থলে একদিন কেশববাবুর সঙ্গে বঙ্কিম-বাবুর সাক্ষাৎ হইলে বঙ্কিমচন্দ্র কেশবচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেন "I wish to know how far you have outgone me." এ কথা কেশববাবুর নিজ মুখেই শুনিয়াছি।'

১ বঙ্কিম-প্রসঙ্গ পৃ ২৩৭

কেশবচন্দ্রের সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রদ্ধা বরাবরই ছিল। ধর্মতত্ত্বে বঙ্কিমচন্দ্র কেশবচন্দ্রকে 'শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের গুণভূষিত' বলে উল্লেখ করেছেন। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র সমসাময়িক সনাতন হিন্দুধর্মান্দোলন সম্পর্কে ততখানি উৎসাহ প্রকাশ করেন নি, যতখানি ব্রাহ্মধর্মান্দোলন সম্বন্ধে করেছেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তো বন্ধু ছিলেনই, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতেও তাঁর যাতায়াত ছিল। বাংলা সাহিত্যের উন্নতির জন্য তিনি এঁদের কাছে অকুণ্ঠ ঋণ স্বীকার করেছেন। রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' পুস্তকের সমালোচনা করতে গিয়ে বিনয়সহকারেই নিরাকার উপাসনার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেছিলেন যদিও বলেছিলেন শুধু নিরাকার উপাসনাই হিন্দু ধর্ম নয়। সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য হচ্ছে, শিকাগো ধর্মসম্মেলন শেষ করে স্বামী বিবেকানন্দ এবং প্রতাপচন্দ্র মজুমদার যখন ফিরলেন তখন বঙ্কিমচন্দ্র প্রতাপচন্দ্রের জন্যই বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছিলেন[১]।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের যোগাযোগের কোনো নিদর্শন বিশেষ পাওয়া যায় না। পরমহংসদেবের সঙ্গে তাঁর একবার সাক্ষাৎ হয়েছিল বলে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে উল্লেখ আছে। কিন্তু দুজনের মধ্যে মতসাম্য কিছুই হয় নি। মানুষের কর্তব্য কি হওয়া উচিত, এ বিষয়ে পরমহংসদেব বঙ্কিমচন্দ্রের মত জিজ্ঞাসা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র উত্তরে জৈবক্রিয়াগুলিরই উল্লেখ করেছিলেন বলে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা প্রকাশ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই ধর্মসাধকের আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ উপদেশ শুনে নীরবেই চলে এসেছিলেন। এই শ্রেণীর ভাবধর্মে আকৃষ্ট হওয়ার মতো মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন না। যুক্তিধর্মের উপর তাঁর অটল আস্থা ছিল। কেশবচন্দ্রকে প্রতিভাশালী বলে মনে করলেও, পার্কারের বই যেমন তাঁর ভালো লাগে নি, কেশবের উন্মাদনাও তাঁকে স্পর্শ করে নি। প্রত্যাদেশসিদ্ধ সহজজ্ঞানের ধর্মপ্রচার শেষ করে কেশব মৃত্যু বরণ করলে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে কঠোর যুক্তিবাদিতার উপর ধর্মবোধকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। এটা ঠিক প্রতিক্রিয়া নয়, কারণ বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমাবধি যুক্তি-আশ্রয়ী ছিলেন, তবু কেশবের ধর্মালোচনার ভাষা ও ভঙ্গি তাঁর মনে কিছুই ছায়া ফেলল না, এর মূলে কিছু সচেতনতা হয়তো ছিল। যুক্তিবাদিতার প্রতি প্রবণতা ছিল বলে হয় তো শশধর তর্কচূড়ামণির সম্বন্ধেও কিছু ভরসা তিনি করতে গিয়েছিলেন কিন্তু এরকম অচল হাস্যকর যুক্তি তাঁকে অবিলম্বেই মোহমুক্ত করল। বঙ্কিমচন্দ্র তর্কচূড়ামণির মত গ্রহণ না করলেও বঙ্কিমের সাহিত্যানুচর চন্দ্রনাথ বসু শশধরপন্থী হয়ে গিয়েছিলেন।

১ 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ' পৃ ২৩৫। প্রতাপচন্দ্রের Oriental Christ গ্রন্থের প্রশংসা আছে ধর্মতত্ত্ব, ১৯-অধ্যায়ে।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বা কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের[১] সঙ্গে যেমন তাঁর যোগ ছিল না, থিয়সফি আন্দোলনের সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল না। বরং পজিটিভিস্ট যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ীতে আসতেন। বিখ্যাত *Letters on Hinduism* বঙ্কিম তাঁকেই লিখেছিলেন। তখন দেশে কিছু কিছু প্রত্যক্ষতাবাদের আলোচনা আরম্ভ হয়েছে। পজিটিভিস্ট সার হেনরী কটন শিক্ষিত সমাজে প্রত্যক্ষতাবাদের ক্রমবিস্তার লক্ষ্য করে আশান্বিত হয়েছিলেন।

বঙ্কিমযুগ এবং বঙ্কিম-মনীষার বৈশিষ্ট্য, জীবনের একটা সমগ্র অস্তিত্বের বৈচিত্র্যকে উপলব্ধি করা। অনেকেই শিক্ষা সমাজ নীতি ইত্যাদি জীবনের খণ্ড খণ্ড দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন সত্য, কিন্তু উনিশ শতকের মনীষা সাধারণভাবে দেখতে গেলে জীবনের সমগ্রতাকেই ধরবার চেষ্টা করেছে। এমন একটা পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্ববোধ বা চারিত্র্যনীতি তাঁরা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন যা দিয়ে রাষ্ট্র সমাজ বা পরিবারেরও খণ্ড সমস্যাগুলির সুসঙ্গত মীমাংসা করা যায়। এই সূত্র আবিষ্কার করবার জন্য কখনও উপনিষদ কখনও প্রকৃতি-বিজ্ঞান কখনও হিতবাদ কখনও প্রত্যক্ষতাবাদ কখনও পুরাণ বা তন্ত্রের অবলম্বন নেওয়া হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রও সেই সমগ্র জীবনতত্ত্বকেই রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। এদিক দিয়ে বঙ্কিমের মনীষা উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ণ সিদ্ধি যদি নাও হয়ে থাকে, পূর্ণ রূপ তো বটেই। বঙ্কিমের পর একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দ ছাড়া আর কারো মধ্যেই জীবনের তত্ত্বরূপকে কল্পনা করবার প্রয়াস দেখতে পাই না। বিবেকানন্দ উনবিংশ শতাব্দীরই সৃষ্টি। বঙ্কিমের পর যাঁরাই চিন্তানায়কত্ব করেছেন, তাঁরাই জীবন-সমস্যার এক-একটা দিকের বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। বিশেষ করে উনবিংশ শতাব্দীর মানবজীবন-সন্ধান কেবল মাত্র জাতীয়তাবোধ বা রাষ্ট্রচিন্তাতেই কেন্দ্রীভূত হয়ে এল। বিংশ শতাব্দীর মনীষা ভিন্নপথে অগ্রসর হয়ে গিয়েছে। এঁদের মধ্যে বিশুদ্ধ জ্ঞানসাধক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বঙ্কিম-মনীষার ঐতিহ্যকে অনির্বাণ রাখার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর 'কর্মকথা' বইখানা মনুষ্যত্ব ও চারিত্র্যনীতিরই তত্ত্বসন্ধান। কিন্তু এই রচনাগুলিও প্রায় বঙ্কিমযুগের শেষের দিকের রচনা, সেই পলিমাটিরই ফসল। আর ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথে বঙ্কিমী মনীষার যথাযথ বৈশিষ্ট্য রক্ষা পায় নি। কারণ যদিও রবীন্দ্র-নাথের সব আলোচনারই মূল বক্তব্য ছিল একটিই—মনুষ্যত্বের জাগরণ, তবু বিভিন্ন বিষয় উপলক্ষে তিনি এর প্রসঙ্গ টেনেছেন মাত্র। এর কোনো পূর্ণাঙ্গ তাত্ত্বিক আলোচনায় তিনি আকৃষ্ট হন নি।

১ কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের 'গীতাসন্দীপনী' বঙ্কিমচন্দ্র গীতার ব্যাখ্যায় ব্যবহার করেছিলেন। অবশ্য 'গীতা-সন্দীপনী'র ব্যাখ্যা অথবা প্রভাব কিছুই তিনি গ্রহণ করেন নি।

বঙ্কিমযুগের মনন-সাধনা

The Indian mind is not only spiritual and ethical, but intellectual and artistic and both the rule of the intellect and the rhythm of beauty are hostile to the spirit of chaos.

—Sri Aurobindo

বঙ্কিমযুগ বলতে কোন্ সময়টা বোঝায়? যে সময় থেকে তিনি উপন্যাস লিখছিলেন, না, যে সময় থেকে তিনি বঙ্গদর্শন পত্রিকা প্রকাশ করলেন? দুই ঘটনা একই সময়ের নয়। বঙ্গদর্শন বাংলা সাহিত্যে যে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল, সেই প্রভাব শুধু উপন্যাস নয়, চিন্তাক্ষেত্রেও ছিল দূরপ্রসারী। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধরচনা বঙ্গদর্শনের প্রকাশকাল থেকেই এবং তা অব্যাহত ছিল তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত। বঙ্কিমের এই মনন-ধারা এক নতুন রীতির প্রবর্তন করেছিল এবং তাঁর মতামত সকলেই সমানভাবে মেনে নিয়েছিলেন,—এ কথা ঠিক না হলেও বাংলা দেশের যুগভাবনাকে তা প্রস্তুত করেছিল। চিন্তা করবার একটা পদ্ধতির তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন। বঙ্কিমযুগ বলতে সাহিত্যে সেই পদ্ধতির ব্যাপকতার যুগকেই বোঝায়।

এই হিসাবে ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত সময়টিকে বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ বলে অভিহিত করা সম্ভব। কিন্তু এটাও মনে রাখা দরকার, বঙ্কিম-যুগের পূর্ব থেকেই অনেক চিন্তার বীজ বাঙালী মনীষার ক্ষেত্রে ছড়িয়ে ছিল। ক্ষেত্র শস্যপূর্ণ হয়েছে বঙ্কিমের সময়ে। তিনি বাঙালীর ভাণ্ডারকে ভরে তুললেন। এজন্য বঙ্কিমযুগের আলোচনায় পূর্ববর্তী মনীষীদের কথাও আলোচনা করা প্রয়োজন। তাঁরা না এলে পথের রেখা কতদূর পড়ত কে জানে এবং বঙ্কিমচন্দ্রও সে পথে আসতেন কিনা সন্দেহ। আবার বঙ্কিমচন্দ্র যে সময়ে ভাবছেন এবং লিখছেন সেই সময়েই বিচিত্র আদর্শের সংঘাত ঘটছিল। কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যু হল ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে। শিবনাথ শাস্ত্রীর নতুন সমাজ ইতিপূর্বেই গড়ে উঠেছে। দেবেন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে একটি বিশিষ্ট জীবনাদর্শ তখনও বলিষ্ঠ। আবার শশধর তর্কচূড়ামণি, চন্দ্রনাথ বসু, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন বাঙালী হিন্দুর দৃষ্টিকে বিশেষ একদিকে ফেরাবার চেষ্টা করছেন, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ লোকহিতের আদর্শে ধর্মপ্রেরণাকে পরিচালিত করবার চেষ্টা করছেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বৈষ্ণব ভক্তিবাদের পুনরুজ্জীবনে ব্রতী হলেন। এ দিকে ধর্মমোহ-

মুক্ত হয়ে আবার এক নতুন জাতীয়তার আন্দোলন অলক্ষ্যে গড়ে উঠতে আরম্ভ করেছে। এই সব আন্দোলনে বঙ্কিমচন্দ্রকে অনেকে নব্যহিন্দুদের পক্ষে প্রগতিবিরোধী-রূপে কল্পনা করেছেন। বঙ্কিমকে অনেকেই বিচার করেছেন শশধর-কৃষ্ণপ্রসন্ন-রামকৃষ্ণ-বিজয়কৃষ্ণের শ্রেণীভুক্ত করে। তাতে বঙ্কিমকে যথার্থভাবে দেখা হয় নি বলেই মনে করি। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন চিন্তানায়ক—কর্মনায়ক বা ধর্মনায়ক ছিলেন না। ধর্ম নিয়ে বঙ্কিম লিখেছেন সত্য, কিন্তু বঙ্কিমের সেই ধর্মের সঙ্গে ঈশ্বরাশ্রিত অতিলৌকিক কর্তব্য পালনের কোনো যোগ নেই। বঙ্কিমের ধর্ম প্রতিবেশী দেশ ও সমাজের প্রতি যথাযোগ্য দায়িত্ব পালন করে বেঁচে থাকবার ধর্ম। ধর্মের এই নতুন সংজ্ঞা অধ্যাত্মপ্রবণ ব্যক্তিদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। সেই হিসাবে বঙ্কিমকে অন্যান্য ধর্মনেতাদের দলভুক্ত না করাই উচিত। বঙ্কিম চিন্তাই করেছেন, যুক্তিই খুঁজেছেন, বাঙালীকে যুক্তিধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করতেই চেয়েছেন। তাই তাঁর যা কিছু উদ্যম তা সবই প্রবন্ধ ও গ্রন্থ-রচনায়—দলগঠনে নয়, ধর্মপ্রচারে নয়, এমন কি সমাজ সংস্কারেও নয়। আর যাঁরাই ছিলেন সেকালের নেতা, তাঁরা শুধু চিন্তা নয়, অন্যরকমের কর্মপ্রয়াসে নিয়োজিত ছিলেন। এ বিষয়ে কিছু সাদৃশ্য আছে বঙ্কিমের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের। দুজনেই যুক্তিবাদী, দুজনেই যথাসম্ভব মুক্ত যদিও দুজনের একজনের চিন্তাও অবাস্তব বিলাস মাত্র ছিল না। দ্বিজেন্দ্রনাথ যদিও বিশুদ্ধ দার্শনিক আলোচনাতে নিরত ছিলেন, সমাজচিন্তায় তাঁর আগ্রহ ও গভীরতা কোনো অংশে কম ছিল না। বঙ্কিম সম্পর্কে এটাও মনে রাখা দরকার, তিনি ছিলেন চাকুরীজীবী। সরকারী চাকরীর সূত্রে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন; তাঁর পক্ষে গঠনমূলক কোনো জাতীয় কর্মে লিপ্ত হয়ে থাকা সম্ভবও ছিল না।

১৮৭২ খ্রীস্টাব্দ থেকে বঙ্কিম বঙ্গদর্শনে খণ্ড-প্রবন্ধ রচনা করতে থাকেন। তাতে ইতিহাস ছিল, প্রত্নতত্ত্ব ছিল, সমাজনীতি ছিল, সাহিত্য ছিল। এই সব প্রবন্ধে বঙ্কিমের শক্তি ছিল ব্যাখ্যা করবার শক্তি। তাদের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি আছে—সমস্যা বুঝবার নিপুণ প্রতিভা আছে। এই প্রবন্ধগুলিতে বঙ্কিম অনেকটা নব্যবঙ্গের উত্তরাধিকার বহন করেছিলেন। নব্যবঙ্গের মননশক্তি, জাতিস্বভাবকে বোঝবার আবেগ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তুলনাত্মক প্রসারিত দৃষ্টি, পাশ্চাত্য সভ্যতা থেকে নবজীবন-মন্ত্র গ্রহণ করবার আগ্রহ—বঙ্কিমের প্রবন্ধগুলি এ সব দিক দিয়ে নব্যবঙ্গেরই অনুরূপ। ১৮৮২ থেকে শুধু ব্যাখ্যা নয়, বঙ্কিম মন দিলেন গঠনে। একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনতত্ত্ব গড়ে তুলবার দিকে তিনি শক্তিকে নিয়োজিত করলেন। ধর্মতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচরিত্র এই যুগেরই রচনা। মনীষী বঙ্কিমের যথার্থ স্বরূপ এবং মূল্যবিচার এই যুগের রচনার উপর অনেকটা নির্ভর করে। কিন্তু প্রতিভা যতই বড়ো হোক তার পরিপার্শ্ব আছে। কেউ কেউ তাকে

অতিক্রম করে অগ্রগামিতার সূচনা করেন; আবার কেউ কেউ বিচ্ছিন্ন যুগচিন্তাকে সংহত করে তাকে পূর্ণাঙ্গতা দান করেন। দুই ক্ষেত্রেই সমসাময়িকত্বের কষ্টিপাথর ব্যবহার করবার প্রয়োজন হয়। রামমোহনকে প্রথম শ্রেণীতে ধরলে বঙ্কিমকে দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কোনো কোনো লেখক বঙ্কিমকে প্রতিক্রিয়াপন্থী বলে মনে করেছেন অর্থাৎ তিনি যেন প্রগতির ধারাকে নিরুদ্ধ ও চিন্তার ধারাকে পিছনে ফেরাতেই চেয়েছিলেন। বঙ্কিমকে সমসাময়িক চিন্তানায়কদের সঙ্গে তুলনা করে দেখলে এর বিপরীতটাই সত্য বলে মনে হবার সম্ভাবনা। প্রগতিমূলক চিন্তার সূত্রগুলিকে একটি তত্ত্বের আকারে তিনি ধরে দিয়েছিলেন মাত্র। এই সব চিন্তার কোনোটির বীজ যুগজীবনে ছড়িয়ে ছিল, কোনোটি তিনি নিজে সৃষ্টি করে তুলেছিলেন। তাঁর এই তত্ত্ব থেকেই পরবর্তী কালের চিন্তার ধারা অগ্রসর হয়ে গিয়েছে। এইগুলিকে একটু বিশদ করে দেখা দরকার। সমস্ত উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারাকে কয়েকটি ভাগ করে দেখা যায়— রামমোহন, নব্যবঙ্গ, দেবেন্দ্রনাথ-তত্ত্ববোধিনী-অক্ষয়কুমার, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ। বর্তমান আলোচনায় এগুলিকে যুগভাগ বলে গণ্য করছি না, চিন্তার নতুন নতুন সূত্র যাঁরা রচনা করেছিলেন, তাঁদের দিয়েই এক-একটি ভাগের নামকরণ করছি মাত্র। বঙ্গদর্শনের আরম্ভ হওয়ার বারো বছর পর্যন্ত কেশবচন্দ্র কর্ম-নেতারূপে বিরাজমান ছিলেন। কেশবের সমসাময়িক কালেই আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর চিন্তার সংঘাত ঘটেছে। সুতরাং এদের বিভিন্ন চিন্তা-উৎসরূপে দেখাই সঙ্গত। বঙ্কিমকে বুঝতে হলে এই সব বিভিন্ন চিন্তার সঙ্গে তাঁর চিন্তাবৈশিষ্ট্যের তুলনা করে দেখা দরকার।

উনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন চিন্তাধারা দেখা দিলেও একটা বিষয়ে সকলেরই ঐক্য ছিল: ইহজীবনের পুনর্গঠনই সবার আগে দরকার হয়ে পড়েছে। ধর্ম মুক্তি ঈশ্বর— এ সব বিষয়ে চরম কথাটি বলা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ব্যাবহারিক জগৎ সম্পর্কে চরম কথা কেউ বলতে পারে না। কারণ ব্যাবহারিক জগৎ নিত্যপরিবর্তনশীল। নিত্য নতুন ক্ষয়িষ্ণুতা ও প্রয়োজন মানুষের চিন্তাকে ব্যাপৃত করে রাখছে। নতুন করে মানুষকে প্রস্তুত হতে হচ্ছে, নতুন করে মানুষকে ক্ষয় পেতে হচ্ছে। সব সমস্যার মূল সমস্যা তাই এক প্রশস্ত বিচারবোধকে আয়ত্তে আনা। বিচারবোধের মানদণ্ডটিকে সকলে চেয়েছেন কল্পনা করতে। একদিন একটি সর্বজন-অনুসরণীয় মানদণ্ড দিয়েছিল স্মৃতিসংহিতা। দীর্ঘকাল পর দেখা যেতে লাগল তার উপযোগিতা ক্রমেই অব্যবহার্য হয়ে আসছে। রামমোহনই এটা প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি একটি নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে চাইলেন। রামমোহনের অধিকাংশ রচনাই বিচারবিতর্ক উত্তর-প্রত্যুত্তর বলে তাঁর

সামগ্রিক সংহত আদর্শটি বোঝার অসুবিধা আছে। বিভিন্ন রচনা থেকে আমাদের অনুমান করে নিতে হয় মাত্র। স্বভাবতই এ বিষয়ে ব্যাখ্যার পার্থক্য হতে পারে। নব্যবঙ্গের দলও পুরনো নিরিখকে অস্বীকার করেছে যদিও কোনো তত্ত্বগত অনুপ্রাণনার সৃষ্টি করতে পারে নি। দেবেন্দ্রনাথের ধর্মমত মানবীয় সমাজকল্যাণকে লক্ষ্য রেখেই যথোপযুক্তরূপে প্রস্তুত হয়ে উঠেছিল। যদিও তাঁর বিশ্বাসে ঈশ্বরনির্ভরশীলতাকেই তিনি মুখ্য করে তুলেছিলেন, কিন্তু ব্যাবহারিক জীবন থেকে তা বিযুক্ত ছিল না। অক্ষয়কুমার দত্ত অথবা বিদ্যাসাগরের কর্মসাধনার কথা বলাই বাহুল্য। কেশবচন্দ্র সেনের ধর্মসাধনার সঙ্গে সামাজিক কল্যাণবোধ এমনভাবে জড়িয়ে ছিল যে তাঁব বিশ্বাসে কোনোটাই প্রায় অন্যনিরপেক্ষ ছিল না। এমন কি শশধর তর্কচূড়ামণিও ব্যাবহারিক উপযোগিতার ব্যাখ্যা করেই হিন্দুধর্ম বোঝাতে গিয়েছিলেন। হয়তো তাঁর উদ্যম আজ যতখানি পরিহাসের উদ্রেক করে ততখানি আকর্ষণ করে না। কিন্তু ধর্মের প্রয়োজনকে তিনিও ঐহিক প্রয়োজন-সাধনের সঙ্গে মিলিয়ে উপস্থাপিত করতে চেয়েছিলেন। সবশেষে সেই যুগে বিবেকানন্দের ধর্ম লোকসেবার তত্ত্বকে এমন ভাবেই আশ্রয় করেছিল যে দুটো প্রায় একার্থবাচক হয়ে পড়েছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারার এই সাধারণ প্রকৃতিতে ইহচেতনার প্রাধান্য যেমন দেখতে পাই তেমনি দেখতে পাই ধর্মবোধের অনড় প্রভাব। য়ুরোপে মধ্যযুগীয় ধর্মসর্বস্বতা আধুনিক যুগে এসে ক্রমে যুক্তিসিদ্ধ ও প্রয়োজন-সিদ্ধ হয়ে পড়েছিল। নতুন যুক্তিবাদের সঙ্গে ধর্মের সমন্বয় করতে গিয়ে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে নতুন নতুন মতের উদ্ভব হয়। কোমতের ধর্ম বা ইউটিলিটারিয়ানদের হিতবাদ শেষ পর্যন্ত হয়তো অপ্রতিহত প্রাধান্য রাখতে পারে নি কিন্তু ইতিহাসে এদের আবির্ভাব মানবমনের বিশিষ্ট গতিধারাতেই এসেছিল এবং এই সব মতের প্রাধান্য লুপ্ত হলেও সেই গতিধারাটি অব্যাহত থেকে নতুনতর মতবাদের সৃষ্টি ঘটাচ্ছে। বাংলা দেশের চিন্তাধারাতেও ইহচেতনার যে মুক্তি দেখতে পাই রামমোহনের সময় থেকেই, সেই পথেই কোমৎ বা মিল আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই ঠিক 'হিতবাদ' না হলেও তারই অনুকূল এক দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষিত চেতনায় প্রসারিত হচ্ছিল। শুধু যে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড়তর পরিচয়ের ফলে হিতবাদের আদর্শ বাঙালী গ্রহণ করছিল তা নয়, এ বিষয়ে শাসক-সম্প্রদায়ের নীতিরও পরোক্ষ সমর্থন ও সহায়তা ছিল। শিক্ষানীতি ও জনকল্যাণমূলক নীতির যেটুকু আদর্শ তারা স্বীকার করেছিল, ধর্মশিক্ষাবর্জিত হলেও, তা হয় তো আশানুরূপ হয় নি। রামমোহন আমহার্স্টকে লেখা বিখ্যাত পত্রে যে ধরণের শিক্ষার বিস্তার

চেয়েছিলেন, তাতেও এই নীতিরই জয়ের আকাঙ্ক্ষা ছিল। প্রয়োজনীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে সামাজিক হিতসাধনের নৈতিক শুভবুদ্ধির উজ্জীবন ছিল রামমোহনের কাম্য। হিতবাদের মূল লক্ষ্যটিও তাই। হিতবাদে অবশ্য ঈশ্বর বা ব্যক্তিগত ধর্মোপলব্ধির স্থান নেই। রামমোহনের পত্রেও ধর্মশিক্ষার চেয়ে, এমন কি বেদান্তশিক্ষার চেয়েও, গণিত পদার্থবিদ্যা রসায়ন শারীরবিদ্যা এবং অন্যান্য প্রয়োগবিদ্যার (useful science) চর্চার উপরেই সম্পূর্ণ প্রাধান্য দিতে অনুরোধ করা হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মতত্ত্বে বহির্বিষয়ক জ্ঞান বলতে এই সব বিজ্ঞানকে অবশ্যশিক্ষণীয় বলে ঘোষণা করেছিলেন। সেকালের শিক্ষানীতিতে তথাকথিত 'অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান' অপেক্ষা 'বহির্বিষয়ক জ্ঞানে'র আদর্শই গৃহীত হল। তার সঙ্গে ছিল য়ুরোপীয় দর্শন ও ইতিহাস। আমাদের মনে রাখা দরকার, জন স্টুয়ার্ট মিলের পিতা জেমস মিল ইণ্ডিয়া হাউসের কর্মচারী ছিলেন এবং তাঁর অবসর গ্রহণের পর স্টুয়ার্ট মিলও সেখানেই কাজ করেছিলেন। এই হিতবাদী দার্শনিকেরা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শিক্ষা ও কর্মনীতিকে কিছু কিছু প্রভাবিত করবার চেষ্টা করেছিলেন। ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে জেমস মিল সহকারী পরীক্ষকের (Assistant Examiner) পদে নিযুক্ত হন। ১৮৩০এ তিনি পরীক্ষক পদে অর্থাৎ কার্যনির্বাহক সচিব পদে উন্নীত হলেন। এই ভাবে তিনি উচ্চতম ক্ষমতা লাভ করে হিতবাদের সূত্রগুলি ভারতবর্ষে প্রয়োগ করবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর 'ভারতবর্ষের ইতিহাসে'ই এর কিছু নমুনা ছিল। জন স্টুয়ার্ট মিল চাকরীতে ঢুকেছিলেন ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে। এ কাজে যে তাঁর পিতার মতো উৎসাহ ছিল, তা মনে হয় না। আত্মজীবনীতে তিনি এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখ করেন নি। জেমস মিলের সঙ্গে সঙ্গেই এডওয়ার্ড স্ট্র্যাচি বিচারবিভাগের কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ইনিও একজন হিতবাদবিশ্বাসী ছিলেন। বেন্থামের তত্ত্ব কী করে ভারতবর্ষে প্রয়োগ করা যায়, এই নিয়ে তিনি বোম্বাইয়ের গভর্ণর এলফিনস্টোনের সঙ্গে নাকি পত্রালাপ করতেন। বেন্থাম নিজেই এ বিষয়ে অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি নাকি স্বেচ্ছায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে কাজ করতেও চেয়েছিলেন। সুতরাং মিল চাকরীতে ঢুকলে তিনি খুশী হয়েছিলেন। ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দে বেণ্টিঙ্ক গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হলে তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হল। বেণ্টিঙ্কের ভারতবর্ষে আসবার আগে যে ভোজসভার আয়োজন হয়েছিল, তাতে বেন্থামের তত্ত্ব তাঁকে বেশ ভালো করেই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল। (he was feasted on 'the pure milk of the Benthamite word'.)। বেণ্টিঙ্ক ভারতবর্ষে এসে সংস্কারকার্যে মন দিলে বেন্থাম উল্লসিত হয়েছিলেন। রামমোহনকে বেন্থাম ইতিপূর্বেই অনুপ্রাণিত করেছিলেন। এ ছাড়া হেইলিবেরিতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলেজে তরুণ অফিসারদের

বেন্থামের মতবাদে দীক্ষিত করা হত। ১৮২৪-এর এডুকেশন ডেসপ্যাচে জেমস মিল নেহাৎই উপযোগিতার দিক দিয়ে বিচার করে বাংলা ভাষাকেই শিক্ষার বাহন করতে চেয়েছিলেন।[১] ১৮৫৪র শিক্ষাসম্বন্ধীয় পরিকল্পনাতেও জন স্টুয়ার্ট মিলের হাত ছিল বলে শোনা যায়। স্টুয়ার্ট মিলের মৃত্যুতে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন[২]—

'কিন্তু ভারতবাসী বলিয়া মিলের সহিত আমাদের আরো কিছু সম্পর্ক আছে। যৎকালে ভারতবর্ষ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃত্বাধীন ছিল তখন মিল প্রথমতঃ ইণ্ট হাউসের একজন কেরানি এবং পরিশেষে চিঠিপত্র পরীক্ষকের কার্য করিতেন। কোর্ট অফ ডাইরেক্টর হইতে ভারতবর্ষে যে সকল আজ্ঞালিপি আসিত তাহা মিলের পরীক্ষা ভিন্ন প্রেরিত হইত না। কিম্বদন্তী আছে যে ভারতবর্ষের বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ক সন ১৮৫৪ সালের প্রসিদ্ধ লিপিরচনাকার্যে মিলের বিশিষ্ট সাহায্য ছিল। ফলতঃ উহাতে যেরূপ নিয়ম নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহার সহিত মিলের Liberty নামক পুস্তকোক্ত মতের সম্পূর্ণ ঐক্য লক্ষিত হইবেক।'

১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেন একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন[৩]—

'The politics of the age is Benthamism, its ethics utilitarianism, its religion rationalism, its philosophy positivism.'

রাজনীতি চরিত্রনীতি ধর্মনীতি দর্শন সব দিক দিয়েই অলৌকিকতাবর্জিত বস্তুধর্মিতার প্রাধান্য দেখে কেশব ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। এর অনেক দিন পরে বঙ্কিম নবজীবনে 'ধর্মজিজ্ঞাসা' প্রবন্ধে ধর্মতত্ত্বের আলোচনার সূত্রপাত করতে ব্রাহ্মমতাবলম্বী এবং গোঁড়া হিন্দু দুই পক্ষই তার সমালোচনা করল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'নব্যহিন্দু সম্প্রদায়' নাম দিয়ে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। তাতে তিনি বললেন[৪]—

'বঙ্কিমবাবুর মতে দুইরূপ সুখ দাঁড়াইতেছে—(১) সামান্য সুখ অর্থাৎ যে সুখ বৃত্তি সকলের আংশিক অথবা অনিয়মিত স্ফূর্তি মাত্র ও যে সুখ অনুপযুক্ত তৃপ্তির সহবর্তী

১ ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থার সঙ্গে হিতবাদীদের যোগাযোগের বিবরণ সংগ্রহ করেছি Erich Stockes, *The English Utilitarians and India*, 1959, পৃ ৪৭—৫৭ থেকে।

২ বঙ্কিম-রচনাবলী, বিবিধ (পরিষৎ সং) পৃ ৩৪১

৩ Dr. P. S. Basu, *Life and Works of Brahmananda Keshav*. 1940. p 106

৪ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮০৬ শক ভাদ্র, পৃ ৯২—৯৬

আর (২) প্রকৃত সুখ—অর্থাৎ বৃত্তি সকলের সম্পূর্ণ এবং সুশৃঙ্খল স্ফূর্তি ও সমুচিত তৃপ্তি; এই দুই প্রকার সুখের মধ্যে সামান্য সুখকে বঙ্কিমবাবু সুখ বলিতে নারাজ—তাঁহার মতে প্রকৃত সুখই সুখ।···

ওরূপ সুখ প্রথমতঃ পূর্ণ যৌবনকালের ধর্ম কেননা প্রাচীন বয়সে বৃত্তি সকলের সম্পূর্ণ স্ফূর্তি একেবারেই অসম্ভব দ্বিতীয়তঃ উহা খুব একজন সাবধানী প্রবীণ লোকের ধর্ম।···সুখানুরাগী যুবা ব্যক্তি তোল দাঁড়ি হস্তে করিয়া স্ফূর্তি এবং সামঞ্জস্য দুইকে ওজন করিতে পারেন যথা (১) চরিতার্থসাধন (২) সামঞ্জস্যসাধন।···সুখাসক্ত যুবকেরা স্ফূর্তিকে এবং তৃপ্তিকে ক্রোড় পাতিয়া গ্রহণ করে কিন্তু সামঞ্জস্যকে বড় ডরায়।'

অতঃপর দ্বিজেন্দ্রনাথ বললেন—

'এখন ধর্ম কি? তাহা এক কথায় বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে। স্বার্থকে পরমার্থের বশে নিয়োগ করাই ধর্ম।

স্বার্থ কাহাকে বলে? না এ প্রবৃত্তির বা ও প্রবৃত্তির নহে কিন্তু সকল প্রবৃত্তির যথোচিত চরিতার্থতা। পরমার্থ কাহাকে বলে? না একা কেবল আমার স্বার্থ বা তোমার স্বার্থ নহে কিন্তু সকল জগতের স্বার্থ—এক কথায় ঈশ্বরের উদ্দেশ্য।'

এই প্রবন্ধ পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র সশ্রদ্ধভাবে লিখেছিলেন—

'তত্ত্ববোধিনীতে "নব্যহিন্দু সম্প্রদায়" এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধে আমার লিখিত "ধর্মজিজ্ঞাসা" সমালোচিত হয়। সমালোচনা আক্রমণ নহে। এই লেখক বিজ্ঞ গম্ভীর এবং ভাবুক। আমার যাহা বলিবার আছে তাহা সব শুনিয়া যদি প্রথম সংখ্যার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া তিনি সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন তবে তাঁহার কোন দোষই দিতে পারিতাম না।'

সত্যই দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রবন্ধের উপসংহারে ধর্মের যে নির্দেশ করেছেন, তার সঙ্গে বঙ্কিমের ধর্মতত্ত্বের মূল বক্তব্যের তেমন বিরোধ নেই। স্বার্থসুখকে কি করে পরার্থ-সুখে পরিবর্তিত করা যায় সেটাই তাঁর অনুশীলন ধর্ম। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেই কয়েক বছর আগে 'ঈশ্বরবিশ্বাস ও ধর্মনীতি'[১] নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। সেই প্রবন্ধেও বাঙালী শিক্ষিত সমাজে পজিটিভিজম্ ইউটিলিটারিয়ানিজম্ মতবাদের বিস্তার-লাভের জন্য ক্ষোভ করা হয়েছিল। রাজনারায়ণ বসু তো স্পষ্টই বঙ্কিমকে 'জঘন্য কোমত মতাবলম্বী' বলে নিন্দা করেছিলেন।[২] রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা' গ্রন্থের সমালোচনা-প্রসঙ্গে বঙ্কিমই বলেছিলেন 'রাজনারায়ণ বাবুর লেখনীর উপর পুষ্প-

১ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৮০৩ শক কার্তিক, পৃ ১২৯

২ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৮০৬ শক ভাদ্র 'নূতন ধর্মমত'

চন্দন বৃষ্টি হউক।' শুধু ব্রাহ্মমতাবলম্বীরাই নয়, গোঁড়া হিন্দুরাও বঙ্কিমের ধর্ম-ব্যাখ্যার সঙ্গে একমত হতে পারে নি। পূর্ণচন্দ্র বসু সেকালে বঙ্কিমের উপন্যাসে 'অশ্লীলতা' এবং 'দুর্নীতি'র কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মকল্পনা সম্পর্কে প্রতিবাদ করে তিনি বলেছিলেন[১]—

'ধর্মের ঈশ্বর কেবল Ideal object নহে। তাহা মানবমস্তিষ্কের শুদ্ধ চিন্তার স্বরূপ নহে, মানবমনের সৃষ্টি নহে, তাহা প্রকৃত জীবিত পুরুষ—যাঁহাকে মনুষ্য কায়মনোবাক্যে পূজা করেন।···বঙ্কিমবাবুর আর একটি কথা এই—ধর্মমাত্র ভ্রম এবং মিথ্যাসংসৃষ্ট এবং মিথ্যা মাত্রেই অনিষ্ট আছে। 'এই জন্য সকল ধর্মের সংস্কার আবশ্যক। যে ধর্মই অবলম্বন কর তাহার সংস্কারপূর্বক ভ্রান্তি ও মিথ্যা পরিত্যাগপূর্বক তদন্তর্গত সত্যকে ভজনা করিবে।'

ইহা খাঁটি Eclecticism। নির্বাচন করিয়া যদি ধর্মতত্ত্ব গ্রহণ করিতে হয় তাহা হইলে পৃথিবীতে যত লোক প্রায় ততগুলি ধর্ম হইবার সম্ভাবনা।'

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মমতে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধের বীজ দেখে পূর্ণচন্দ্র বসু উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। বঙ্কিমের উপর এটাই ছিল মিলের প্রভাব।

কোমৎ দর্শন বা হিতবাদ বাংলা দেশে যে বিশেষ কয়েকজন লেখককেই প্রভাবিত করেছিল তা নয় বস্তুত উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তার মূলে এরা কোনো না কোনোভাবে নিহিত ছিল। আমরা দেখেছি এ না হয়ে উপায় ছিল না। বঙ্কিমকে যাঁরা সমালোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যেই এর সূত্র যদি পাওয়া যায় তবে বিস্ময় বোধ করবার কিছু নেই। কোমৎ মত এবং হিতবাদ এ দুটি একই লোককল্যাণমূলক আদর্শ থেকে উদ্‌ভূত। জন স্টুয়ার্ট মিলের সঙ্গে কোমতের প্রথম দিকে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। মিল কোমতেরই শিষ্য ছিলেন। পরে দুজনের মধ্যে একটা মতবিরোধ দেখা দিল। কোমৎ সমষ্টিবাদী ছিলেন—ব্যক্তিকে নিরুদ্ধ করে সমাজকে বড়ো করে তুলতে চেয়েছেন। মিল বলেন, ব্যক্তির স্ফূর্তি না ঘটলে সমাজের কল্যাণ নেই। বঙ্কিম এই দুই মতের সামঞ্জস্য করতে চেয়েছেন ধর্মতত্ত্বে। সর্বাঙ্গীণ বৃত্তির সামঞ্জস্যপূর্ণ স্ফূর্তি সাধনের দ্বারা ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনে তিনি জোর দিয়েছেন, তেমনি ব্যক্তির সঙ্গে সমাজ ও দেশের সমঞ্জসীভূত যোগসাধনের দ্বারা সমষ্টিচেতনাকে শক্তিশালী করার উপরেও জোর দিয়েছেন। কোমৎ দর্শন সম্পর্কে বঙ্গদর্শনে ছাড়াও অন্যান্য পত্রপত্রিকাতে মাঝে মাঝেই আলোচনা হয়েছে। বাংলা দেশে কোমৎ মতের বিস্তার সম্পর্কে সার হেনরী কটন বলেছেন[২]—

১ আর্যদর্শন, ১২৯১ ভাদ্র 'ধর্মসম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর মত'

২ Sir Henry Cotton, *New India*, p 115.

'The teaching of Comte has already deeply penetrated a few of the most select minds in Bengal. That is quite enough for the present. It is not desirable that positivisim should address itself at the outset to a very wide circle.'

ধর্মবিশ্বাস হিসাবে প্রত্যক্ষতাবাদ বাংলা দেশের উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে কেউ কেউ গ্রহণ করেছিলেন, যেমন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, দ্বারকানাথ মিত্র, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এবং নগেন্দ্রনাথ ঘোষ।[১] কিন্তু সেটাই বড়ো কথা নয়। বড়ো কথা এই যে, কোমতের চিন্তা-প্রণালী অন্যধর্মাবলম্বীদের প্রভাবিত করেছে। তার সুযোগও ছিল। যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ *Chaitanya's Ethics* (1884) নামে একটি বই লেখেন।[২] তাতে তিনি চৈতন্য-ধর্মের সঙ্গে কোমৎ ধর্মের সাদৃশ্য দেখান। বস্তুত প্রত্যক্ষতাবাদ একটা কোনো আলাদা ধর্ম নয়। যে কোনো ধর্মাবলম্বী কোমৎ মত স্বীকার করে নিতে পারেন। হিন্দু-ধর্মের নির্বিশেষ তত্ত্বের দিক দিয়ে না হলেও ব্যাবহারিক দিক দিয়ে কোমৎমতকে গ্রহণ করতে বাধা নেই। বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মতত্ত্বের পঞ্চদশ অধ্যায়ে 'ভূত আমি এবং ঈশ্বর' এই তিনটি জ্ঞেয়ের মধ্যে প্রথমটিকে কোমতের নির্দেশেই জানতে বলেছিলেন। বিশেষত ধর্মসাধনার সঙ্গে শিক্ষাকে বঙ্কিমচন্দ্র এমনভাবেই একাঙ্গ করে ফেলেছিলেন যে 'হিন্দু-ধর্মের কোন অংশের সঙ্গে কোমত মতের সাদৃশ্য'[৩] তাঁকে বরং উৎসাহিতই করেছিল। দেবী চৌধুরাণীতে অনুশীলন ধর্মের যে ঔপন্যাসিক রূপ দেওয়া হয়েছে তার প্রথমেই কোমতের একটি বাক্য দিগ্‌দর্শনরূপে বিরাজিত—

'The General Law of Man's progress, whatever the point of view chosen, consists in this that man becomes more and more religious'

দেবী চৌধুরাণীতে সমঞ্জসীভূত চরিত্রনীতির যে আদর্শ আছে তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা বঙ্কিম করেছেন ধর্মতত্ত্বে। বঙ্কিমের এই শিক্ষাদর্শ সুপরিচিত। সর্বাঙ্গীন্ বৃত্তির প্রকর্ষ পরবর্তী কালে অনেকেরই চিন্তাকে অনুপ্রাণিত করেছে। বঙ্কিমের এই আদর্শ ইউটিলিটারিয়ানদের চিন্তা থেকে এসেছে। কিন্তু এ বিষয়ে বঙ্কিম একা নন। উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাশীলগণ প্রায় সকলেই এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। অবশ্য

১ প্রিয়রঞ্জন সেন, 'বাংলায় ধ্রুববাদ', কৃষ্ণনগর কলেজ স্মারকগ্রন্থ

২ যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ সম্পর্কে শ্রীমৃদুলকান্তি বসুর তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ 'ধ্রুববাদ আন্দোলন ও যোগেন্দ্রচন্দ্র' দ্রষ্টব্য—'প্রান্তিক' নবপর্যায় প্রথম সংখ্যা শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭৫।

৩ ধর্মতত্ত্ব, পঞ্চম অধ্যায়

বঙ্কিম চিত্তবৃত্তির 'সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষ'এর তত্ত্বটিকে তাঁর জীবনদর্শনের 'মর্মকেন্দ্রে রেখেই তাঁর চিন্তাকে পরিচালিত করেছিলেন। অন্য যাঁরা এই প্রসঙ্গ এনেছেন তাঁরা চিত্তবৃত্তির কর্ষণের কথা বলেছেন অন্য প্রসঙ্গে। যেমন কেশবচন্দ্র ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের *The Destiny of Human Life* বক্তৃতায় বলেছিলেন[১]—

'This salvation—the soul's progress unto God in faith, purity and love, is to us the grand object of life. But this progress must be of the whole life: we must seek the development of the whole man. All the compartments of life must advance in the way of truth: all the powers and sentiments of the mind must be cultivated and developed.'

শরীরকে বলিষ্ঠ করে না তুললে এবং সেই অনুপাতে চিত্তবৃত্তির সমঞ্জসীভূত বিকাশ না ঘটালে ধর্মের লক্ষ্য সিদ্ধ হয় না, কেশবের এই মত রাজনারায়ণ বসুরও। রাজনারায়ণ বঙ্কিমকে হিতবাদী হওয়ার জন্য সমালোচনা করেছিলেন কিন্তু তিনি নিজেই হিতবাদের একটি সূত্রকে গ্রহণ করেছেন। কেশবচন্দ্রের সঙ্গে ধর্ম নিয়ে মতভেদ ঘটলে রাজ-নারায়ণ রচনা করলেন 'ব্রাহ্মধর্মের উচ্চ আদর্শ' (চৈত্র, ১৭৯৬ শক)। এই রচনায় তিনি ব্রাহ্মধর্মের প্রধান লক্ষণ নির্দেশ করেছিলেন চারিটি—অসাম্প্রদায়িকতা, ব্যবধান-বিমুখতা, আধ্যাত্মিকতা এবং সর্বসমঞ্জসীভূততা। চতুর্থ লক্ষণটি সম্বন্ধে তিনি বলেছেন[২]:—

'ব্রাহ্মধর্মের প্রধান গৌরব এই যে উহা পরস্পরবিরোধী বৃত্তি ও পরস্পরবিরোধী গুণের সামঞ্জস্য সম্পাদন করিতে অনুজ্ঞা করে। এ বিষয়ে আমার *What is Brahmoism* নামক বক্তৃতায় এইরূপ লিখিত আছে।—

It considers religious blessedness to consist in a harmonious operation of all our faculties and harmonious discharge of all our duties. It does not consider any quality, faculty, feeling passion or appetite given by God to us unnecessary but maintains that it requires only proper regulation to subserve the temporal and eternal interest of man. From divine communion down to the practice of common prudence and the enjoyment of innocent recreation it considers the exercise of every human faculty under

১ Dr. P. S. Basu. *Life and Works of Brahmananda Keshov*, 1940, p 51

২ 'ব্রাহ্মধর্মের উচ্চ আদর্শ' পৃ ৯

proper regulation and a harmonious discharge of all our duties, duly subordinated for the sake of harmony itself, to be true religion.'

সুতরাং ব্যক্তির শারীরিক এবং মানসিক বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্যপূর্ণ উৎকর্ষ সাধনের মতবাদটি বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্বের অনেক আগে থেকেই বাংলা দেশের চিন্তাশীলদের অধিকার করেছিল। কেশব অথবা রাজনারায়ণ দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন একথা এখনও বলা শক্ত। তার কারণ দুটি। বঙ্কিমের রচনাতেই বিদেশী হিতবাদীদের সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপিত হওয়ায় যুক্তি এবং চিন্তাসূত্র তিনি বিদেশ থেকেই পেয়েছিলেন বলেই মনে হয়। দ্বিতীয়ত আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি এ যুগের চিন্তাবৈশিষ্ট্যের ইহমুখিনতা সকলকেই মানবত্বের নৈতিক বিকাশ-সাধনে ব্যাপৃত করে তুলেছিল। কেশবচন্দ্র বা রাজনারায়ণের মতো ঈশ্বরপ্রাণ ব্যক্তি ভক্তিধর্মের উপর একান্ত নির্ভর করলেও মানুষের কার্যকারিণী বৃত্তিগুলির পূর্ণপ্রয়োগের নির্দেশ দিয়েছেন অর্থাৎ এগুলিরও উপযোগিতা আছে। যদি সোজাসুজি ব্রহ্মোপলব্ধির সহায় এতে নাও হয়, তবু ঈশ্বরসৃষ্ট কর্তব্যপালনে তাঁর প্রীতিই জন্মায়। পরোক্ষভাবে ঈশ্বরের অভিপ্রায় সিদ্ধ করার আনন্দেই ব্যক্তির বৃত্তিগুলির পূর্ণ ব্যবহারের সার্থকতা। বিশুদ্ধ অধ্যাত্ম-বোধের সঙ্গে ইউটিলিটারিয়ানদের অনুশীলন ধর্মও এইভাবে যুক্ত হল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কোনো তত্ত্বেরই বোধহয় এর স্পর্শ বাঁচিয়ে চলা সম্ভব ছিল না। কিন্তু এ বিষয়ে আশ্চর্য সমধর্মিতা দেখা যায় অক্ষয়কুমার দত্তের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে অক্ষয়কুমার দত্তের 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার, প্রথম ভাগ' প্রকাশিত হয়। তার কিছু আগে রচনাগুলি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বেরিয়েছিল। এই বইয়ের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে।

সকলেই জানেন, অক্ষয়কুমার এই বইটি জর্জ কুম্বের *Constitution of Man* বই থেকে অনুবাদ করেছিলেন। তবু ভূমিকায় অক্ষয়কুমার উল্লেখ করেছেন, যে সব বিষয় এ দেশের অনুপযোগী সে সব তিনি বর্জন করেছেন। এ দেশের সমাজ ও জীবন সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান যা জন্মেছিল, তা-ই তাঁকে প্রণোদিত করেছিল অনুবাদে। জর্জ কুম্ব তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন ; দুজনের মনের গড়ন প্রায় একই রকম ছিল। দুজনেই প্রগাঢ় যুক্তিবাদী, প্রাকৃতিক নিয়মের অব্যর্থতায় বিশ্বাসী এবং ইন্দ্রিয়াতীত জগৎ সম্পর্কে বিরূপ। 'বাহ্যবস্তু'কে অক্ষয়কুমারের নিজেরই বিশ্বাস এবং অভিমত বলে গ্রহণ করে নিলে ক্ষতি নেই। বিশেষত এই বইয়ের মূল প্রতিপাদ্য অক্ষয়কুমারের চারুপাঠে পুনরুক্ত হয়েছে।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন [১]—

'তিনি যাহা লিখিতেন তাহাতে আমার মতবিরুদ্ধ কথা কাটিয়া দিতাম এবং আমার মতে তাঁহাকে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতাম কিন্তু তাহা আমার পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। আমি কোথায় আর তিনি কোথায়। আমি খুঁজিতেছি ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ আর তিনি খুঁজিতেছেন বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির কি সম্বন্ধ।'

দেবেন্দ্রনাথের উক্তি সংক্ষিপ্ত কিন্তু গভীর অর্থপূর্ণ। অক্ষয়কুমার ব্যাবহারিক জগতের অতীত কোনো কিছুর সন্ধান বা চিন্তা করেন নি। অস্তিত্ব নিয়ে চরম জিজ্ঞাসা মানুষের চিরকালই ছিল। উনবিংশ শতকে এই জিজ্ঞাসা আমাদের লৌকিক জগতের মধ্যেই উত্তর খুঁজল। য়ুরোপের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং প্রাকৃতিক নিয়মের অটল অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়ার ফলে বস্তুজগৎই একটি অবিচল মানদণ্ডে পরিণত হল। এই জগৎ এবং সমাজের স্বতঃসিদ্ধতা মেনে নিয়েই মানববুদ্ধি অগ্রসর হয়েছে। প্রকৃতির রহস্যকে নানাদিক দিয়ে জানা এবং মানুষকে তারই মধ্যে যথাযথরূপে স্থাপিত দেখাই হল তার সব উদ্যমের মূলে। বাংলা দেশে এই জিজ্ঞাসা সর্বপ্রথম দেখা দিয়েছে অক্ষয়-কুমার দত্তের মধ্যে। তার আগে যাঁরা এসেছেন, তত্ত্বের দিক দিয়ে মানব-অস্তিত্বের কথা তাঁরা চিন্তা করেন নি—শুধু লোকব্যবহারের নৈতিক বিচার করেছেন মাত্র। মানবসমাজ এবং বস্তুজগতের মধ্যে ব্যাবহারিক সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা আমাদের দেশে আগেও কখনো হয় নি। অক্ষয়কুমার লিখেছেন [২]—

'পূর্বে আমারদিগের দেশে যত দর্শন শাস্ত্র প্রকাশ হইয়াছে, এ বিষয়ের অনুসন্ধান করা তাহার তাৎপর্য ছিল না। আপনাদিগের শারীরিক ও মানসিক স্বভাব ও ব্যহ্যবস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ বিবেচনা করিবার প্রয়োজন তৎকালের লোকের সম্যক বোধগম্য হয় নাই।'

আমাদের সামাজিক আচারনিয়মগুলি পুরোপুরি এই সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টাতে রচিত হয় নি। এর কিছুটা ছিল প্রাকৃতিক নিয়মের ফল, আবার অনেকটাই ছিল বিশেষ সমাজের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করবার চেষ্টার ফল। কিন্তু অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ 'আমাদের সামনে এনেছে বিশ্বপ্রকৃতিতে কার্যকারণবিধির সার্বভৌমিকতা; আর একদিকে ন্যায় অন্যায়ের সেই বিশুদ্ধ আদর্শ যা কোনো শাস্ত্রবাক্যের নির্দেশে কোনো চিরপ্রচলিত প্রথার সীমাবেষ্টনে, কোনো বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ বিধিতে খণ্ডিত হতে

১ আত্মচরিত, ২সং, পৃ ২৩

২ 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার', প্রথম ভাগ, উপক্রমণিকা

পারে না।'[১] অক্ষয়কুমারের রচনায় সেই সার্বভৌমিক নীতি তত্ত্বের আকারে প্রথম স্বীকৃতি লাভ করল। এই স্বীকৃতি আমাদের চিন্তার পদ্ধতিতে নিয়ে এল প্রবল পরিবর্তন এবং দেবেন্দ্রনাথ বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

অক্ষয়কুমার একান্তভাবে প্রাকৃতিক নিয়মের উপরেই আস্থা রেখেছিলেন। প্রাকৃতিক নিয়ম পালন করাতেই সুখ এবং সুখের সন্ধানই মানুষের কর্তব্য। মানুষ মাত্রেরই সুখের উপরে চরম আশা উদ্যম এবং সাফল্য নির্ভর করে। এইজন্যই সুখলাভ দিয়েই ব্যক্তির জীবনের সার্থকতা নির্ণেয়। আবার সুখই মানুষ মাত্রের সুনির্দিষ্ট মূল্যমান। তাই মানুষ সুখকে যত সহজে গ্রহণ ও স্বীকার করতে পারে, কোনো আধ্যাত্মিক বা অন্য কোনো মূল্যমানকে তত সহজে সে বোঝে না। হিতবাদীরা তাই সুখকেই একটি সর্বজনগ্রাহ্য সন্দেহাতীত (positive) মূল্যমান-স্বরূপ ধরে নৈতিক বিচার করেছে। এ বিষয়ে অক্ষয়কুমার দত্ত এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। দুজনেই সুখলাভকেই লক্ষ্যস্বরূপ সামনে রেখে বিচারে অবতরণ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই স্বতঃসিদ্ধকে মেনে নিয়ে যুক্তির ক্রমবিস্তারকে স্বীকার্য করে তুলেছেন এবং সুখকে রূপান্তরিত করেছেন বহুজনহিতায়। ফলে ব্যক্তিচেতনা পরিণত হয়েছে সমষ্টিচেতনায়। অক্ষয়কুমারের ব্যাখ্যা ব্যক্তিত্বের বিকাশেই সীমাবদ্ধ। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্কিমের যে সমালোচনা করেছিলেন, সেটা অক্ষয়কুমারের সম্পর্কে যতখানি প্রযোজ্য, বঙ্কিমের সম্পর্কে ততখানি প্রযোজ্য নয়। যে-প্রাকৃতিক নিয়ম পালনকে অক্ষয়কুমার বলেছেন সুখলাভের উপায়, তাকে তিনি তিনভাবে ভাগ করেছেন[২] ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক। প্রথমটি হচ্ছে জড়-প্রকৃতির নিয়ম, কার্যকারণ ইত্যাদি ; দ্বিতীয়টি মানবশরীরের নিয়ম, প্রজনন বিকাশ এবং মৃত্যু ; তৃতীয়টি জীবনচেতনার নিয়ম। জীবচেতনা আবার দু রকমের—মানুষের এবং ইতর জন্তুর। মানুষের মানসিক বৃত্তি নির্দিষ্ট, প্রকৃতির এবং বাহ্যবস্তুর সঙ্গে তার সম্বন্ধও নির্দিষ্ট। এগুলি হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তি, ধর্মপ্রবৃত্তি ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি। অক্ষয়কুমার-কল্পিত এই নিয়মবিন্যাস থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় মানুষের অধ্যাত্মচেতনা-সম্পর্কিত কোনো রকম অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার মধ্যে যেতে তিনি অনিচ্ছুক। মানসিক প্রকৃতির আলোচনায় অর্জনস্পৃহা, লোকানুরাগপ্রিয়তা, সাবধানতা প্রভৃতির মতো ভক্তিকে তিনি অন্যতম স্থান দিয়েছেন মাত্র। তাঁর বর্ণনায়[৩]—

১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কালান্তর' নামপ্রবন্ধ

২ 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' প্রথম ভাগ, প্রথমাধ্যায়, 'প্রাকৃতিক নিয়ম'

৩ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, নবম মুদ্রণ, পৃ ৫৩

'পরমেশ্বর অনেকানেক গুরুলোক ও অন্যান্য মহৎ মহৎ ব্যক্তির সহিত আমাদিগের গুরুতর সম্বন্ধ নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন, এবং তাঁহাদিগের সহিত আমাদিগের তদুচিত ব্যবহার সম্পাদনার্থে আমাদিগের ভক্তিরূপ পরম প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন।'

এই যেমন এক রকম ভক্তি তেমনি—

'কিন্তু পরমেশ্বরপরায়ণ ভক্তিমান্ ব্যক্তিরা প্রতীতি করেন, পরমেশ্বর যেমন ভক্তির বিষয়, এমন আর দ্বিতীয় নাই।'

অধ্যাত্মচেতনা-সম্পন্ন ব্যক্তিদের ভক্তিধর্মকে শুধুমাত্র শোনা কথার পর্যায়ে ফেলে এবং শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের প্রতি পালনীয় ভক্তিকে মানবমনের অন্যতম গুণ বলেই অক্ষয়-কুমার ভক্তির একটা স্থান নির্দেশ করেছেন। আমার মনে হয়, অক্ষয়কুমারের চিন্তায় ভক্তির স্থান এতই গৌণ যে আধ্যাত্মিক ভক্তি যেটুকু তিনি স্বীকার করেছেন, সেটুকু নেহাৎই ব্রাহ্মধর্মের প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবেই। 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' এর দ্বিতীয় ভাগের ভূমিকায় তিনি ব্রাহ্মধর্মের নিজস্ব প্রয়োজনের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন। বঙ্কিমের ধর্মতত্ত্বে ভক্তির স্থান এ রকম গৌণ নয়। অবশ্য বঙ্কিমের মতেও ভক্তিকে যে ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তাতে ভক্তি অর্থ দাঁড়িয়েছে কোনো নৈর্ব্যক্তিক মহৎ আদর্শে অকুণ্ঠ আত্মনিবেদন মাত্র। প্রাকৃতিক নিয়ম সম্পর্কে জ্ঞান বঙ্কিমের কাছে অক্ষয়কুমারের মতোই সমান প্রয়োজনীয়। অক্ষয়-কুমারের কাছে তিনটি নিয়ম জ্ঞেয়, বঙ্কিমের কাছে সে তিনটি—ভূত, আমি ও ঈশ্বর। এর প্রথম দুটি অক্ষয়কুমারের নির্দেশেরই অনুরূপ—গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থতত্ত্ব, রসায়ন, জীবতত্ত্ব-সমাজতত্ত্ব। অক্ষয়কুমার মানসিক নিয়মকে জানবার বিষয় বলেছেন বটে কিন্তু বঙ্কিমের সঙ্গে তার পার্থক্য আছে। হিন্দু দর্শনে মন শরীরেরই অঙ্গ। সুতরাং অক্ষয়কুমারের মানসিক নিয়মও শারীরিক নিয়মের অন্তর্ভুক্ত হওয়ারই যোগ্য। বঙ্কিম যাকে 'অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান' বলেন, সেটা জানা যাবে উপনিষদ দর্শন পুরাণ ইতিহাস, প্রধানত গীতায়। এই বিষয়গুলির সম্পর্কে অক্ষয়কুমারের কোনো উৎসাহ ছিল না, তাঁর অনুসন্ধানের বিষয়ও ছিল না। চিন্তার বিষয় এবং প্রণালীতে অক্ষয়কুমার ছিলেন পুরোপুরি অষ্টাদশ শতাব্দীর য়ুরোপের শিষ্য।

প্রাকৃতিক নিয়মকে জানা আদি প্রয়োজন বলে স্থির করে অক্ষয়কুমার এই জ্ঞান থেকে সুখ কীভাবে লভ্য তাই আলোচনা করছেন। এই আলোচনাতে তাঁর সঙ্গে বঙ্কিমের এবং হিতবাদীদের মিল বিস্ময়কর। অক্ষয়কুমার সূত্র নির্দেশ করেছেন[১]—

১ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, তৃতীয়াধ্যায়, 'মনুষ্যের সুখোৎপত্তির বিষয়'

'মনুষ্যের প্রকৃতি ও বাহ্যবস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধের বিষয় সংক্ষেপে বিবরণ করা গিয়াছে এক্ষণে তার সুখোৎপত্তির মূল অন্বেষণ করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ। ইহা স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে যে শরীর ও মন চালনা না করিলে সুখানুভব হয় না।

দ্বিতীয়তঃ। সমুদয় মনোবৃত্তিকে পরস্পর সম্পূর্ণরূপে সমঞ্জসীভূত করিয়া চরিতার্থ করা কর্তব্য নতুবা এ সংসারে যে প্রমাণ স্থায়ী সুখসম্ভোগের সম্ভাবনা আছে, তাহা সম্পন্ন হয় না।

তৃতীয়তঃ। মনুষ্যের সুখস্বচ্ছন্দতাকে বদ্ধমূল করিতে হইলে তাহার সমস্ত মনোবৃত্তি পরস্পর সমঞ্জসীভূত থাকিয়া যেরূপ উপদেশ প্রদান করে তাহার সহিত বাহ্যবস্তু বিষয়ক নিয়ম সমুদায়ের ঐক্য রাখা আবশ্যক এবং বুদ্ধি যাহাতে উভয়েরই স্বরূপ ও পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপণপূর্বক ভ্রমপ্রমাদশূন্য হইয়া সৎপথপ্রবর্তক হইতে পারে তাহার উপায় করা কর্তব্য।'

সামঞ্জস্য-সাধনের এই তত্ত্বই অক্ষয়কুমারের মূল মতবাদ। বালকপাঠোপযোগী বই 'চারুপাঠে'ও অক্ষয়কুমার চিত্তবৃত্তির কর্ষণ এবং সামঞ্জস্য-সাধনের উপদেশ দিয়েছেন[১]—

'এক্ষণে বিষয়কর্মের যে প্রকার রীতি প্রচলিত আছে, তাহা অত্যন্ত অনিষ্টকর। বিষয়ী ব্যক্তিরা দিবসের অধিক ভাগ কেবল বিষয় কার্যেই ক্ষেপণ করেন, জ্ঞান ও ধর্মের অনুশীলন করিতে অবকাশ পান না। কিন্তু মনুষ্যের সকল প্রধান বৃত্তিই যথানিয়মে চালনা করা উচিত এবং কিঞ্চিৎকাল পরিশ্রম ও আমোদ প্রমোদ করাও কর্তব্য। তদ্ব্যতিরেকে কোনমতেই সম্পূর্ণরূপে সুস্থ ও সর্বতোভাবে সুখী হওয়া যায় না।'

শোনা যায় 'বাহ্যবস্তু' সমসাময়িক কালে গভীর এবং সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। তার একটা প্রমাণ পাওয়া যায় উপরে উদ্ধৃত কেশবচন্দ্র এবং রাজনারায়ণ বসুর উক্তিতে। এঁরা হিতবাদকে স্বীকার করতে চান নি। ব্রাহ্মধর্ম সুখসন্ধানকে (সুখের অর্থ যতই বিস্তৃত হোক) লক্ষ্য বলে স্বীকার করতে চায় নি; অথচ শরীর ও মনের সমঞ্জসীভূত পুষ্টিসাধনকে ব্রাহ্মধর্মের অন্যতম লক্ষ্য বলে না মেনে পারা যায় নি।

বস্তুত বলিষ্ঠ দেহ এবং বলিষ্ঠ মনকে যুগপৎ গড়ে তোলার কথা মনীষী মাত্রেই বলে গিয়েছেন। অক্ষয়কুমার বা বঙ্কিমচন্দ্রের মতো বুদ্ধিবাদীরা ছাড়াও কেশবচন্দ্র থেকে বিবেকানন্দ পর্যন্ত সকলেরই ছিল ওই কথা। তবে ধর্মসাধকেরা ঈশ্বর বা ব্রহ্ম-চেতনাকে সকল উদ্যমের লক্ষ্যস্থল করেছিলেন, বঙ্কিম সামনে রেখেছিলেন সমাজকে। এ বিষয়ে কোমতের যুক্তির সারবত্তাকে স্বীকার না করে তিনি পারেন নি। অবশ্য সব

১ 'চারুপাঠ', প্রথম ভাগ ১৮৫৩, 'শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান'

কিছুর উপরে তিনি স্থাপন করেছিলেন ঈশ্বরভক্তিকে। বঙ্কিমের ঈশ্বরকল্পনা যে স্বার্থহীন কর্মযোগের প্রেরণাস্বরূপ সে কথা বলেছি। তাঁর কথাতে[১]—

'কর্ম অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু কেবল অনুষ্ঠেয় কর্মই কর্ম। যে কর্ম ঈশ্বরোদ্দিষ্ট অর্থাৎ ঈশ্বরাভিপ্রেত তাহাই অনুষ্ঠেয়। তাহাতে আসক্তিশূন্য এবং ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে।'

এটা গীতারই কথা।

বঙ্কিমের ধর্মতত্ত্ব একটা সমন্বিত দর্শন। ব্যক্তির বিভিন্ন বৃত্তির সামঞ্জস্য, দেশ ও সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সামঞ্জস্য, আবার শিক্ষা সাহিত্য নীতি ধর্ম বিজ্ঞান প্রভৃতি মানব-অভিজ্ঞতার সবগুলি দিকের আলোচনা ও সামঞ্জস্য করে ধর্মতত্ত্ব কল্পিত হয়েছিল। ঈশ্বরচিন্তাই হোক, সমাজসেবাই হোক, যুদ্ধই হোক, মিত্রতাই হোক, সব কিছুরই একটি মৌলিক জীবনদর্শন রচনা করে বঙ্কিমচন্দ্র সমন্বিত ব্যক্তিত্বের আদর্শ স্থাপন করলেন। বলা বাহুল্য, এ মানুষ বাস্তব নয়, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'মূর্তিমান থিয়োরি'[২]।

কিন্তু থিয়োরি রচনায় একা বঙ্কিম নন, সেকালের চিন্তাশীলরা অনেকেই ব্যাপৃত ছিলেন। মনে রাখা দরকার, সেকালের প্রয়োজন আর একালের প্রয়োজন এক রকম নয়। একালের মানুষের মৌলিক জীবনতত্ত্বের কোনো অবশ্য-অনুসরণীয় সর্বজনগ্রাহ্য আদর্শ নেই। সমাজের বন্ধন শিথিল হওয়াতে ব্যক্তি এখন আপন আপন অভিপ্রায় নিয়ে জীবন ধারণ করতে পারে। এখন বরং রাজনীতিক আদর্শ বাইরের দিক দিয়ে মানুষকে দলবদ্ধ করেছে এবং ভিতরের নৈতিক প্রেরণার মূল উৎসটি হয়েছে দুর্নিরীক্ষ্য। উনবিংশ শতাব্দীতে মনীষীরা চেয়েছেন, রাজনীতি চারিত্র্যনীতি প্রভৃতির উপরেও একটি মূল জীবনদর্শন সৃষ্টি করতে, যার নির্দেশে লোকব্যবহারের বহিরঙ্গ নীতিও পরিচালিত হতে পারবে। ভারতবর্ষের ধর্ম সর্বব্যাপক বলে ধর্মসংস্কারই সেকালের প্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ পর্যন্ত সকলেই এমন একটা ধর্মবোধকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন যেটা আমাদের কর্তব্যের নির্দেশ দিতে পারে, সে কর্তব্য ঈশ্বরলাভের পথেই হোক আর মানবকল্যাণের পথেই হোক। স্বভাবত হিন্দুধর্মের পরীক্ষা কঠিন হয়েছে। হিন্দুধর্ম ঐহিক এবং পারত্রিক দুয়েরই মর্যাদা দেবার চেষ্টা করেছে। গীতার কর্মযোগ ঐহিক কর্তব্যের নির্দেশক। যেহেতু উনবিংশ শতাব্দীতে ঐহিকতার উপর ঝোঁক পড়েছে, সেইজন্য গীতার কর্ম-

১ ধর্মতত্ত্ব, চতুর্দশ অধ্যায়

২ আধুনিক সাহিত্য, 'কৃষ্ণচরিত্র' সমালোচনা

যোগের দিকে সকলেরই দৃষ্টি গিয়েছে। যে ঐহিকতাবোধ থেকে হিতবাদের উদ্‌ভব বঙ্কিমচন্দ্র সেই চিন্তা থেকেই গীতার কর্মযোগের সঙ্গে হিতবাদের মিলন ঘটাবার আয়োজন করেছেন। রামমোহনও গীতার ভাষ্য করেছিলেন আবার দ্বিজেন্দ্রনাথও এর ভাষ্য রচনা করেছিলেন। এ ছাড়া আরও বিভিন্ন ভাষ্য রচিত হয়েছে।

সামগ্রিক জীবনদর্শন-রচনার আয়োজন রামমোহন থেকেই অলক্ষ্যে আরম্ভ হয়েছিল। রামমোহনের সংস্কার-প্রেরণা হয়তো এখানেই ছিল। একেশ্বরবাদের ভিত্তির উপর তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। এর মূলে ইসলামের প্রভাব ছিল বলে অনুমান করা হয়। ইসলামের 'মোতাজেলা' এবং 'মুওয়াহিদ্দিন' মত দুটির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে 'তুহফত-উল-মুওয়াহিদ্দিন' (১৮০৩-৪) তিনি রচনা করেন। তারপরে তিনি প্রকাশ করলেন 'বেদান্ত গ্রন্থ' (১৮১৫)। বেদান্তের অদ্বৈততত্ত্বের আলোচনা আমাদের দেশে হ্রাস পেয়ে এসেছিল, রামমোহন তার পুনঃপ্রবর্তন করলেন। এটা অনুমান করা কঠিন নয় যে, ইসলামের সার্বভৌম ঈশ্বরচেতনার প্রতিরূপ তিনি হিন্দুধর্মের মধ্যেই পেয়েছিলেন। এরই যুক্তিতে বহুদেববাদ এবং সম্প্রদায়-বিচ্ছিন্নতাকে তিনি দূর করতে চেয়েছিলেন। সাম্প্রদায়িক চেতনা থেকেই শতসহস্র প্রথা এবং দেশাচারের উদ্‌ভব। কু-সংস্কার বলে প্রতিভাত দেশাচারগুলিকে দূর করতে হলে ধর্মের সংস্কার প্রয়োজন। এমন এক ধর্ম চাই যার থেকে অনৈক্য প্রশ্রয় না পায়। পরে রামমোহন যখন খ্রীস্টান পাদ্রীদের সঙ্গে বিতর্কে অবতীর্ণ হলেন, তখনও ত্রিত্ববাদকে আক্রমণের সেই একই উদ্দেশ্য ছিল, যদিও খ্রীস্টান নীতিবোধকে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্বীকার করেছিলেন। জেরেমি বেন্থামের মানবহিতবাদ, ফরাসী বিপ্লবের মানবমুক্তির বাণী—এসবই রামমোহনের নীতিবোধকে জাগ্রত করেছিল।

আমরা জানতে চাই রামমোহন কি কোনো সামগ্রিক জীবনতত্ত্ব উপলব্ধি করেছিলেন, যার থেকে সমাজ ও নীতির সংস্কার-প্রেরণা এসেছিল? অথবা পরবর্তী কালের নব্যবঙ্গের মতো সংস্কারচেষ্টা খণ্ডরূপে মাত্র দেখা দিয়েছিল,—কোনো মূল সমন্বিত তত্ত্ব থেকে অনুপ্রাণিত নয়? এর উত্তর দেওয়া শক্ত। কারণ, রামমোহনের কোনো নির্ভরযোগ্য আত্মচরিত যেমন নেই, তেমনি রচনাগুলিও উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক অথবা গ্রন্থসম্পাদনা মাত্র। বেদান্তের শঙ্কর-ভাষ্যকে তিনি অবলম্বন করেছিলেন। শঙ্করের দর্শন একটি পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব। ব্যাবহারিক পারমার্থিক এবং এ-দুয়ের মধ্যবর্তিনী মায়াশক্তিকে স্বীকার করে জীবন ও জগতের একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন দার্শনিক শঙ্কর। অনেকে বলেন, শঙ্কর-স্বীকৃত ব্যাবহারিক অস্তিত্বকে মেনে নিয়েছিলেন বলেই লোকশ্রেয়র কর্তব্যকে রামমোহন বরণ করেছিলেন। তা যদি হয় তবে রামমোহন

কি বঙ্কিমের মতো পারমার্থিক তত্ত্বের প্রয়োগকে লঘু করে ব্যাবহারিক তত্ত্বের উপরেই জোর দিয়েছিলেন? খ্রীস্টানরা বিশেষত পরবর্তী কালে ডাফ বেদান্তধর্মকে আক্রমণ করেছিলেন এই বলে যে, অদ্বৈতবাদে নীতির স্থান নেই। ব্যাবহারিক জগৎ অস্তিত্বহীন হলে নীতিবাদও অর্থহীন হয়ে যায়। এখানে স্মরণীয়, লর্ড আমহার্স্টকে লেখা বিখ্যাত শিক্ষাবিষয়ক পত্রে (১৮২৪) রামমোহন বেদান্তধর্মকে সমালোচনা করেছিলেন। সে সমালোচনা ব্যঙ্গের সুরে ধ্বনিত। অথচ রামমোহন-রচিত গানে অদ্বৈতানুভূতিকে কোনো রকমে তুচ্ছ করা যায় না। শঙ্করের ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করলে ঊনবিংশ শতাব্দীর লোকশ্রেয়ের জন্য আত্মোৎসর্গ পরিহাসই হয়ে দাঁড়ায়। জীবনকে স্বপ্নের মতো মাত্র মনে হলে ব্যাবহারিক প্রয়োজনে সন্ধি করে বেঁচে থাকা যায় মাত্র—তার জন্য সমস্ত জীবন দান করা যায় না। সুতরাং সেকালে যাঁরা আত্মোৎসর্গ করেছেন তাঁরা ব্যাবহারিক সত্যকে স্বপ্নপ্রভ ভাবেন নি, স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মের মতোই অবিচল বলে বিশ্বাস করেছেন। দুটোই সমান সত্য বলে বিশ্বাস করার অর্থ অদ্বৈতবাদকে অস্বীকার করা। অথচ রামমোহন কখনো সজ্ঞানে দ্বৈতবাদী নন। এই বিরোধিতা এমন কিছু বিস্ময়ের নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত সাধক রামপ্রসাদের ধর্মমতও এরকম বিচিত্র ছিল। একদিকে তিনি আচার ধর্ম পূজা তীর্থভ্রমণ প্রভৃতির নিরর্থকতা নিয়ে গান রচনা করেছেন আর একদিকে কালীর আরাধনায় প্রগাঢ় ভক্তিবাদের পরিচয় দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে রামপ্রসাদের জীবনীকার ঈশ্বর গুপ্তের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য[১]—

'পরন্তু যদিও রামপ্রসাদ সেন প্রতি গানেই কালী দুর্গা তারা শিবে ইত্যাদি দেবীর নামোল্লেখ করিয়াছেন এবং ঐ নাম বদনে অহর্নিশি উচ্চারণ করিতেন, ফলতঃ তিনি এক ঈশ্বরবাদী ছিলেন; পরব্রহ্মের কাল্পনিক মূর্তি ও রূপাদি মনে মনে ঘৃণা করিতেন তবে দেশ কাল পাত্র বিবেচনানুসারে বাহ্যে কালী কালী শব্দ করিতেন। তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সময়ে ছিলেন এবং তাঁহার অধিকারে বাস করিতেন, সুতরাং ভীত হইয়া প্রচলিত ধর্মানুযায়ী প্রকাশ্য উপাসনাদি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।'

ঈশ্বর গুপ্তের মনীষা প্রখর ছিল না। তাই তাঁর ব্যাখ্যাটি দুর্বল তো বটেই হাস্যকরও। তা না হলে তিনি দেখতে পেতেন তন্ত্রদর্শনের মধ্যে দ্বৈত এবং অদ্বৈতের সমন্বয় হয়েছে। যাকে শিবশক্তিবাদ বলে সেটা নিষ্কল নির্বিকল্প অবস্থার অদ্বৈতানুভূতির সঙ্গে গতিশীল জাগতিক পরিণামের সমন্বয়ের তত্ত্ব। তন্ত্রে উপাসনা আছে আবার শিবত্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যও আছে। রামমোহনের রচনার বহুস্থলে মহানির্বাণতন্ত্রের

১ 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-রচিত কবিজীবনী', ১৯৫৮, পৃ ৮২

থেকে সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করে উপাসনা এবং লোকশ্রেয়র সমর্থন আছে। রামমোহন স্পষ্টত নিজের মত বুঝিয়ে না দিলেও কে জানে তন্ত্রই অগোচরে তাঁর জীবনদর্শন তৈরী করেছিল কিনা[১]।

কিন্তু আর কিছু না হোক রামমোহনের মতো বলিষ্ঠ বৈদান্তিকের চিন্তাধারার মধ্যেও দ্বৈতবাদের বীজ রয়ে গেল। অতঃপর বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ একেবারেই অচল হয়ে পড়ল। এরপর যাঁরাই এসেছেন কোনো না কোনো রূপে দ্বৈতবাদ ও ভক্তিধর্মকে না মেনে পারেন নি। ওই শতাব্দীর শেষের দিকে শিবনাথ শাস্ত্রী তো অদ্বৈতবাদের স্পষ্টই নিন্দা করেছেন[২]—

'যদি জীবন চাও তবে সেই মঙ্গলময় পুরুষে প্রীতিস্থাপন কর ভক্তিমার্গের পথিক হও। এখানে বেদান্তমতাবলম্বী হয় তো তর্ক তুলিবেন। তিনি প্রশ্ন করিবেন যে পদার্থ নির্গুণ যাহা অজ্ঞেয় তাহাতে প্রীতি স্থাপন করিব কিরূপে? ও ঢেঁকির কচকচি অনেক শুনিয়াছি। ব্রহ্মের দুই ভাব শাস্ত্রে প্রথিত আছে। ব্রহ্মের যে দিক সৃষ্টিলীলায় অভিব্যক্ত এই জড়জগতে ও মানবজীবনে অভিব্যক্ত তাহা তাহার ঈশ্বরভাব আর যে ভাব সৃষ্টিলীলার অতীত তাহা নির্গুণ ব্রহ্মভাব। এই নির্গুণ ব্রহ্মভাব লইয়া কে টানাটানি করিতেছে?···বেদান্তের নামে এই রূপান্তরিত নাস্তিকতা হইতে আমাকে দূরে রাখ।'

ইতিমধ্যে দেবেন্দ্রনাথ এবং কেশবচন্দ্রের দ্বারা ব্রাহ্মধর্মের যে পরিবর্তন সাধিত হল তাতে ভক্তিধর্মেরই পথ প্রশস্ত হয়েছে, অদ্বৈততত্ত্ব একেবারে পিছনেই পড়ে থাকল। সকলেই জানেন দেবেন্দ্রনাথই ব্রাহ্মধর্মের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। আত্মচরিতে তিনি বলেছেন[৩]—

'বেদান্ত দর্শনকে আমরা শ্রদ্ধা করিতাম না, যে হেতুক তাহাতে শঙ্করাচার্য জীব আর ব্রহ্মকে এক করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমরা চাই ঈশ্বরকে উপাসনা করিতে। যদি উপাস্য উপাসক এক হইয়া যায় তবে কে কাহাকে উপাসনা করিবে? অতএব বেদান্ত দর্শনের মতে আমরা মত দিতে পারিলাম না। আমরা যেমন পৌত্তলিকতার বিরোধী, তেমনি অদ্বৈতবাদের বিরোধী।'

সুতরাং রামমোহনের পর ধর্মচিন্তা ভক্তিবাদের দিকেই ফিরেছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে ভক্তিধর্মের অভ্যুত্থান হয়েছে বলে যে মত

১ এ প্রসঙ্গে শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাসের আলোচনা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। দ্রষ্টব্য 'রামমোহন রায়ের ধর্মমত ও তন্ত্রশাস্ত্র', বিশ্বভারতী পত্রিকা ষোড়শ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা।

২ প্রবন্ধাবলী, ১৩১১, পৃ ১৬৫-৬৬

৩ আত্মচরিত, ৭ পরিচ্ছেদ

প্রচলিত সে মতটি আংশিক সত্য মাত্র। এ দেশের মননধারা রামমোহনের পরেই ভক্তিবাদের পথে অগ্রসর হয়েছে ; পার্থক্য এই যে ব্রাহ্মধর্মে প্রতিমাপূজা নেই। এর মধ্যে বরং বিবেকানন্দের ধর্মচিন্তায় বিশিষ্টতা আছে। পরবর্তী ব্রাহ্ম নায়কগণ অদ্বৈতবাদকে সমালোচনা করেছেন, কিন্তু বিবেকানন্দ অদ্বৈতবাদকে প্রবলভাবেই সমর্থন করেছেন এবং সেই সঙ্গে প্রতিমাপূজা ও ভক্তিধর্মের প্রয়োজনীয়তার উপরেও সমান জোর দিয়েছেন। মনে রাখা দরকার রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ছিলেন তন্ত্রোপাসক। মাঝখানে রামমোহন-পরবর্তী ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করেছে বৈষ্ণবীয় ভক্তিবাদের পথ।

দেবেন্দ্রনাথ উপাস্য-উপাসকের সম্পর্ক স্থাপন করবার জন্য দ্বৈতবাদকে স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু আমাদের বিবেচ্য জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব। এই জগতের কঠোর স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে মেনে না নিলে লোকশ্রেয় লঘু হয়ে পড়ে। দেবেন্দ্রনাথ যে ঠিক সেই নৈতিক প্রয়োজনের যুক্তি ভেবেই দ্বৈতবাদী হয়েছিলেন, তা নয়। তিনি ছিলেন ঈশ্বরপরায়ণ। উপাসনার দিক ভেবেই বিশেষ করে এই তত্ত্বকে বরণ করেছিলেন। কিন্তু এই ঈশ্বরপরায়ণতা গভীর শ্রদ্ধাযোগ্য হলেও তার মধ্যে অভিনবত্ব কিংবা যুগোপযোগিতা নেই। এই দ্বৈতবাদ ব্যক্তিরই সাধ্য এবং এই জন্য সমষ্টির অনুকূল নয়। দেবেন্দ্রনাথের পরবর্তী কালে এই দ্বৈতবাদ ঠিক এইভাবে অক্ষুণ্ণ থাকে নি। বঙ্কিমচন্দ্র যে দ্বৈতবাদের সমর্থক ছিলেন, সে দ্বৈতবাদ উপাসনামুখ্য নয়—সমষ্টির কল্যাণচিন্তায় প্রবুদ্ধ দ্বৈতবাদ। এ দিক দিয়ে রামমোহনের সঙ্গেই বরং তার মিল, যদিও রামমোহন বৈষ্ণবধর্মকে সহ্য করতে পারেন নি। বৈষ্ণবধর্ম ব্যক্তির সাধ্য, উপাসনা-প্রধান, সমষ্টিচেতনায় বলিষ্ঠ নয়।

দেবেন্দ্রনাথের ভক্তিধর্ম ব্যক্তিকেন্দ্রিক হলেও এক সঙ্গতি-প্রাপ্ত যুক্তিধারাকে মেনে নিয়েছিল। খ্রীস্টানদের সঙ্গে বাদবিতর্কের ফলে এবং অক্ষয়কুমার দত্তের প্রভাবের ফলে[১] বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্মের জায়গায় তিনি গ্রহণ করে নিলেন 'আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়'-ভিত্তিক ব্রাহ্মধর্মকে। শাস্ত্রলিখিত স্ববিরোধী অনুপযোগী বাণীতে অন্ধ বিশ্বাস বর্জন করে শিক্ষিত ঈশ্বরভক্ত মন আপন আদর্শ দিয়ে শাস্ত্রবাণীকে বেছে নিল। সংকলিত শাস্ত্রে অসংগতি থাকল না, কিংবা স্ববিরোধিতাও থাকল না। সুতরাং এর পিছনে এক যুক্তিবোধ সক্রিয় ছিল যদিও সেই যুক্তি ঠিক বৈজ্ঞানিক বা ইউটিলিটারিয়ান যুক্তি নয়। এজন্য দেবেন্দ্রনাথের উক্তিটি খুবই অর্থপূর্ণ। জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ

১ কিশোরীচাঁদ মিত্র বলেছেন, বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস ত্যাগের মূলে ছিল কাশীতে দেবেন্দ্রনাথ-প্রেরিত পণ্ডিতদের শাস্ত্রানুসন্ধান। দ্রষ্টব্য *Calcutta Review* 1864, **Phases of Hinduism, pp 368-376**

হৃদয়ে আত্মপ্রত্যয় দেখা দিলেই এই যুক্তিবোধ আসে। কোনো বহিরঙ্গ (অর্থাৎ কোনো বৈজ্ঞানিক বা প্রাকৃতিক নীতিনিয়মের) মানদণ্ড দিয়ে এই যুক্তি রচিত নয়। অক্ষয়-কুমারের সঙ্গে এখানে তাঁর পার্থক্য, বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গেও। দেবেন্দ্রনাথের এই 'আত্ম-প্রত্যয়' আধুনিক বাঙালীর মননের ক্ষেত্রে এক নতুন পথ নির্মাণ করল। সে পথে গিয়েছিলেন দেবেন্দ্রনাথের অনুচর কেশবচন্দ্র। এর নাম Intuition বা স্বতঃস্ফূর্ত-জ্ঞান। কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথের ভক্তিপথেরই পথিক ছিলেন। কিন্তু অবশেষে তিনি খ্রীষ্টীয় ভক্তিবাদের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পাপতত্ত্বে বিশ্বাস করেছিলেন। বিবেকানন্দের ভক্তি-বাদের মধ্যে অদ্বৈতবাদের যে দৃঢ় ভিত্তির কথা উল্লেখ করেছি, সেটাই তাঁর মধ্যে প্রচণ্ড প্রত্যয় এবং স্বতঃস্ফূর্তজ্ঞানের আসন রচনা করেছিল। কেশবচন্দ্র অসাধারণ শক্তিমান্ পুরুষ এবং বিবেকানন্দের মতোই দুর্লভ কর্মব্রতী মহানেতা। কিন্তু কেশবের শক্তি তাঁর আত্ম-প্রত্যয়সিদ্ধ আবেগে—যুক্তিবাদিতায় ততখানি নয়। বিপিনচন্দ্র পাল বর্ণনা করেছেন[১]—

When Keshab developed a new theology built partly upon the Intuitionalist School of European philosophy and partly upon Carlyle's Hero Worship and Emerson's Representative Man and indirectly commenced to claim for himself and the Brahmo Missionaries associated with him, some sort of special, if not supernatural, authority as the ordained messengers of a New Dispensation, the old unpopularity of the Brahmo Samaj was considerably increased.

এই Intuition বা স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞানের অধিকার লাভ করে কেশব *Great Man* (১৮৬৬) বক্তৃতায় বলেছিলেন—

Thus great men are superhuman, and I may add, supernatural, but there is nothing miraculous about them in the popular sense of that word—there is no deviation from the established laws of nature. Great men like comets move in eccentric orbits.

মহাপুরুষরা ধূমকেতুর মতো এমন নীতি দ্বারা চালিত হন, যে-নীতি তাঁদের নিজের—এই উক্তির দ্বারা আসলে যুক্তিধর্মের মূলেই আঘাত করা হয়েছে। এর ফলে অলৌকিক তত্ত্বের প্রশ্রয় পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

দেবেন্দ্রনাথ যখন বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস ত্যাগ করে আত্মপ্রত্যয়ের উপর

১ Bipin Chandra Pal, *Memories of my Life and Times*, 1932, p 237

দাঁড়িয়েছিলেন, তখন তিনি যে যুক্তিবাদিতার প্রভাবকে স্বীকার করেছিলেন, সে হচ্ছে অক্ষয়কুমারের। অক্ষয়কুমার যুক্তিকেই—যে যুক্তি প্রাকৃতিক নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত, চরম বলে মেনে নিয়েছিলেন কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ প্রাকৃতিক নিয়মের একান্ত নির্ভর ত্যাগ করে আত্মপ্রত্যয় দিয়ে যুক্তিধারা তৈরী করে নিয়েছিলেন। ফলে সেই সময় দুটি দল দেখা দিল— একটি দল বিশুদ্ধ যুক্তিপন্থী, আর একটি দল আত্মপ্রত্যয়বাদী। কেশব এসেছিলেন দ্বিতীয় দলের অনুবর্তন করে। অক্ষয়কুমার অবশ্য ধর্মের দিক দিয়ে জীবন-নীতির কথা চিন্তা করেন নি, খাঁটি বৈজ্ঞানিকের মতো প্রাকৃতিক নিয়ম থেকে মানুষের কর্তব্যনীতির সমাধান করেছেন। আবার কেশবচন্দ্রের নীতিজ্ঞান এবং সমাজভাবনার সঙ্গে ঈশ্বরচিন্তা সমানভাবেই জড়িত ছিল। ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দের একটি বক্তৃতায় কেশবচন্দ্র বলেছিলেন, সমাজসংস্কার ধর্মের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।[১] ধর্ম চিত্তশুদ্ধির সহায়ক ; ঈশ্বরভাবে পূর্ণ করে ধর্ম পাপের মূলে কুঠারাঘাত করে। এইজন্য সমাজসংস্কারের পূর্বে ধর্মসংস্কারের প্রয়োজন। কেশবচন্দ্র আত্মপ্রত্যয় (Intuition) দ্বারাই চালিত হয়েছেন। তাঁর 'জীবনবেদে'র মধ্যে আত্ম-প্রত্যয়ের প্রজ্বলন্ত শিখা পাঠককে স্পর্শ করে। এইজন্য সেই ভাষার মধ্যে এমন অপূর্ব কাব্যগুণ আসতে পেরেছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র কেশবকে 'শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ' বলে আখ্যাত করলেও এবং তাঁর ভাষার গুণে মুগ্ধ থাকলেও মনীষার দিক দিয়ে যথেষ্ট ব্যবধান রক্ষা করেছিলেন। কেশবচন্দ্রের সমাজচিন্তা বঙ্কিমকে উদ্বুদ্ধ করে থাকবে। ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'সুলভসমাচারে' কেশবচন্দ্র দেশের বাস্তব অবস্থা নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করেন। এখানে বিশেষ করে দুটি প্রবন্ধ 'প্রজাদিগের দুরবস্থা' (১২৭৭, ৮ অগ্রহায়ণ) এবং 'প্রজাপীড়ন' (১২৭৭, ৫ম সংখ্যা)-এর উল্লেখ করব।[২] বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের কৃষকের অবস্থা কেশবচন্দ্র ইতিপূর্বে এ প্রবন্ধ দুটিতে বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু কেশবচন্দ্রের সহজ উপলব্ধি বা প্রত্যাদেশ শেষ পর্যন্ত তাঁকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তা দেখেছিলেন। এই 'প্রত্যাদেশ' যুক্তিবোধকে আচ্ছন্ন করে মিস্‌টিসিজ্‌ম্ বা অতীন্দ্রিয়তার দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। আমরা মনন-সাধনার দিক দিয়েই দেখছি, কেশবের অতীন্দ্রিয়তায় অধ্যাত্ম-উপলব্ধির সার্থকতা নিহিত থাকতে পারে, কিন্তু যুক্তি এবং মনীষা অন্য বস্তু। এটাও ঠিক যে মিস্‌টিসিজ্‌মের সঙ্গে রসের সম্পর্ক যত গভীর, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে যুক্তিবোধের সম্পর্ক সেই পরিমাণেই গভীর।

১ P. S. Basu, *Life and Works of Brahmananda Kashav*, 1940, p 62

২ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 'কেশবচন্দ্র ও সেকালের সমাজ'

বঙ্কিমচন্দ্র চেয়েছেন চিন্তাশক্তিকে জাগাতে। সহজ জ্ঞান বা প্রত্যাদেশের উপর নির্ভর করার বিপজ্জনকতা কোথায় তা তিনি জানতেন। অক্ষয়কুমার দত্তের যুক্তিবাদিতার দীক্ষায় তিনি দীক্ষিত ছিলেন। প্রাকৃতিক নিয়মের ফল তিনি জানতেন; মানুষের অন্তর্জীবনকে যে বাইরের শক্তি প্রভাবিত করতে পারে, এ বিষয়েও তাঁর সংশয় ছিল না। এইজন্য বঙ্কিমের ভক্তিবাদের আলোচনাকে কারও কারও কাছে 'বুদ্ধিবৃত্তির ক্রিয়া' কিংবা 'অধ্যাত্মদৃষ্টির ক্ষীণতা' বলে মনে হয়েছে। ধর্মতত্ত্বে 'ভক্তি'র বিস্তৃত আলোচনা না থাকলে কী ক্ষতি হতো? অক্ষয়কুমারের মধ্যে যে এই দিকটি নেই, তাতে তাঁর চিন্তার কিছু কি মূল্যহানি হয়েছে? আমরা ইতিপূর্বে বলেছি, ঈশ্বরোদ্দিষ্ট ধর্ম বলতে বঙ্কিমচন্দ্র স্বার্থহীন কালিমাহীন জীবনকর্মকেই বুঝেছেন। স্বার্থের বন্ধন থেকে মুক্তি দেবার জন্য কর্মকে নৈর্ব্যক্তিক উদ্দেশ্যে নিবেদনের আদর্শ তিনি স্থাপন করেছেন। ব্যক্তির সুখ স্বভাবতই স্বার্থপর; একে সংযত করা যায় অক্ষয়কুমার-নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক নিয়মের সহযোগিতা করে। ব্যক্তিসুখ ক্রমে ক্রমে স্বার্থপরতার সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হতে থাকে যখন সুখসন্ধান সমাজ দেশ এবং ঈশ্বরে প্রসারিত হতে থাকে। দেবেন্দ্রনাথ-যে ঈশ্বর এবং জীবের দ্বৈত সত্তাকে স্বীকার করেছিলেন, তা পরস্পরের মধ্যে উপাস্য-উপাসকের সম্পর্ক স্থাপন করতে আর বঙ্কিমচন্দ্র দ্বৈতসত্তাকে স্বীকার করেছিলেন কর্ম এবং কর্মের লক্ষ্যকে স্থাপন করতে। বস্তুত দেবেন্দ্রনাথের দ্বৈতবাদিতা থেকেই বঙ্কিম-কল্পিত কর্মপ্রেরণাকে ধরে নেওয়া যেত যদি দেবেন্দ্রনাথ সবটুকু উদ্দেশ্যই শুধু প্রার্থনার উপরেই আরোপ না করতেন। রাজনারায়ণ বসু যে ব্যক্তির বৃত্তির অনুশীলন এবং জাতীয়তাবোধের আদর্শ প্রচার করেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তার প্রভেদ অল্পই। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তো স্পষ্টই বলেছিলেন[১]—

'অনুরাগ-সোপানের গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত এই কয়টি পংক্তি অর্থাৎ পইটে উপর্যুপরি সাজানো রহিয়াছে, (১) প্রাণানুরাগ অর্থাৎ আপনার শারীরিক প্রাণের অনুরাগ; (২) গৃহানুরাগ অর্থাৎ পরিবারের প্রতি অনুরাগ (পরিবার এক প্রকার মানসিক প্রাণ ইহা বলা বাহুল্য); (৩) কুলানুরাগ অর্থাৎ আত্মীয় স্বজন জ্ঞাতি গোষ্ঠীর প্রতি অনুরাগ; (৪) দেশানুরাগ, (৫) সার্বভৌমিক অনুরাগ অর্থাৎ সার্বদেশিক মনুষ্যের প্রতি অনুরাগ; (৬) ঈশ্বরানুরাগ।'

এই সমন্বিত জীবনের তত্ত্বই বঙ্কিম আলোচনা করেছেন ধর্মতত্ত্বে। বঙ্কিমের কল্পিত স্তরগুলিও ঠিক দ্বিজেন্দ্রনাথেরই কল্পিত পংক্তির মতো। দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি

১ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'নানাচিন্তা', 'সাধনা—প্রাচ্য ও প্রাতীচ্য' পৃ ২১

প্রকাশিত হয়েছিল ধর্মতত্ত্বের অনেকদিন পর ১২৯৯ সালে। বঙ্কিমচন্দ্র থেকেই তিনি এই চিন্তা পেয়েছিলেন, এ কথা পুরোপুরি সত্য না হতে পারে। কারণ সেকালের যুগচিন্তা যে এই রকম সমন্বয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তা মনোযোগী মাত্রই লক্ষ্য করবেন। বঙ্কিমচন্দ্র এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ এই ভাবসম্পদকেই স্পষ্ট করে তুলেছিলেন। শুধু কৌতুকজনক এই যে বঙ্কিমের প্রথম প্রবন্ধে ব্যক্তিসুখের আলোচনা দেখে দ্বিজেন্দ্রনাথই আক্রমণ করেছিলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে ধৈর্য ধরতে অনুরোধ করেছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত ভক্তিধর্মের সঙ্গে বঙ্কিম-কল্পিত ধর্মের মূল পার্থক্য কোথায় বঙ্কিমের গীতাব্যাখ্যা এবং দ্বিজেন্দ্রনাথের গীতাব্যাখ্যার তুলনা করলেই বোঝা যায়। বঙ্কিম গীতার ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। যেটুকু ব্যাখ্যা করেছিলেন তাতে কর্মবাদের উপরেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। অলিখিত ব্যাখ্যানে তিনি কোন্ পথ অবলম্বন করতেন তার ইঙ্গিত অবশ্য ধর্মতত্ত্বেই পাওয়া যায়। পরা এবং অপরা দুরকম জ্ঞানের চর্চার কথা তিনি বলেছেন। কর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞান লাভ করতে হবে, দুয়ের সংযোগ ও সামঞ্জস্য চাই। জ্ঞান ও কর্মের সমবায়েই ভক্তি। এই প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন, জ্ঞানের ও কর্মের সংযোগ শঙ্করাচার্যের মতবিরুদ্ধ[১]—

'তাঁহার মতে জ্ঞান কর্মে সমুচ্চয় নাই। শঙ্করাচার্যের মতের যাহা বিরোধী শিক্ষিত সম্প্রদায় ভিন্ন আর কেহ আমার কথায় এখনকার দিনে গ্রহণ করিবেন না, তাহা আমি জানি। পক্ষান্তরে ইহাও [বলা] কর্তব্য যে শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি ভক্তিবাদীগণ শঙ্করাচার্যের অনুবর্তী নন।'

বঙ্কিম আরো বলেন[২]—

'কাম্য কর্মের ত্যাগই সন্ন্যাস, নিষ্কাম কর্মই সন্ন্যাস, নিষ্কাম কর্মত্যাগ সন্ন্যাস নহে। যেদিন ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প এবং ভারতবর্ষের এই নিষ্কাম ধর্ম একত্রিত হইবে সেইদিন মনুষ্য দেবতা হইবে। তখন ঐ বিজ্ঞান ও শিল্পের নিষ্কাম প্রয়োগ ভিন্ন সকাম প্রয়োগ হইবে না।'

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতাপাঠে'ও বক্তব্যটা এই। হয় তো বঙ্কিম কর্মের উপর যতটা তাৎপর্য আরোপ করেছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ততটা করেন নি। তিনি পিতার অনুসরণে ঈশ্বরপ্রাণতার কথাই বিশেষভাবে বলেছেন। বঙ্কিমের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য এবং পার্থক্য দ্বিজেন্দ্রনাথের এই ব্যাখ্যাতেই বোঝা যাবে[৩]—

১ ধর্মতত্ত্ব, ১৫ অধ্যায়

২ ধর্মতত্ত্ব ১৬ অধ্যায়।

৩ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতাপাঠ, ১৩২২, পৃ ২৪৭-২৪৯

'শঙ্করাচার্যের মতো অত বড় একজন পাকা মাঝি জ্ঞানতরীকে অজ্ঞানসমুদ্রের সারাপথ নির্বিঘ্নে পার করাইয়া আনিয়া মোক্ষডাঙায় পৌঁছিবার সমকালে যদি কিনারায় নৌকাডুবি করেন তবে তাহাতে কী প্রমাণ হয়? তাহাতে প্রমাণ হয় এই যে, নৌকার তলায় কোনো-না-কোনো স্থানে ছিদ্র আছে। সে ছিদ্র হচ্ছে কঠোর অদ্বৈতবাদ। গীতাশাস্ত্রের কোথাও কিন্তু সেরূপ ছিদ্রও নাই—তাহার কথাও নাই।'

দ্বিজেন্দ্রনাথ অতঃপর শঙ্করের একটি প্রশ্ন এবং তার মীমাংসা আলোচনা করেছেন—

'কিং সর্বান্ বিকারালম্বনান্ অবিশেষেণৈব অমানবঃ পুরুষঃ প্রাপয়তি ব্রহ্মলোকং উত কাংশ্চিদেব—যাঁহারা ঈশ্বরের স্বরূপাতিরিক্ত বিকার (অর্থাৎ ঈশ্বরের কোনো প্রকার প্রাকৃত আবির্ভাব) অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করেন—সবাই কি তাঁহারা নির্বিশেষে দিব্য পুরুষ কর্তৃক ব্রহ্মলোকে নীত হন অথবা—কেহ বা নীত হন—কেহ বা হন না?

ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে এই যে—প্রতীকালম্বনান্ বর্জয়িত্বা সর্বান্ অন্যান্ বিকারালম্বনান্ নয়তি ব্রহ্মলোকং।—বিকারালম্বীরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত (১) প্রতী-কোপাসক অর্থাৎ প্রতিমাদিপূজক এবং (২) সগুণ ব্রহ্মোপাসক। বিকারালম্বীদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রতিমাদি পূজক তাঁহারাই কেবল ব্রহ্মলোকে নীত হন না; পরন্তু যাঁহারা সগুণ ব্রহ্মোপাসক—সকলেই তাঁহারা ব্রহ্মলোকে নীত হন।'

বিকারালম্বীর দুই শ্রেণীর মধ্যে প্রথম শ্রেণীর মতাশ্রয়ী হবেন বঙ্কিমচন্দ্র এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর মতাশ্রয়ী হবেন দ্বিজেন্দ্রনাথ বা দেবেন্দ্রনাথের আদি ব্রাহ্মসমাজ। এখানেই ভক্তিবাদের মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্র এবং ব্রাহ্মদের মধ্যে পার্থক্য। প্রতীকোপাসনা থেকেই অবতারবাদ এবং তার থেকে এসেছিল বঙ্কিমের পূর্ণ মানবতার কল্পনা। কৃষ্ণকে বঙ্কিম অবতার বলে বিশ্বাস করলেও প্রচলিত রীতিতে তাঁকে অলৌকিক করে তোলেন নি। বরং তাঁকে করেছিলেন মানসিক বৃত্তির সর্বাঙ্গীন্ উৎকর্ষপ্রাপ্ত যুক্তিবুদ্ধি-সম্মত কর্মক্রিয়ার নেতারূপে। কিন্তু যে ভক্তিবাদে প্রতীকোপাসনা আছে তার প্রতি আস্থা ছিল না বলে বঙ্কিমকল্পিত আধুনিক অবতারতত্ত্বকে ব্রাহ্ম চিন্তাধারা মেনে নিতে পারে নি। দেবেন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রনাথকে কৃষ্ণচরিত্র-ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করতে বলে-ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ স্মৃতিকথায় বলেছেন[১]—

'বঙ্কিমবাবু ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন যখন তাঁহার কৃষ্ণচরিত্রের সমালোচনা আমি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় করিলাম। তিনি তখন প্রচারের সম্পাদক, আমি পত্রিকার

১ বিপিনবিহারী গুপ্ত, 'পুরাতন প্রসঙ্গ' ২য় পর্যায়, বিদ্যাভারতী সংস্করণ, পৃ ২৯০

সম্পাদক। পত্রিকায় সমালোচনা বাহির হইবার পর তিনি প্রচারে এমনভাবে লিখিলেন যেন সমালোচনা আমার লেখা নহে—কর্তা স্বয়ং লিখিয়া দিয়াছেন। কিন্তু বাবা তখন অত্যন্ত পীড়িত। তাঁহার সঙ্গে তখন আমি চুঁচুড়ায় ছিলাম বটে; কিন্তু তিনি দোতলার উপরে শয্যাগত ছিলেন। তিনি আমাকে এইটুকু মাত্র বলিয়াছিলেন —'দেখ, বঙ্কিম যে রকম করে কৃষ্ণচরিত্রের আলোচনা করছে, তার একটা প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক।' তাই আমি প্রতিবাদ করিয়া পত্রিকায় লিখিয়াছিলাম।'

দ্বিজেন্দ্রনাথের বক্তব্য, বৃন্দাবনের কৃষ্ণ এবং মহাভারতের কৃষ্ণ একই ব্যক্তি। কৃষ্ণকে তিনি ঐতিহাসিক চরিত্র বলেই মনে করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রও কৃষ্ণকে ঐতিহাসিক মনে করেছেন কিন্তু নীতিবোধনির্বিদ্ধ কার্যকলাপকে তিনি অস্বীকার করতে চেয়েছেন। কৃষ্ণকে অবতার মনে করেছিলেন বলেই অস্বীকার করতে হয়েছে। তাঁকে দোষত্রুটিপূর্ণ মানুষ মনে করলে এই ব্যাখ্যার প্রয়োজন থাকে না। পরবর্তী ব্রাহ্মধর্ম ভক্তিবাদকে বড়ো করে তোলায় ভক্তিবাদের প্রবক্তা শ্রীকৃষ্ণকে যথাপ্রাপ্য মর্যাদা দিয়েছে। আবার ভক্তিধর্মের সঙ্গে প্রতীকোপাসনার পূর্ণ সমন্বয়ের ফলে স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীকৃষ্ণকে সমগ্রভাবেই স্বীকার করেছিলেন যদিও বৃন্দাবনলীলার মিস্‌টিক-ব্যাখ্যা করা ছাড়া নীতিবোধমার্জিত মনের উপায় ছিল না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য কেশবচন্দ্রের অনুবর্তী উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণের জীবনী আলোচনা করেছিলেন বঙ্কিমের পূর্বেই। বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহদেবতা ছিলেন রাধাগোবিন্দ, সুতরাং কৃষ্ণ-চরিত্র পরিণত বয়সে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মনকে প্রশ্নাতুর করবে এটা বিস্ময়ের নয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য বোঝাবার জন্য আর একটি তথ্যেরও উল্লেখ প্রয়োজন। আদি ব্রাহ্মসমাজ উপাস্য-উপাসকের মধ্যে রসের যে সম্পর্ক স্থাপিত করেছিল, আমাদের প্রাচীন দর্শনে তার নাম ছিল বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। জীবনের মধ্যে রসমাধুর্যের স্পর্শ নিবিড় সৌন্দর্যের অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলে এবং তার থেকে উৎকৃষ্ট কাব্যসৃষ্টি হওয়াই সম্ভব। দর্শনের পরিভাষায়, রবীন্দ্রনাথের কাব্য 'সগুণ ব্রহ্ম' বা 'এক ও বিচিত্রে'র লীলায় নির্মিত। দেবেন্দ্রনাথের পরিবারে এই তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে কাব্যের যে আদর্শ তৈরী হয়ে উঠল, সমসাময়িক আদর্শ থেকে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। বঙ্কিম কাব্যের তত্ত্বে ইউটিলিটি মতবাদের অনুসরণে নীতিবাদের প্রসঙ্গ তুললেন, তাকে এঁরা মানতে পারলেন না। দ্বিজেন্দ্রনাথ-সম্পাদিত ভারতী পত্রিকাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যতত্ত্বের কঠোর সমালোচনা প্রকাশিত হল।[১]

বিপিনচন্দ্র পাল বলেছিলেন বঙ্কিমের অনুশীলন ধর্ম ব্রাহ্মধর্মেরই নামান্তর। বস্তুত

১ ভারতী, ১২৯৭ কার্তিক, 'কাব্যের উদ্দেশ্য'

ব্রাহ্মধর্মের প্রেরণা ও বিকাশের সঙ্গে অনুশীলন ধর্মের অনেক দিক দিয়েই মিল আছে। বঙ্কিম সাধারণত আদি ব্রাহ্মসমাজের সমালোচনা করেন নি। মতের মিল সব দিক দিয়ে না থাকলেও সমাজকে এবং সমাজের নেতাদের তিনি শ্রদ্ধা করতেন।[১] দেবেন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ—সকলের প্রতিই তাঁর শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্পর্ক ছিল। ঠাকুর পরিবারে তাঁর যাতায়াত ছিল।[২] অথচ বঙ্কিমচন্দ্র যখন ধর্মব্যাখ্যা করছেন সেই সময়ে প্রাচীন হিন্দুধর্মকে অপরিবর্তিত রাখবার চেষ্টা চলেছে। প্রাচীন হিন্দুধর্মের প্রবক্তাদের মধ্যে ভূদেব মুখোপাধ্যায়, শশধর তর্কচূড়ামণি, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন ব্রাহ্মদলভুক্ত ছিলেন না, তেমনি পুরোপুরি এঁদেরও দলভুক্ত বা সমধর্মী ছিলেন না। তিনি স্বাধীনভাবেই ধর্মালোচনা করেছিলেন। সে চেষ্টা শশধর তর্কচূড়ামণিরও ছিল বটে। সেইজন্য তাঁর অভিপ্রায় জেনে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রতি প্রথম আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু চূড়ামণি মহাশয়ের সামর্থ্য ও ব্যাখ্যাপ্রণালী দেখে বললেন[৩]—

'তর্কচূড়ামণি মহাশয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, তিনি এখনও বুঝিতে পারেন নাই যে নানাসূত্রে প্রাপ্ত নূতন শিক্ষার ফলে দেশ এখন উহা অপেক্ষা উচ্চ ধর্ম চায়। কি হইলে এ দেশের সমাজধর্ম 'এখন সর্বাঙ্গসুন্দর হয়, সে জ্ঞান এঁদের নাই, তাই যা খুশি বলিয়া লোকের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত।'

তর্কচূড়ামণি আসলে হিন্দুধর্মের কোনো পরিবর্তন চান নি। তিনি শুধু পুরনো প্রথাগুলির হাস্যকর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়েছিলেন। তর্কচূড়ামণির বক্তৃতার ফাঁক কোথায় পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশের সমালোচনা থেকেই বোঝা যাবে[৪]—

'এমন আশ্চর্য উপদেশ আমরা আর শুনি নাই। অগ্নির ধর্ম তাপ বলিলেন, জলের ধর্ম তরলতা বলিলেন, মনুষ্যের বেলা "সেইরূপ" বলিলেন, নাম বলিতে পারিলেন না। সুতরাং আমরা আমাদিগের ধর্ম কি তাহা জানিতে পারিলাম না। "যে গুণ বা প্রকৃতি

১ শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় দেখাবার চেষ্টা করেছেন, বঙ্কিম ব্রাহ্মবিদ্বেষী ছিলেন; দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রজীবনী প্রথম খণ্ড, ১৯৭০, পৃ ২০৩-২০৪। মতভেদ থাকলেও বঙ্কিমচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বিদ্বিষ্ট ছিলেন, এর সমর্থক কোনো উক্তি আমি পাই নি। বিষবৃক্ষ উপন্যাসের 'তারাচরণ' চরিত্র দিয়ে এর প্রমাণ হয় না। তারাচরণের মতো সুযোগসন্ধানী চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ করার উদ্দেশ্যই বঙ্কিমের ছিল। এই চরিত্রটি প্রগতিমূলক আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে হীন বাসনা চরিতার্থ করেছে।

২ 'বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৩ বঙ্কিম-প্রসঙ্গ পৃ ৯২

৪ কালীবর বেদান্তবাগীশ, 'শশধর তর্কচূড়ামণির বক্তৃতার সমালোচনা', ১২৯১, পৃ ৭-৮

বা স্বভাব থাকাতে আমরা মনুষ্য, যাহার হ্রাসে আমাদের মনুষ্যত্বের হানি, যাহা না থাকিলে আমাদের মনুষ্যত্ব থাকিতে পারে না সেই গুণ বা প্রকৃতি বিশেষই আমাদের ধর্ম।" ইহাতেও আমরা বুঝিতে পারিলাম না যে কোন্ গুণ বা কোন্ প্রকৃতি আমাদের ধর্ম। মানবপ্রকৃতি যদি মানবের ধর্ম হয়, মানবগুণ বা মানবত্ব যদি মানবের ধর্ম হয়, মানবের ধর্ম যদি অগ্নিতাপের তুল্যই হয়, তাহা হইলে তাহা করিতে হইবে কেন? সে ত স্বতঃসিদ্ধ?'

বঙ্কিমচন্দ্রও মনুষ্যত্বের ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু তাঁর ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট পরিচ্ছন্ন ঋজু। তাঁর বিদ্যা জ্ঞান ও প্রয়োগপ্রণালী ছিল অনেক ব্যাপক এবং নিখুঁত। তর্কচূড়ামণির এ সব বিষয়ে ধারণা ছিল নেহাৎই অস্পষ্ট। মনীষার বিচারে বঙ্কিমের সঙ্গে যদি কারো তুলনা চলে, তবে তিনি ভূদেব। ভূদেবের পরিচ্ছন্ন যুক্তি, স্পষ্ট তথ্যজ্ঞান, নিপুণ প্রয়োগপ্রণালী বঙ্কিমের অনুরূপ। বঙ্কিমের মতো ভূদেবও সমাজকল্যাণের চিন্তাই করেছেন। তবুও দুজনের মধ্যে অমিলও ছিল, যদিও ভূদেবকে তিনি গভীর শ্রদ্ধা করতেন। বঙ্কিম গড়তে চেয়েছেন যুগোচিত সত্যধারণাকে এবং এজন্য যুগের লক্ষণ-গুলির নিপুণ বিশ্লেষণ করেছেন। সেই সঙ্গে হিন্দুধর্মের যুগোপযোগী লক্ষণগুলিকে উদ্ধার করতে চেয়েছেন। যুগের বাণী প্রধানত তিনি কোমৎ মিল প্রভৃতির জড়-শাস্ত্র থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন। এজন্য হিন্দুধর্মের অনেক প্রথা এবং আচার বর্জনীয় মনে করতে তাঁর বাধে নি। ভূদেব তাঁর বিখ্যাত 'সামাজিক প্রবন্ধ' হিন্দুসমাজের বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ কর্তব্যের আলোচনা করেছেন। তাতে বর্তমান অবস্থার মধ্যে পাশ্চাত্য ভাবের লক্ষণগুলি খুব পরিষ্কার করেই তিনি দেখিয়েছেন—স্বার্থপরতা, উন্নতিশীলতা, সাম্য, ঐহিকতা, স্বাতন্ত্রিকতা, বৈজ্ঞানিকতা ও শাসনকর্তার সমাজ-প্রতিভূত্ব। এর প্রত্যেকটি নিয়েই তিনি বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। কোনোটিকে আংশিক স্বীকার করেছেন, কোনোটিকে অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে স্বার্থপরতা হিন্দুর নেই, উন্নতিশীলতা বিশ্বাসযোগ্য নয়, সাম্য অস্তিত্বহীন, ঐহিকতা পারত্রিকতার বন্ধনে বদ্ধ, স্বাতন্ত্রিকতা বা স্বাধীন বিচারবোধ হিন্দুর আছে, বৈজ্ঞানিকতা ইংরেজি শিক্ষার ফল নয়, শাসনকর্তাও সমাজপ্রতিভূ নয়।

ভূদেব কোনো নতুন সত্য-ধারণা (value) সৃষ্টি করতে চান নি। তিনি মনে করেছিলেন সমাজের ভিত্তিটি অটুট আছে এবং এর শক্তিও অক্ষুণ্ণ। যে জিজ্ঞাসা সমা-জের সামনে এসেছে, সেটা তাঁর কাছে কোনো উদ্বেগের বিষয় নয়। তিনি বলেন ঃ—

'হিন্দুদিগের মধ্যে শঙ্করবাদ এবং স্মার্তাচার যত ন্যূন হইয়া রামানুজাদি বিখ্যাত

১ ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সামাজিক প্রবন্ধ, 'পাশ্চাত্য ভাব—সাম্য'

দ্বৈতবাদের এবং রামানন্দ প্রভৃতি প্রদর্শিত ভক্তিমার্গের প্রাশস্ত্য জন্মিতেছে ততই হিন্দুর চিত্তে দৌর্বল্য অনুভূত হইতেছে।'

অর্থাৎ যে দ্বৈতবাদকে অবলম্বন করে আধুনিক বাংলার মননধারা গড়ে উঠেছে, ভূদেব তাতে দৌর্বল্য ছাড়া কিছু দেখলেন না। তিনি ছিলেন জ্ঞানপন্থী। শঙ্করের মতাবলম্বী হওয়ায় সামাজিক পরিবর্তনগুলি তাঁর কাছে অর্থহীন—কিছুই উদ্বেগজনক নয়। যে আচারপ্রণালী এককালে উদ্‌ভাবিত হয়েছিল, তারা কিছুই সার্থকতা হারায় নি। এমন অবস্থায় স্বাধীন বিচারবোধের প্রয়োজন তেমন থাকে না। যদি কর্তব্য নির্ণয়ে কখনো সিদ্ধান্ত করবার দরকার হয়, তাতেও মনুর নির্দেশ আছে—

বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভির্নিত্যমদ্বেষরাগিভিঃ।
হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো যো ধর্মস্তং নিবোধত ॥

এই শ্লোকটির প্রমাণে ভূদেব স্বাধীন চিন্তার অনুশাসন দেখিয়েছেন। কিন্তু সামাজিক বিধানে এর প্রয়োগের অবকাশ কমই হয়েছে। ভূদেবের 'আচারপ্রবন্ধ' 'পারিবারিক প্রবন্ধ' প্রভৃতি বই থেকে এটাই বোঝা যায়, আমাদের প্রাচীন একান্নবর্তী পরিবারের আদর্শে তাঁর বিশ্বাস অবিচল তো ছিলই, এর মধ্যে যে ভাঙন এসে যাচ্ছে সে কথাও বোধহয় ভূদেব গুরুতর ভাবে চিন্তা করেন নি।[১] আমাদের জড়-জীবনের ক্ষেত্রে যে কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়ম কাজ করে তার কঠোরতা তিনি কতখানি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলা কঠিন। এ বিষয়ে অক্ষয়কুমার দত্ত বা বঙ্কিমচন্দ্রের মতো অষ্টাদশ শতাব্দীর মননানুসারীর সঙ্গে তাঁর মিল ছিল না। ভৌগোলিক প্রকৃতির সঙ্গে অধ্যাত্মপ্রকৃতি মিলিত হয়ে জাতি যে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে থাকে, সার্বভৌম প্রাকৃতিক নিয়মে তাকে ফেলা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র 'সাম্য' প্রবন্ধে এ দিকটা ভাবেন নি কিংবা অধ্যাত্মপ্রকৃতিকে ভৌগোলিক প্রকৃতির অধীন বলেই ভেবেছিলেন। নাম উল্লেখ না করলেও বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনার এই ত্রুটি দেখিয়ে ভূদেব 'সামাজিক প্রবন্ধে'র সূত্রপাত করেছেন।[২]

বঙ্কিম সমাজের এক একটা দিক নিয়ে আলাদা ভাবে বিচার করেন নি। বিধবাবিবাহ বহুবিবাহ, অস্পৃশ্যতা, শিক্ষা প্রভৃতি এই শ্রেণীর খণ্ড সমস্যার আলোচনায় তিনি ব্যাপৃত হন নি। তিনি ছিলেন বুদ্ধিবাদী। জীবনের একটা পূর্ণাঙ্গ তত্ত্বের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং নির্মাণই তাঁর ছিল লক্ষ্য। মনুষ্যত্ব যদি জাগে তবে কোনটা সংস্কারযোগ্য, কোনটা নয়, এ তো শিক্ষিত বুদ্ধিতেই উদ্‌ভাসিত হবে। ভূদেবের কাছে জীবনতত্ত্ব নতুন কিছু

১ তুলনীয় একান্নবর্তী পারিবার'-প্রবন্ধ, বঙ্গদর্শন, ১২৭৯ আশ্বিন

২ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ

নয় সুতরাং তারই আলোতে তিনি সাময়িক প্রভাবগুলি পরীক্ষা করে দেখেছেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দেশীয় নব্যসমাজে স্থিতি ও গতি' প্রবন্ধ[১] এবং হেনরী কটন-এর সদ্য প্রকাশিত New India গ্রন্থের সমালোচনা-উপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র যে কথাগুলি লিখেছিলেন তার মধ্যে সেকালের সমাজ সম্পর্কে তাঁর মত সংক্ষেপে পরিচ্ছন্ন-ভাবে ব্যক্ত হয়েছে[২]—

'গতির বিষয়ে কি দ্বিজেনবাবু কি কটন সাহেবের কোন সন্দেহ নাই। আমাদের কাহারও কোন সন্দেহ নাই—হইবারও কোন কারণ নাই। তবে কটন সাহেব এমন কতকগুলি লক্ষণ দেখাইয়াছেন তাহাতে বুঝিতে হয় যে এই গতি বিলক্ষণ বেগবতী। অতএব স্থিতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। কি উপায়ে সেই স্থিতির বল অবিচলিত থাকে, উভয় লেখকই তাহার একটা উত্তর দিয়াছেন। এইখানে দুইজন লেখকের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়।

দ্বিজেনবাবু আদি ব্রাহ্মসমাজের নেতা; তাঁহার ভরসা ব্রাহ্মধর্মের উপর। তাঁহার মতে এই ব্রাহ্মধর্ম হইতেই স্থিতি ও গতির সামঞ্জস্য সাধিত হইতেছে ও হইবে। কটন সাহেবের ভরসা হিন্দুধর্মে। কিন্তু এই মতভেদটা আপাততঃ যতটা গুরুতর বোধ হয় বস্তুতঃ তত গুরুতর নহে। কেননা আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মমূলক। তাঁহারা হিন্দুসমাজ হইতে ব্রাহ্মসমাজের বিচ্ছেদ স্বীকার করেন না; অন্ততঃ Historical Continuity রক্ষা করা তাঁহার উদ্দেশ্য।

স্থিতি এবং গতি এই দুই ভিন্ন সমাজের মঙ্গল নাই। কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে পরস্পর বিরোধ ঘটিতে পারে। স্থিতি গতিরোধকারিণী হইতে পারে; গতি স্থিতি-ধ্বংসিনী হইতে পারে। যাহাতে তাহা না হইয়া পরস্পরের সামঞ্জস্য হয়, সমাজের নায়কগণের তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ চাই। উভয় লেখকের মতে আমাদের সমাজের স্থিতিবল প্রাচীন হিন্দুধর্মে, গতিবল আধুনিক ইংরেজি শিক্ষায়।

আমার বিবেচনায় বিশুদ্ধ যে ধর্ম তাহা সমাজের স্থিতি গতি উভয়ের মূল। এখনকার নবভারত-সমাজের গতি ইংরেজি শিক্ষার ফল, ইহা যথার্থ বটে। কিন্তু শিক্ষাও আমার বিবেচনায় ধর্মের অন্তর্গত।···যাহাকে আমরা ইংরেজি শিক্ষা বলি তাহা বস্তুতঃ জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলির পূর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অনুশীলন পদ্ধতি।'

এরপর আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন থাকে না।

১ 'প্রবন্ধমালা'র অন্তর্ভুক্ত

২ বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, ২য় ভাগ (বসুমতী)

বঙ্কিমচন্দ্র ও পাশ্চাত্য মনীষা

Today the ancient Greek is meeting the ancient Hindu on the soil of India.

—Swami Vivekananda

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রসঙ্গে অনেকেই বলেছেন যে তিনি য়ুরোপীয় দর্শন এবং চিন্তারীতি দ্বারা অতিরিক্ত প্রভাবিত ছিলেন। আবার এর বিপরীত মতটিও কিছু অসুলভ নয় : রক্ষণশীল ভারতীয় মনোভাব তাঁর চিন্তাকে যথেষ্ট প্রগতিশীল হতে দেয় নি। এই দুরকম মতের মূলে কিন্তু একই ত্রুটি আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মনীষাকে ভালো করে এখনও বিশ্লেষণ করে দেখা হয় নি। সেই বিচারে মৌলিক ভারতীয় এবং বিদেশী উপাদানকে পৃথক করে দেখা সম্ভব। কিন্তু ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্বের ফলে বঙ্কিম যেমন একদিকে যথেষ্ট ভারতীয় নন বলে সমালোচিত হয়েছেন, তেমনি যথেষ্ট সংস্কারমুক্ত নন বলেও বিদ্রূপভাজন হয়েছেন। কিন্তু তাঁর চিন্তার যথেষ্ট বিশ্লেষণ না হলে এ বিষয়ে কোনো ধ্রুব সিদ্ধান্তে আসা বোধ হয় ঠিক নয়।

আধুনিক শিল্প এবং বিদ্যা বাঙালীর চিন্তাজগতে আলোড়ন এনেছিল। এইজন্যই আধুনিক চিন্তার কোন্ দিকটি এ বিষয়ে সবচেয়ে প্রভাবশালী হয়েছিল তার অনুসন্ধানই সবার আগে দরকার। কিন্তু এই জ্ঞানের সাধনা বা জ্ঞানের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি আমরা নিজেরা করে তুলতে পারি নি। জ্ঞান বা চিন্তা আমাদের অনেকটাই আহৃত। য়ুরোপের স্ব-তন্ত্র স্বাধীন জাতীয় জীবনের ছায়ায় জ্ঞানান্বেষণের নতুন নতুন পথও মুক্ত হয়েছে। রেনেসাঁস রিফর্মেশন রাষ্ট্রবিপ্লব শিল্পবিপ্লব—এসব বহিরঙ্গ কারণ ছাড়াও জনশক্তির স্বাধীন চিত্তবিকাশও নতুন নতুন চিন্তা ও মতবাদের পথ প্রশস্ত করেছে। আধুনিক বাংলায় মনীষার বিভিন্নমুখী প্রকাশ হয়েছে সত্য কিন্তু য়ুরোপীয় মনন-প্রয়াসের সঙ্গে এর একটা মৌলিক প্রভেদ ছিল। আমাদের আধুনিক সাহিত্য-শিল্পই ছিল বিদেশী সংস্কৃতির নির্দেশে পরিকল্পিত। রাজনীতি বা অর্থনীতি-গত কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে আমাদের কোনো মৌলিক ভাবনার অবকাশ ছিল না। য়ুরোপের ইতিহাসে মনীষীদের চিন্তা কর্মে ও ভাবে সমানভাবেই প্রভাব বিস্তার করেছে। বিশুদ্ধ জ্ঞানের জগতেও মুক্তবুদ্ধির চর্চা অব্যাহত ছিল। খ্রীস্টান ধর্মের শাসন মুক্তবুদ্ধির প্রসারকে বাধা দিতে একবার চেষ্টা করেছিল বটে, কিন্তু অবিলম্বেই তাকে পথ ছেড়ে দিতে হল। শুধু তাই

নয়, ধর্মেরও যুগোপযোগী রূপান্তর ঘটল। চতুর্দশ শতাব্দী থেকে পোপের শাসন নতুন জীবনচেতনারকাছে ম্লান হয়ে এল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উত্থানপতনে এটাই যেন পরোক্ষে প্রমাণিত হল যে একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের মানবীয় প্রকৃতি এতদিনকার অধ্যাত্ম-মূল্যবোধকে আচ্ছন্ন ও দুর্বল করে ফেলেছে। ধর্মকে বেঁচে থাকতে হচ্ছে বিভিন্ন জাতি (National State) এবং যুগপ্রয়োজনের সঙ্গে সন্ধি করে। আধুনিকতার প্রধান লক্ষণ দুটি : চার্চের ক্ষয়িষ্ণু কর্তৃত্ব এবং বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান প্রভাব। বিজ্ঞানসাধনা তো মুক্তবুদ্ধিরই অনুশীলন। এই বুদ্ধির চর্চার লক্ষ্য হচ্ছে দেশ জাতি সমাজ ও ব্যক্তির স্বাচ্ছন্দ্য অথবা জড়জগতের নিয়মনীতির সন্ধান। দৃষ্টির কেন্দ্র পরিবর্তনের সঙ্গে জীবনের অভীষ্টের ধারণারও পরিবর্তন হয়েছে এবং প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব বিস্তারের নতুন নতুন পন্থার সঙ্গে নতুন মতবাদেরও প্রসার ঘটেছে।

আমাদের রেনেসাঁসে এ রকম হয় নি। ধর্মশাসনের কড়াকড়ি কমেছে বটে কিন্তু বুদ্ধির মৌলিক চর্চায় নতুনকে গড়ে তুলতে পারি নি। আমাদের কাছে যা নতুন, আসলে তা নতুন নয়। কালনিরপেক্ষ মানদণ্ড দিয়ে বিচার করলেই দেখা যাবে আমাদের মনীষীদের প্রয়াস মূলত সীমাবদ্ধ ছিল বিদেশ থেকে পাওয়া জ্ঞানবিজ্ঞানের তথ্যবিশ্লেষণে এবং গ্রহণে। ইংরেজ-পূর্ব যুগে আমাদের মনীষা বিশেষ একদিকে যথেষ্ট বিকাশ লাভ করলেও আধুনিক কালের মত বৈচিত্র্যধর্মী হয় নি। যতদূর মনে হয় পাশ্চাত্য মনীষা কোনো তত্ত্ব বা নীতির সূত্র মাত্র অবলম্বন করে অগ্রসর হয়ে আসে নি। একটা সাধারণ মনোভঙ্গি সর্বত্র অব্যাহত থাকলেও কোনো সনাতন তত্ত্বের শাসন তাঁদের চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে নি। ভারতবর্ষের মনন-প্রয়াস সর্বদাই কোনো সনাতন তত্ত্বের সূত্রকে আশ্রয় করে এসেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ গীতার উল্লেখই যথেষ্ট। গীতার মূল বক্তব্যকে মেনে নিয়ে কত ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা গড়ে উঠেছে। আধুনিক যুগ পর্যন্ত মনীষীরা গীতার অভিনব ব্যাখ্যা রচনা করেই এ যুগের নতুন বাণীকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। য়ুরোপে খ্রীস্টধর্মতত্ত্বের ভাষ্য অনুভাষ্য হয়েছে কিন্তু পাশ্চাত্য মনীষা আরও বহু বিচিত্র পথে চরিতার্থতা সন্ধান করেছে। ভারতবাসীর জীবনে একটা কোনো মূল বিশ্বাস ছিল অটল। নতুন করে তাকেই এক এক যুগে রূপ দেওয়া হয়েছে মাত্র।[১] আমাদের দেশের মননেরই এই বৈশিষ্ট্য। উনবিংশ শতাব্দীতে যখন সম্পূর্ণ নতুন ধরনের চিন্তাবস্তু এবং চিন্তাপ্রণালীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে, তখন আমাদের এতকালের অভ্যস্ত মনন-প্রণালীতেই যেন

১ এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য মোহিতলাল মজুমদার, বঙ্কিমবরণ, 'বঙ্কিমপ্রতিভার মহত্ত্ব বিচার—পূর্বমীমাংসা'।

আঘাত পড়ল। বঙ্কিমচন্দ্রের মত মনস্বীই এই অভিনবত্বকে সচেতনভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি বলেছেন[১]—

The very idea that external life is a worthy subject of the attention of a rational being, except in its connection with religion is amongst ourselves unmistakably of English origin.

চিন্তাপ্রণালীর পার্থক্য সম্বন্ধেও বঙ্কিমচন্দ্র সুস্পষ্টভাবে বলেছেন[২]—

'এখন গোলযোগের কথা এই যে এই শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রাচীন পণ্ডিতদিগের উক্তি সহজে বুঝিতে পারেন না। বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া দিলেও তাহা বুঝিতে পারেন না। যেমন টোলের পণ্ডিতেরা পাশ্চাত্যদিগের উক্তির অনুবাদ দেখিয়াও বুঝিতে পারেন না, যাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত উহারা প্রাচীন প্রাচ্য পণ্ডিতদিগের বাক্য কেবল অনুবাদ করিয়া দিলে সহজে বুঝিতে পারেন না। ইহা তাঁহাদিগের দোষ নহে, তাঁহাদিগের শিক্ষার নৈসর্গিক ফল। পাশ্চাত্য চিন্তাপ্রণালী প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের চিন্তাপ্রণালী হইতে এত বিভিন্ন যে ভাষার অনুবাদ হইলেই ভাবের অনুবাদ হৃদয়ঙ্গম হয় না।...পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে যে সংশয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা পূর্বপণ্ডিতদিগের কৃত ভাষ্যাদিতে তাঁহার মীমাংসা নাই।...যাঁহারা বিবেচনা করেন, এ দেশীয় পূর্ব পণ্ডিতেরা যাহা বলিয়াছেন তাহা সকলই ঠিক এবং পাশ্চাত্যগণ জাগতিক তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলেন তাহা সকলই ভুল উহাদিগের সঙ্গে আমার কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই।'

আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে বাঙালী সমাজের মধ্যে বিচ্ছেদ এসেছে বলে অনেকেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। লোকজীবন এবং নাগরিক জীবনের মধ্যে বিচ্ছেদের রেখা আজ খুবই স্পষ্ট সন্দেহ নেই কিন্তু গত শতাব্দীতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই যে দুটি দলের সৃষ্টি হয়েছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের চোখেই তার স্বরূপ ধরা পড়েছিল। যাঁরা চিন্তাশীল তাঁরাও দ্বিধাবিভক্ত। ভারতীয় মনীষা এবং পাশ্চাত্য মনীষার মধ্যে ব্যবধান যে কত দুস্তর বঙ্কিমের উক্তিতেই তা প্রকাশ পেয়েছে।

এই প্রসঙ্গে ইতিহাসের একটু আলোচনা নেহাৎ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতির প্রচলন নিয়ে অনেকদিন ধরেই আন্দোলন চলে। এই বিতর্কে প্রসঙ্গত চিন্তাপ্রণালীর পার্থক্য সম্বন্ধেও আলোচনা

১ Bankim Chandra Chatterjee, *English Writings* (Bangiya Sahitya Parisad). The Confession of a Young Bengal.

২ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভূমিকা

হয়েছিল। র‍্যাশনালিজম্, এমপিরিসিজম বা বেকন-প্রবর্তিত আরোহরীতি—বিষয় পর্যালোচনার বিভিন্ন রীতি রেনেসাঁসের পরে য়ুরোপীয় মননসাধনার বৈশিষ্ট্য। নতুন যুগের চিন্তাপদ্ধতি কি হবে—এই নিয়ে বাদবিতর্কে এসব কথা স্বভাবতই এসে গিয়েছিল। রামমোহন লর্ড আমহার্স্টকে লেখা বিখ্যাত শিক্ষাবিষয়ক পত্রে বেকনের পদ্ধতির প্রসারে সাহায্য করতে অনুরোধ করেছিলেন। রামমোহন রায়ের ইচ্ছা অপূর্ণ থাকে নি। হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের যে পদ্ধতি শিক্ষা দিতেন দর্শনের ইতিহাসে তা 'কমনসেন্স স্কুল' নামে পরিচিত। এর প্রবক্তারা ছিলেন 'স্কটিশ স্কুল অব ফিলজফার্স'। এই দর্শনের বৈশিষ্ট্য ছিল অভিজ্ঞতাবাদী 'এমপিরিসিস্ট' এবং মননবাদী 'র‍্যাশনালিস্টদের' মধ্যে মিলন ঘটানো। এই দর্শনের তিনটি বিশেষত্ব হচ্ছে[১]—

To the Scottish School belongs the merit of being the first avowedly or knowingly to follow the inductive method and to employ it systematically to psychological investigation.

It employs the self-consciousness as the instrument of observation.

By the observation of consciousness principles are reached which are prior to and independent of experience.

আত্মসচেতন পর্যবেক্ষণ এবং আরোহরীতি—এই দুটিই পাশ্চাত্য বিচারপ্রণালীর বৈশিষ্ট্য। এই দুটিতেই ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের দীক্ষিত করলেন। এই শিক্ষা কিভাবে তিনি ছাত্রদের মধ্যে দৃঢ়মূল করলেন সে আলোচনা আপাতত অবান্তর। তবে এটুকু অবশ্যই বলতে হবে এই নব শিক্ষিতেরা সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে স্থান গ্রহণ করে এই বিচাররীতির প্রসারে সাহায্য করেছিলেন। ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের শিক্ষাবিধিও তাতে সাহায্য করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি পরবর্তী যুগের মনীষীরা এই পরিবেশেই লালিত হয়েছিলেন। সংস্কৃত কলেজ ছাড়া সংস্কৃত পড়ার ব্যবস্থা অন্য কোনো কলেজে ছিল না। ফলে বঙ্কিমচন্দ্রও ইংরেজি শিক্ষারীতিতে আকণ্ঠ অবগাহন করে প্রথম থেকেই নতুন শিক্ষা এবং মননরীতিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন।

বঙ্গদর্শনে উপন্যাস প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধরচনায় মন দিলেন। এ

১ James-McCosh, *The Scottish Philosophy*, 1875,pp. 2-6

সময়ের প্রবন্ধগুলি বিচ্ছিন্ন বিষয় নিয়ে রচিত। এই রচনাগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষভাবে ইতিহাসের শরণ নিয়েছেন। ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে বিষয় পর্যালোচনার রীতি আমাদের দেশে নতুন। এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত হওয়ার পর প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে ও গবেষণায় বাঙালী চিত্ত উৎসাহিত হয়ে ওঠে। নব্যবঙ্গের স্থাপিত 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'য় যে আলোচনা হত সে এই পদ্ধতিতেই। এই আলোচনা-রীতিকে বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত করেন বিশেষ করে দুজন, অক্ষয়কুমার দত্ত এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র। বঙ্গদর্শনের আগে বিবিধার্থসংগ্রহ এবং রহস্যসন্দর্ভ বিশেষ উল্লেখযোগ্য পত্রিকা যারা পাশ্চাত্যে বহুপ্রচলিত ঐতিহাসিক রীতি বাংলা প্রবন্ধরচনার ক্ষেত্রে প্রবর্তিত করেছে। রাজেন্দ্রলালের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রদ্ধাও ছিল অপরিসীম।

বঙ্গদর্শন-সম্পাদনকালে বঙ্কিমচন্দ্র যে-সব প্রবন্ধ লেখেন তাতে এদেশের শাস্ত্র ও গ্রন্থের প্রমাণ উদ্ধার সামান্যই ছিল। তিনি এ সময় দুটি নতুন শাস্ত্রের পূর্ণ ব্যবহার করছিলেন। দুটি শাস্ত্রই মূলত য়ুরোপে উদ্ভূত এবং পরিণত। একটি অর্থনীতি আর একটি রাজনীতি। ইতিহাসের কথা বলাই বাহুল্য। বঙ্কিম-মনীষার প্রথম যুগে এই তিনটিই একাধিপত্য করেছে বলা যায়। সাহিত্য-বিচারের পদ্ধতিও ছিল আমাদের দেশে নতুন। ইংরেজি শিক্ষার ফলে তিনি যেন নতুন অস্ত্র খুঁজে পেলেন। তারই দ্বারা তিনি বিষয়কে বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের সঙ্গে ব্যবচ্ছেদ করে নবজাগরণের একটা দিককে আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করলেন। নিছক ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে লেখা প্রবন্ধগুলির উল্লেখ বাহুল্য মাত্র। অন্যান্য প্রবন্ধেও তাঁর ইতিহাস-চিন্তা কত প্রখর, তার প্রমাণস্বরূপ তিনটি প্রবন্ধের উল্লেখ করা যায়, 'বঙ্গদেশের কৃষক' 'সাম্য' এবং 'ভারতকলঙ্ক'। ইতিহাস অর্থনীতি এবং রাজনীতির আলোচনায় প্রবন্ধ তিনটি পূর্ণ। ইতিপূর্বে বঙ্গদেশের কৃষক নিয়ে আলোচনা আরও কয়েকজন করেছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্রের ***The Zemindar and the Ryot*** বেরিয়েছিল ক্যালকাটা রিভিউতে (১৮৪৬), কিশোরীচাঁদ মিত্রের *The Ryot and the Zemindar* বেরিয়েছিল ইণ্ডিয়ান ফিল্ডে (১৬ই জুন ১৮৫৯), সঞ্জীবচন্দ্রের বই ***Bengal Ryots*** বেরিয়েছিল ১৮৬৪তে এবং রমেশচন্দ্র দত্তের ***The Peasantry of Bengal*** প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৪-এ। দেশের প্রজাদের আলোচনার সূত্রপাত হয় নব্যবঙ্গদের থেকেই। বিচার-প্রণালী এবং বিচারবস্তু—দুদিক থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র নব্যবঙ্গের উত্তরাধিকার বহন করেছিলেন। তিনি আলোচনা করলেন বাংলায়। পূর্ববর্তীদের আলোচনায় তিনি লাভবান হয়েছিলেন সত্য, কিন্তু একটা নতুন মতবাদ এই প্রসঙ্গে তিনি প্রবর্তন করলেন। বাকৃল তাঁর ***History of Civilization in England*** গ্রন্থের প্রথম

খণ্ডের প্রথম অধ্যায়েই জাতীয় চরিত্রগঠনে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবের কতক-গুলি সূত্র নির্দেশ করেছিলেন। দ্বিতীয় অধ্যায়েই ভারতবর্ষের জাতীয় প্রকৃতি সংক্ষেপে বর্ণনা করে তিনি তাঁর পরিকল্পিত সূত্রের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বাক্‌ল-এর ঐতিহাসিক প্রণালীকে স্বীকার করে 'বঙ্গদেশের কৃষক'-এর কোনো কোনো জায়গায় প্রায় অনুবাদই করে দিয়েছিলেন।[১] এই প্রবন্ধটি লেখার সময় আর একটি বইয়ের দ্বারাও তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন, লেকির *History of Rationalism in Europe*. 'বঙ্গদেশের কৃষক' রচনার পর তিনি বঙ্গদর্শনে সাম্যের প্রবন্ধগুলি ধারা-বাহিকভাবে প্রকাশ করতে থাকেন। সাম্যের মূল তত্ত্বটি য়ুরোপ থেকে পাওয়া। সেই হিসাবে মার্ক্স-এর পূর্ব পর্যন্ত সাম্যতত্ত্বের নানা ইতিহাস এবং ব্যাখ্যা বঙ্কিমচন্দ্র ধারাবাহিক ভাবেই দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত জন্ স্টুয়ার্ট মিলের মতটাই তাঁর কাছে গ্রহণীয় হয়েছে বলে মনে হয়। ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে বুদ্ধের নাম করেছেন; কিন্তু তিনি তখন যে সাম্যবাদের পক্ষপাতী সেটা ঠিক বুদ্ধের সাম্যবাদ নয়। অর্থনীতি রাজনীতি এবং সমাজনীতির ক্ষেত্রে যে সাম্যবাদ য়ুরোপে আবিষ্কৃত হয়েছে, বঙ্কিম তারই পক্ষপাতী। আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে মানুষের সমতার প্রশ্নে তিনি যান নি। পাশ্চাত্যে উদ্‌ভাবিত সাম্যবাদের সূত্রগুলি ভারতীয় সমাজে প্রয়োগ করবার জন্যই এদেশের অবস্থার নানা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করেছেন।

বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর চিন্তা-জীবনের প্রথম দিকে যে দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলেছিলেন তাতে প্রখর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের লক্ষণ আছে। নব্যবঙ্গের অনুবৃত্তিই তাঁর চিন্তায় দেখা গিয়েছে। কিন্তু একে মনীষা না বলে মনস্বিতা বলাই সংগত। কেবল বিচার এবং বিশ্লেষণের কৃতিত্ব নয়, তার থেকে সুস্পষ্ট জীবনদর্শন গড়ে তোলাতেই মনীষার পূর্ণ গৌরব। আমাদের নতুন শিক্ষিতের দল পাশ্চাত্য মনীষার দ্বারা যত প্রভাবিত হয়েছে নিজেরা ততখানি নতুন তত্ত্ব চিন্তা বা দর্শন গড়ে তুলতে পারে নি। হয়তো প্রথম যুগে এমনি বিচ্ছিন্ন ভাবেই ভাবনা দেখা দেয়—এদের সংহত হয়ে উঠে একটি সূত্রে ধরা দেওয়া পরের যুগেই ঘটে থাকে। য়ুরোপের রেনেসাঁসেও বিচ্ছিন্ন ভাবেই নানা দিক দিয়েই জাগরণের লক্ষণ দেখা দিয়েছে—ধর্মচিন্তায়, জাতীয়তাবোধে, বৈজ্ঞানিক দুঃসাহসিকতায়, শিল্পকলায়। আমাদের নবজাগরণের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ সেকথা আগেই বলেছি। সমাজসংস্কারে, সাহিত্যিক কল্পনাভঙ্গিতে, বিতর্ক-সভায়, আলাপে-আলোচনায় এর ইঙ্গিত দেখা দিচ্ছিল কিন্তু ঠিক সেই যুগেই কোনো একজনের মনে জীবনের

১ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত বঙ্গদেশের কৃষক, ২য় পরিচ্ছেদ এবং বাক্‌ল্‌এর পূর্বোক্ত গ্রন্থের (২য় সং) দ্বিতীয় অধ্যায় পৃ ৬৩-৭৪। এই পরিচ্ছেদটি লুপ্ত 'সাম্য' গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদরূপে লিখিত হয়েছিল।

সমগ্র অর্থটি ফুটে ওঠে নি। রেনাসাঁসের প্রথম উন্মাদনা কেটে গেলে য়ুরোপে বিভিন্ন মনীষী নবজাগরণের আলোর স্পর্শে নতুন করে জীবনের দিকে তাকালেন — জীবনের নানা অর্থ তাঁদের চেতনায় ধরা দিল। বিভিন্ন দর্শন, বিভিন্ন বিজ্ঞান, বিভিন্ন সাহিত্যিক কল্পনারীতির ভিতর দিয়ে মনস্বিতা মনীষায় রূপান্তরিত হল। প্রবন্ধ-রচনার প্রথম যুগে বঙ্কিম জীবনের খণ্ডিত দিক্‌গুলিরই ভাষ্য রচনা করেছেন। বঙ্গদর্শন-সম্পাদনায় অগ্রসর হলে তাঁর প্রথম কাজই হয়েছিল প্রচলিত বিভিন্নমুখী চিন্তাকে একটি কেন্দ্রে আকৃষ্ট করে নিয়ে আসা। বঙ্কিমের নিজের প্রবন্ধগুলির ভিতরেও কোনো একটি সমগ্র দর্শন দেখা যায় নি। এই অর্থেই বঙ্কিমের প্রবন্ধগুলি নব্যবঙ্গদের মতোই খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন, কোনো পূর্ণ জীবনদর্শন থেকে উদ্‌ভূত নয় যদিও অনেক নতুন আইডিয়া তিনি পেয়েছেন, বিষয়বিচারের অনেক পদ্ধতি তিনি আয়ত্ত করেছেন। এই সময় তিনি অভিজ্ঞতাবাদী এমপিরিসিস্ট। পারিপার্শ্বিক সমাজে, ইতিহাসে যে তথ্য সঞ্চিত হয়েছে, তারই সাক্ষ্য নিয়ে কতকগুলি চিন্তাকে তিনি গড়ে তুলেছেন। এই চিন্তাগুলি পরে একটা বৃহত্তর জীবনদর্শনের অঙ্গীভূত হয়ে উঠবে। এদের মধ্যে জাতীয়তা-বোধ একটা বড় ভাবগ্রন্থি। 'ভারতকলঙ্ক' প্রবন্ধটি এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিম বলেছেন 'যে সকল অমূল্য রত্ন আমরা ইংরেজির চিত্তভাণ্ডার হইতে লাভ করিতেছি তাহার মধ্যে দুইটির আমরা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম—স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং জাতি-প্রতিষ্ঠা। ইহা কাহাকে বলে তাহা হিন্দু জানিত না।' বঙ্কিমচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর চিন্তাশীলদের রচনা থেকেই মূলত প্রেরণা পেয়েছিলেন। জাতীয়তার লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্যও তিনি তাঁদের থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন। বাক্‌ল্-এর গ্রন্থ থেকে এই ইঙ্গিত পেয়ে থাকবেন। জাতীয়তাবাদের ভৌগোলিক কারণগুলি সম্পর্কে আলোচনা আধুনিক কালে ফরাসী লেখকরাই প্রথম আরম্ভ করেন।[১] ষোড়শ শতাব্দীতে Bodin বলেছিলেন শাসনতন্ত্র জাতিপ্রকৃতি অনুযায়ী রচিত হওয়া উচিত। জাতিপ্রকৃতিও আবার ভৌগোলিক কারণে তৈরি হয়ে ওঠে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মণ্টেস্কু এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেন। টেনের ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস এই সূত্র অবলম্বনেই রচিত। বাক্‌ল্-এর গ্রন্থ এই চিন্তারীতিরই ফল। এখানে উল্লেখযোগ্য, বঙ্কিমচন্দ্র এই চিন্তা দ্বারা এত বেশি প্রভাবিত ছিলেন যে সাহিত্য-সমালোচনাতেও তিনি এই নীতিকে পুরোপুরি স্বীকার করেছিলেন। 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধটি তার দৃষ্টান্ত।

১ আধুনিকতর ঐতিহাসিকদের মতে ভৌগোলিক প্রভাব জাতীয়তাবোধের একমাত্র নয়, অন্যতম কারণ মাত্র। দ্রষ্টব্য Sir Ernest Barker, *Nationalism*.

এগুলি আসলে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন রচনার প্রস্তুতি। পরবর্তী যুগে বঙ্কিমচন্দ্র র‍্যাশনালিজ্‌মের দিকে ঝুঁকেছিলেন। কিন্তু এ যুগের চিন্তার বীজগুলি কোনোটাই হারায় নি। হারবার্ট স্পেন্সারের সিন্থেটিক ফিলজফির মত তিনি এক সংগতিপ্রাপ্ত দর্শন তৈরি করতে অনুপ্রাণিত হলেন, তাতে তাঁর এতদিনকার বিচ্ছিন্ন তত্ত্বসন্ধান যোগযুক্ত হয়ে পূর্ণায়ত হয়ে দাঁড়াল। বঙ্কিমের মনস্বিতা এবার এক অভিনব মনীষায় পরিণত হল। বঙ্কিমচন্দ্রের সেই দর্শনের নাম ধর্মতত্ত্ব। ধর্মতত্ত্বকে বোঝাবার জন্য 'কৃষ্ণচরিত্র' বইয়ের অবতারণা এবং গীতার ব্যাখ্যা।

ইংলণ্ডে ধর্মকে পোপের শাসন থেকে মুক্ত করে যখন জাতীয়তার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা হল, তখন রাজাই হলেন সেদেশের সমাজপতি। এই অবস্থার সঙ্গে আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষের একটা স্থূল সাদৃশ্য আছে। রাজাই সেকালে ছিলেন সমাজনেতা। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত নদীয়ারাজ ধর্মরক্ষক সমাজনেতার ভূমিকায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে রাজা রাধাকান্ত দেব খানিকটা যেন এই দায়িত্বই পালন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণের যে প্রভুত্ব ছিল, ইংরেজ আমলের ব্রাহ্মণের সেই প্রভুত্ব নেই। ব্রাহ্মণ-শূদ্রের অধিকার-ভেদ ক্রমেই লোপ পেয়ে যাচ্ছে অন্তত রাজকীয় আইনের দৃষ্টিতে—একথা বঙ্কিমচন্দ্রই ইতিহাসের গতিপ্রকৃতির ব্যাখ্যায় বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছেন।[১] ইংলণ্ডে রাজা ধর্মনেতা হলেও ধর্মের স্বার্থ সেখানে গৌণ। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক আমাদের রাষ্ট্র এবং সমাজ আলাদা হয়ে গিয়েছে। ধর্ম এখন সমাজেরই প্রতিপাল্য, রাজার নয়। এদিকে নতুন একটি মূল্যবোধ রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে ভারতীয় চিত্তকে আচ্ছন্ন করছে। দৈবক্রমে রাজাই এই মূল্যবোধের সংবাদ বহন করে এনেছিল। তাই রাজার বিরুদ্ধাচারণ করা যেন সেকালের বিবেকে বাধছে। নতুন পাওয়া মূল্যবোধকে আমাদের সমাজে গ্রাহ্য করানোর জন্য সমাজের ধর্মকেও নতুন হয়ে উঠতে হবে। সমাজের দায়িত্ব এখন অনেকটাই বেড়ে গেল। আগে সমাজের হাতে যে শাসন ও শক্তি ছিল, এখন সমাজ ও রাষ্ট্র ভিন্ন হয়ে যাওয়াতে সমাজের আর সে শক্তি নেই। সুতরাং শক্তিকে বাহুবলে নয়, আপন অন্তর্নিহিত স্বভাবধর্মে আয়ত্ত করতে হবে। সমস্যাটা হল অভিনব। রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রাপ্ত নতুন প্রাণের আদর্শকে অধিকার করা দরকার অথচ রাষ্ট্র এবং সমাজ আলাদা—রাষ্ট্রের শাসন সমাজের উপর নেই। রাষ্ট্র আলাদা হলেও ক্ষমতাহীন সমাজকে আবার কি করে শক্তিশালী করে তোলা যায়, সমস্যাটা কেন্দ্রীভূত

১ ভারতকলঙ্ক

হল সেখানেই। আমরা একালে প্রশ্ন করেছি, সমাজকে যে মানতেই হবে[১] ব্যক্তিকে নিরুদ্ধ করেও, এ কথাই বা নির্বিচারে মেনে নেব কেন?

আমাদের দেশে যোগাযোগ ভিন্ন হলেও খানিকটা এ ধরনের সমস্যা য়ুরোপে কয়েক শতাব্দী ধরে চলে এসেছে। চার্চের শাসন থেকে মুক্তি পাওয়ায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উদ্ভব হল। সেকালের ধর্মীয় শাসনব্যবস্থার সঙ্গে রাজনৈতিক, নৈতিক এবং বুদ্ধিগত সংযম ছিল যুক্ত। পঞ্চদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক এবং নৈতিক বিশৃঙ্খলা অবশেষে ইতালীতে মেকিয়াভেলীর মতবাদকে সম্ভব করে তুলল। আবার সেই সঙ্গে মনের জড়তা কেটে গেলে নানাদিকে প্রতিভার আশ্চর্য অভ্যুদয় ঘটল। বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেছেন[২] —

But such a society is unstable. The Reformation and the Counter Reformation combined with the subjection of Italy to Spain put an end to both the good and the bad of the Italian Renaissance. When the movement spread north of the Alps, it had not the same anarchic character.

রাসেল এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রয়োজনীয় কথা বলেছেন। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন সমাজবন্ধনের লক্ষণ দেখা দিল। প্রকৃতির বশ্যতামুক্ত মানুষ শ্রমশিল্পের প্রসারের সঙ্গে অনেক বেশি ক্ষমতা করায়ত্ত করেছে। এই ক্ষমতা ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়, সমাজকেন্দ্রিক। বিজ্ঞান-সাধনায় বহু ব্যক্তির সম্মিলিত সহযোগিতার দরকার। —

Its tendency therefore is against anarchism and even individualism since it demands a wellknit social structure. Unlike religion it is ethically neutral.[৩]

এই নতুন সমাজসৃষ্টি য়ুরোপের মুক্তবুদ্ধি অনন্যতন্ত্র জাতির মধ্যে যে রূপ নিয়েছে আমাদের দেশে তা হয় নি। কিন্তু এটাও সত্য যে আমাদের আধুনিক সমাজ প্রাচীন

১ ধর্মতত্ত্ব, দশম অধ্যায়। 'সমাজকে ভক্তি করিবে। ইহা স্মরণ রাখিবে যে মনুষ্যের যত গুণ আছে সবই সমাজে আছে। সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা, দণ্ডপ্রণেতা, ভরণপোষণ এবং রক্ষা -কর্তা। সমাজই রাজা, সমাজই শিক্ষক। ভক্তিভাবে সমাজের উপকারে যত্নবান হইবে। এই তত্ত্বের সম্প্রসারণ করিয়া ওগুস্ত কোমৎ "মানবদেবীর" পূজার বিধান করিয়াছেন।'

২ Bertrand Russell, ***History of Western Philosophy***, 1946. p 513.

৩ ঐ, p 514.

সমাজ থেকে অনেকটাই আলাদা হয়ে যাচ্ছে। বঙ্কিমচন্দ্র এটা স্পষ্টই উপলব্ধি করেছিলেন। দেবভীতিগ্রস্ত নির্বিচার-বিশ্বাসচালিত গোষ্ঠীবদ্ধ আচারপরায়ণ সমাজের চেহারা যে পরিবর্তিত হচ্ছে, সে সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোযোগ রাজনৈতিক সামাজিক প্রবন্ধে বিশেষ করে ধর্মতত্ত্বে প্রকাশিত। য়ুরোপের মত বৈজ্ঞানিক উদ্যমই হয়তো এর কারণ নয়। তবে মার্জিত শিক্ষিত বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শাসনতন্ত্রের আরোপিত জীবনযাত্রার নির্দেশ এবং জীবিকা-সংস্থানের নতুনতর পদ্ধতির ফলে স্বভাবতই এক নতুন সমাজের বিকাশ ঘটল। এই সমাজ যে অনেক নতুন বৈশিষ্ট্য এবং লক্ষণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে বঙ্কিম সেই দিকে নিবদ্ধলক্ষ্য থেকেই ধর্মতত্ত্বে সমাজকে ভক্তি করতে বলেছেন। সহজ করে বলতে গেলে রঘুনন্দন সমাজ বলতে যা বুঝতেন বঙ্কিম তা বোঝেন না। এখনকার সংস্কৃতিসম্পন্ন শিক্ষিত মানুষ বিশ্বের ভূমিকায় যে সমাজকে বুঝে থাকেন, এ যুগে বঙ্কিমচন্দ্রই সেই অর্থে 'সমাজ' কথাটির প্রথম প্রয়োগ করেন।

ইংলণ্ডেও নতুন সমাজের প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে নতুন সমস্যার সৃষ্টি হল। অষ্টাদশ শতাব্দীর র‍্যাশনালিজ্‌ম এমন একটা চরম আকার ধারণ করেছিল যে ঐতিহাসিক বলেছেন[১] —

Christianity was held to exist not to be lived but like a proposition in Euclid only to be proved.

সাহিত্যে ভাবের অগভীরতাকে প্রকাশের ঋজুতা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হল। বিশ্বের যান্ত্রিক নিয়মে এল একটা সাধারণ বিশ্বাস। ধর্ম এবং দর্শনের মূল্যমান নির্ধারিত হল নিছক যুক্তিতে। কোনো যুগেই নাকি ধর্ম নিয়ে এত লেখা হয় নি, যদিও ধর্মপালনে এত উদাসীনতাও কোনো যুগে দেখা যায় নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর এই র‍্যাশনালিজ্‌ম্ রেনেসাঁসের increasing authority of science-এরই ফল। ব্যক্তির ক্রমবন্ধনমোচনের ফলে হব্‌স্‌-এর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং গাণিতিক যুক্তিপ্রবণতার উদ্ভব হয়েছিল। এই যুক্তিপ্রবণতার ফলে জীবন থেকে অলৌকিক এবং অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে বিশ্বাস অন্তর্হিত হবার উপক্রম হল। ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তার নানা মত ও বিশ্বাসের সঙ্গে সুশৃঙ্খল সমাজের সংগতি ঘটানো প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়াল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এইটেই ছিল প্রধান সমস্যাগুলির অন্যতম। তারই সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত 'ন্যাচারাল রিলিজিয়ন'[২] এবং 'রিভিল্‌ড রিলিজিয়ন' নিয়ে বিবাদ। অষ্টাদশ শতাব্দীর

১ Caroline Spurgeon, *Cambridge History of English Literature*, Vol. 9. Ch. XII.

২ 'The philosophy of natural law, of natural religion, of natural

যুক্তিবাদিতায় ইউটিলিটারিয়ান মতবাদের উদ্ভব। এই মতবাদের লক্ষ্য ছিল সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে একটা সামঞ্জস্যস্থাপন। আপাতদৃষ্টিতে খ্রীস্টধর্মের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এই মতের প্রবক্তা বেন্থাম ধর্মকে সমালোচনা করে পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন।[১] কিন্তু আসলে খ্রীস্টীয় করুণাবৃত্তিরই একটা বৈজ্ঞানিক যুক্তিসংগত প্রয়োগই ছিল ইউটিলিটারিয়ানদের উদ্দেশ্য। এর কিছুদিনের মধ্যেই ফ্রান্সে আগস্ট কোমতের আবির্ভাব। কোমতীয় দর্শনে ঐতিহাসিক ধারা নির্দেশের দ্বারা ভগ্নোন্মুখ সমাজকে রক্ষা করে দৈবাদিষ্ট খ্রীস্টধর্মের মানবিক দিক্‌টিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা হয়েছে। এই তিনটি প্রচেষ্টাই ভিক্টোরিয় যুগে উনবিংশ শতাব্দীতে ধর্মকে স্থানচ্যুত করবার চেষ্টা করেছে। সেই সময় রূঢ়তম আঘাত দিল ডারুয়িনের মতবাদ। তার ফলে ম্যাথু আর্নলড্ বলতে বাধ্য হলেন, 'ধর্ম আর আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে পারছে না'। অষ্টাদশ শতাব্দীর যে যুক্তিবাদ আধুনিক চিত্তকে অধিকার করেছে তাকে অস্বীকার করা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। ইংলণ্ডের ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা বুঝলেন ধর্মকেও র‍্যাশনালাইজ্ করার দরকার হয়ে পড়েছে। ধর্মের মূল মহিমা সম্বন্ধে তাঁদের সংশয় ছিল না, শুধু তাকে আধুনিক যুক্তির কষ্টিপাথরে উজ্জ্বল করে তোলা দরকার।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই ধর্মকে গড়বার চেষ্টা হয়েছে। কোলরিজ, টমাস আর্নলড্, কার্ডিনাল নিউম্যান এ বিষয়ে উদ্যোগী হলেন। এঁদের মধ্যে টমাস আর্নলড্ই বোধহয় সবচেয়ে উদারপন্থী ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর দার্শনিকেরা ভেবেছিলেন অতীতের উত্তরাধিকারকে অস্বীকার করেই পূর্ণতা লভ্য। জীবন (Nature) এবং যুক্তিকে (Reason) অনুসরণ করাই মানুষের কর্তব্য। মানুষের জীবনের জটিলতা কোলরিজ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করেছেন আত্মিক শক্তি দ্বারাই জাতি মুক্তি পেতে পারে। কার্ডিনাল নিউম্যানও আধ্যাত্মিক শক্তিতে বিশ্বাস অবিচল রেখেছিলেন। খ্রীস্টীয় ধর্মের পূর্ব গৌরবকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টাতেই তাঁর নেতৃত্বে Oxford Movement আরম্ভ হয়েছিল। 'ন্যাচারাল রিলিজিয়নে'র মতবাদের যুগে নিউম্যানই আগের 'রিভিল্ড রিলিজিয়নে' বিশ্বাস ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নিউম্যান ব্যক্তিগতভাবে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারলেও তাঁর ধর্মান্দোলন ঠিক বল সঞ্চয় করতে পারল না। রাগ্‌বীর হেডমাস্টার টমাস আর্নলড্ যুগপ্রবণতাকে ঠিকই বুঝেছিলেন। তিনি কল্পনা করেছিলেন জাতির

economy was rooted in both the intellectual and the social presumptions of the Seventeenth Century.'—Sabine. *A History of Political Theory*, 1956 p. 368.

১ ***Church of England Catechism Explained.***

স্বার্থ ও ধর্মের শক্তি পরস্পরকে প্রভাবিত করে নতুন যুগের সূচনা করবে। তাঁর মতে সত্যের সন্ধানে যুগকে ধর্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ করা যায়। শাস্ত্রের গোঁড়ামি তিনি বর্জন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু নিউম্যানের কাছে এগুলিও অপরিত্যাজ্য। জাতি-চেতনার এবং ধর্মচেতনার সমন্বয়ের যে কল্পনা আর্নলড্ করেছিলেন, তার দ্বারা ধর্মের একটা নতুন আদর্শ তিনি সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। —

Arnold and Newman, indeed, may be taken to symbolize the two conflicting trends in the nineteenth century religious thought : Arnold, ethical and liberal, aiming at the promotion of goodness by Christian gentleman ; Newnan mystical and dogmatic aiming at the production of saints by an infallible church.[১]

কার্ডিনাল নিউম্যানের চেষ্টা ব্যর্থ হল। ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে ডারুয়িনের *Origin of Species* প্রকাশিত হল। পর বৎসরই বেরোল *Essays and Reviews.* বইটি ছোট কিন্তু সেকালের চিন্তাজগতে আলোড়ন নিয়ে এল। বইয়ের লেখক ছিলেন সাতজন পাদ্রী। কিন্তু তাঁরা ধিক্কৃত হলেন 'Septem Contra Christum—the Seven Champions not of Christiandom' বলে। এই ছোট বইটির উদ্দেশ্য ছিল খ্রীস্টধর্ম ও নতুন জিজ্ঞাসার মধ্যে সংগতি আনা, যুগের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির সঙ্গে ধর্মের সমন্বয় করা। লেকি ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের ইংলণ্ডের সমাজের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন[২]—

No change in English life during the latter half of the nineteenth century is more conspicuous than the great enlargement of the range of permissible opinions on religious subjects. Opinions and arguments which not many years ago were confined to small circles and would have drawn down grave social penalties, have become the commonplaces of the drawing-room and of the boudior. The first very marked change in this respect followed, I think, the publication in 1860 of the 'Essays and Reviews', and the effect of this book in making the

১ Basil Willey, *Nineteenth Century Studies*, 1949, pp. 84-85.

২ Lecky, *Democracy and Liberty*, Vol. I, 1908, pp. 510-511.

religious questions which it discussed familiar to the great body of educated men was probably by far the most important of its consequences.

এই বইটির সঙ্গে লেকি, রেনান বাক্‌ল কলেনসো এবং ডারউইনের প্রভাবের কথাও উল্লেখ করেছিলেন। এর সঙ্গে ছিল জার্মান এবং ডাচ ভাষায় বাইবেলের আলোচনার প্রভাব।

বাংলাদেশের পরিবর্তমান যুগে সমাজের পুনর্গঠনের কথা চিন্তা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ইংলণ্ডের এই আধ্যাত্মিক সংকটের ইতিহাস থেকে অনেকখানি ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। তবে প্রথমেই এই কথাটা বলে দেওয়া ভালো যে বঙ্গদর্শন সম্পাদনার প্রথম যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে ঠিক এই ধরনের ভাবনাটা আসে নি। ইতিপূর্বেই আমরা দেখেছি অষ্টাদশ শতাব্দীর মননপ্রণালীর সূত্রগুলি তিনি আয়ত্ত করেছেন। এই প্রণালী শেষ পর্যন্ত কখনোই তিনি ত্যাগ করেন নি সত্য, কিন্তু প্রথম যুগে মানব-অস্তিত্বের সমগ্র অর্থ সন্ধান করবার কথা তাঁর মনে হয় নি। নতুন যুগে পাওয়া কতকগুলি আইডিয়া পাশ্চাত্য মননসূত্রে বিচার করে আমাদের দেশে তাদের প্রয়োগের উপযুক্ততার কথাই তিনি ভেবেছিলেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে চিন্তার গভীরতা এবং নিবিড়তা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আইডিয়াগুলি মানবজীবনের সমগ্র অর্থে অর্থান্বিত হয়ে উঠল।

এ বিষয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রকাশিত দুটি বই তাঁকে বিশেষ সাহায্য করেছিল বলে মনে হয়। দুটিরই গ্রন্থকার ছিলেন সার জন রবার্ট সীলি। (১৮৩৪-১৮৯৫)। সীলির প্রথম বই *Ecce Homo* বেনামীতে বেরিয়েছিল ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে এবং দ্বিতীয় বই *Natural Religion* বেরিয়েছিল ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে। ইংলণ্ডের ভাবুক সমাজে যে সংশয় দেখা দিয়েছিল সীলি তাঁর বইতে তার একটা মীমাংসা করতে চাইলেন। সীলি যে ভাবে সমাধান চেয়েছিলেন সেটা সে যুগের সংস্কৃতি-ভাবনা থেকে এসেছিল। এই সময় ম্যাথু আর্নলড্ অন্য আশ্রয়কে যথোপযুক্ত নয় ভেবে সংস্কৃতির মার্জিত ভিত্তির উপর দাঁড়াতে গিয়েছিলেন। সীলি বলছেন[১]—

The age calls not merely for a revival of the essential spirit of Christianity, though this too is needed but for new elements

১ Seeley, *Natural Religion*. 1882, pp. 142-145.

of religion which though not opposed to Christianity are yet scarcely to be discovered in it...In this opposition [spirit of opposition to secularity] there is much which does not seem to have been inspired by Christianity nor even of religion at all ; it prefers to call itself culture.

It is concerned more with art and science than with self-sacrifice or charity.

On the same principle Religion has been revived under the artificial name of culture.

Thus instead of saying that the stubstance of religion is morality and the effect of it moral goodness, we lay it down that the substance of religion is culture and the fruit of it higher life.

উদ্ধৃত প্রাসঙ্গিক অংশটির মধ্যে প্রণিধানযোগ্য হচ্ছে এই কয়টি—১. এ যুগে এমন কতকগুলি নতুন উপাদানকে স্বীকার করতে হবে, যা হয়তো প্রচলিত খ্রীস্টধর্মে নেই। ২. এ যুগে যে নতুন মূল্যবোধ ধর্মের প্রতিযোগী হয়ে দাঁড়াচ্ছে তা হচ্ছে সংস্কৃতি বা Culture. ৩. কালচার হচ্ছে কলা এবং বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির সঙ্গে সংযুক্ত। ৪. সংস্কৃতি ধর্মের স্থান নিচ্ছে। ৫. ধর্মের সার নীতি, এ কথা না বলে বলা উচিত ধর্মের সার হচ্ছে সংস্কৃতি।

যে সমস্যা থেকে সীলি কালচারের তত্ত্বে পৌঁছেছিলেন বঙ্কিমের মনীষাও সেখানেই সমাধান খুঁজেছে। কিন্তু উপরে উদ্ধৃত যে পংক্তিটি বঙ্কিমের প্রয়োগের ফলে বিখ্যাত হয়েছে, তার সঙ্গে কিন্তু বঙ্কিমের অনুশীলন-তত্ত্বের সাদৃশ্য দূরান্তরিত। ইংরেজি শব্দটির সহজ বাংলা করলে যে শব্দটি পাওয়া যায়, তাকেই অবলম্বন করে বঙ্কিম অনুশীলন-তত্ত্বের সৌধ গড়েছেন। সীলি যে অর্থে 'কালচার' কথাটি ব্যবহার করেছেন সেই অর্থে একে প্রায় ধর্মীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত করেন গ্যেটে। সত্য ও সৌন্দর্যের আদর্শে বিশ্বাসী কার্লাইল এর উচ্ছ্বাস বহন করে আনেন ইংলণ্ডে। কালচার নিয়ে cult-সৃষ্টি গ্যেটে এবং শিলারই করেন এবং ধর্মচেতনাকে প্রায় আচ্ছন্ন করে ফেলেন। রঙ্গালয় এবং শিক্ষালয়গুলি কালচারের পীঠস্থানে পরিণত হল। গ্যেটে কালচারের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছিলেন 'Life in the Whole, in the Good, in the Beautiful'. অখণ্ডতাবোধ এবং সৌন্দর্যবোধের মধ্যস্থলে নীতিবোধের স্থান।

সাম্প্রদায়িক নীতিবোধ নয়, অখণ্ড সৌন্দর্যচেতনা থেকে উৎপন্ন ভিন্নতর নীতিবোধই তাঁর কাম্য ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন-ধর্ম ঠিক এ রকম নয়। তাঁর ধর্ম কর্মাত্মক। সমাজের উপযুক্ত হবার জন্য ব্যক্তির বৃত্তির কর্ষণ। মানুষ তার স্বভাবধর্মকে কাল্পনিক আদর্শে পরিবর্তিত না করে বিকাশের জন্য সমানভাবে কর্ষণ করবে। বঙ্কিম চেয়েছেন সামাজিকরূপে মানুষের অস্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলতে। আত্মকেন্দ্রিক অথবা দুর্বল, মস্তিষ্কসর্বস্ব কিংবা হৃদয়হীন রসবিলাসী কোনো রকম মানুষকেই তিনি আদর্শ বলে মনে করেন নি। কেউ কেউ মনে করেছেন বৃত্তির সমঞ্জস অনুশীলনের আদর্শ বঙ্কিমচন্দ্র কেশবচন্দ্রের রচনা থেকে পেয়েছিলেন।[১] কথাটা ঠিক নয়। কালীনাথ দত্ত লিখেছেন[২]—

'বঙ্কিমবাবু বাঙ্গালার বর্তমান সাহিত্যের বিশেষতঃ ধর্মসাহিত্যের কোন ধারই ধারিতেন না এবং কোন সংবাদই লইতেন না। ইহা তাঁহার ন্যায় একজন ধর্মনেতা ও বঙ্গসাহিত্যপোতের কর্ণধারের পক্ষে বড়ই শোচনীয় অভাব।'

অনুশীলনের ভাবটি বঙ্কিম কোথা থেকে পেয়েছিলেন, তার ইঙ্গিত তিনি নিজেই রেখে গিয়েছেন—

Religion, in itself expresses the state of perfect unity which is the distinctive mark of man's existence both as an individual and in society when all the constituent parts of his nature, moral and physical, are made habitually to converge towards one common purpose.

কোমতের এই মতটি তিনি ধর্মতত্ত্বে উদ্ধৃত করেছেন।[৩] হারবার্ট স্পেন্সারও তাঁর *Data of Ethics* গ্রন্থে মানুষের অসমঞ্জস আচরণের কুফলের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন।[৪] ধর্মতত্ত্বে বঙ্কিমচন্দ্র মানুষকে কৃতকর্মের জন্য দায়ী করে মনুষ্যত্বের পূর্ণতার আশা ও গৌরব করেছেন; তার সূত্রপাত ইউটিলিটারিয়ানদের চিন্তায়। সামঞ্জস্যের অভাবই দুঃখ—বঙ্কিমের এই মতের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় জন স্টুয়ার্ট মিলের মতবাদে। মিল বলেন, মানুষের সব দুঃখই দূর করা সম্ভব। সমাজের সুষ্ঠু বিধানে, ব্যক্তির শুভবুদ্ধিতে দারিদ্র্য-দুঃখকেও নিশ্চিহ্ন করা যায়। এমন কি শারীরিক ও

১ কাজী আবদুল ওদুদ, 'বাংলার জাগরণ', বিশ্বভারতী ১৩৬৩, পৃ ১০১

২ বঙ্কিম-প্রসঙ্গ, পৃ ২৩৪

৩ ধর্মতত্ত্ব, ক্রোড়পত্র খ

৪ বঙ্কিম কর্তৃক উদ্ধৃত। ধর্মতত্ত্ব, ক্রোড়পত্র গ

নৈতিক শিক্ষায় মানবদেহের রোগকেও অকিঞ্চিৎকর করে তোলা যায়[১]—

As for the vicissitude of fortune and other disappointments connected with worldly circumstances these are principally the effect either of gross imprudence of ill regulated desires or of bad or imperfect social institutions. All the grand sources in short of human suffering are in a great degree, many of the almost entirely, conquerable by human care and effort.

ধর্মতত্ত্বে বঙ্কিম যে সমস্যার সমাধান চেয়েছেন মিলের এই উক্তিতে তারই সঙ্কেত পাওয়া যায়। অথচ আশ্চর্যের বিষয় বঙ্কিম বলেছিলেন শেষের দিকে তাঁর উপর মিলের প্রভাব নাকি ছিল না।[২] কথাটার অর্থ আমরা এই ধরতে পারি যে মিলের অন্ধ অনুকরণ তিনি আর করেন নি। কিন্তু তাঁর মনীষা যে এঁদের দানে পুষ্ট হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। মিলের প্রভাবে প্রভাবিত 'সাম্য' প্রবন্ধটি তিনি আর ছাপেন নি—এই ঘটনাকে অনেকেই মনে করেছেন বঙ্কিমের চিন্তাশীলতার পশ্চাদ্‌গমন। বঙ্কিম নিজেও বলেছিলেন 'সাম্যটা সব ভুল'। সাম্য প্রবন্ধে আসলে পরের মতের, বিশেষত মিলের মতের, ব্যাখ্যা ছাড়া আর কি আছে? আর যা আছে, তা তিনি 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। ধর্মতত্ত্ব রচনার সময় স্বভাবতই তিনি সাম্যতত্ত্বে আস্থা রাখতে পারেন নি। ব্যক্তির বৃত্তির অনুশীলন ও সাফল্যের মতবাদের সঙ্গে সাম্যের মতবাদ খাপ খায় না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাস গভীর বলে অনুশীলনের দ্বারা ব্যক্তির যোগ্যতা অর্জনের অধিকারকে স্বীকার না করে তিনি পারেন না; বাইরের থেকে আরোপিত সাম্য সেখানে অস্বাভাবিক ও অসংগত। আপাতদৃষ্টিতে তাঁকে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবিরোধী বলে মনে হলেও আসলে তিনি ব্যক্তিত্ববাদী।

আসলে বঙ্কিম যে কাজটি করতে চেয়েছিলেন তা হচ্ছে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির যোগ নির্ণয়। আগেই বলেছি এই সমাজ পুরনো সমাজ নয়। এর প্রমাণ ধর্মতত্ত্বের মধ্যেই আছে। বিবর্তনবাদ আধুনিক চিন্তার একটি প্রধান বিষয়। অবশ্য বিবর্তনবাদ সম্বন্ধে মতবৈষম্য আছে। কোমত সমাজের প্রগতির যে ব্যাখ্যা করেছেন ডারুয়িনের ব্যাখ্যাত বিষয় তার থেকে আলাদা। ডারুয়িনের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র পরিচিত ছিলেন।[৩] ডারুয়িনের মত খ্রীস্টান সমাজের মধ্যে আলোড়ন আনলেও বঙ্কিমকে বিশেষ উদ্বিগ্ন

১ J. S. Mill *Utilitaranism* (Everyman edition), p. 9.

২ বঙ্কিম-প্রসঙ্গ, পৃ ১৯৮

৩ দ্রষ্টব্য 'ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে'।

করে নি। কারণ বঙ্কিম অতিলৌকিককে বর্জন করেই আলোচনা করেছেন। সুতরাং বিবর্তনবাদ তাঁর কাছে বিশেষ উদ্বেগজনক নয়। বিশেষ করে সমাজনীতির ভাবনাই তাঁর প্রধান ছিল বলে নৈতিক বিবর্তনই তাঁর বিশেষ বিবেচ্য। কোমতের মত তাঁকে যত সাহায্য করেছিল, যুক্তিবাদিতার পরিপ্রেক্ষিতে আর কোন মতই তাঁকে তত সাহায্য করে নি। এ বিষয়ে তাঁর অভিমত—

'শিক্ষা যে ধর্মের অংশ ইহা কোম্‌তের মত।

হইতে পারে। এখন, হিন্দুধর্মের কোন অংশের সঙ্গে যদি কোম্‌ত মতের কোথাও কোন সাদৃশ্য ঘটিয়া থাকে তবে যবনস্পর্শদোষ ঘটিয়াছে বলিয়া হিন্দুধর্মের সেটুকু ফেলিয়া দিতে হইবে কি?'[১]

সমাজ-বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ক্রমেই ধর্মসচেতন হয়ে ওঠে এটা সত্য যদিও হয় তবে এটাও সত্য যে তার সঙ্গে ধর্মের স্বরূপও পরিবর্তিত হয়। কোমতের যুগে 'মানবতা' সেই ধর্মের স্থান নিয়েছে। ইতিপূর্বেই দেখা গিয়েছে বঙ্কিমচন্দ্র কোমতকে অনুসরণ করে ধর্ম অর্থে মানবতাকেই মোটামুটি ধরেছেন। এখানে বঙ্কিমের আর একটি উক্তি স্মরণযোগ্য—

'বৈজ্ঞানিক যখন "Law"র মহিমা কীর্তন করেন আর আমি যখন হরিনাম করি দুইজন একই কথা বলি। দুইজনে এক বিশ্বেশ্বরের মহিমা কীর্তন করি।'[২]

অষ্টাদশ শতাব্দীর চিন্তার প্রভাব বঙ্কিমের উপর কত প্রবল এই উক্তিতেই বুঝাতে পারা যাবে। অলৌকিকতা থেকে মুক্ত করে এমন-কি সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে বঙ্কিম অনুশীন-তত্ত্বের কল্পনা করেছেন। স্পেন্সার ও মিল থেকে প্রেরণা পেলেও এই তত্ত্বকে তিনি হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যায়, গীতা এবং কৃষ্ণচরিত্রের ব্যাখ্যায় ফুটিয়ে তুলেছেন। ভারতীয় মনীষার লক্ষণ বিচার করেছি। হিন্দু শাস্ত্র পুরাণ থেকে তিনি উদ্ধৃতি দিয়েছেন সত্য কিন্তু বঙ্কিম-মনীষা যে dogmatic নয়, এই দীর্ঘ আলোচনায় আশা করি তার কিছুটা আভাস পাওয়া গিয়েছে। অনুশীলন-তত্ত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপনে তিনি যদি কৃষ্ণচরিত্রকেই অবলম্বন করে থাকেন, তাতেও আসলে কোনো গোঁড়ামি নেই। সীলি তাঁর মত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যিশুখ্রীস্টের জীবনীকে নতুন করে আধুনিক দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর বইয়ের নাম 'Ecce Homo'—Behold the Man. তিনি মানুষকেই দেখতে চেয়েছেন—

They may be obliged to reconsider the whole subject from

১ ধর্মতত্ত্ব, পঞ্চম অধ্যায়

২ ধর্মতত্ত্ব, ষষ্ঠ অধ্যায়

the beginning and placing themselves in imagination at the time when we call Christ bore no such name, but was simply, as St. Luke describes him, a young man of promise, popular with those who knew him and appearing to enjoy the Divine favour, to trace his biography from point to point, and accept those conclusions about him, not which church doctors or even apostles have scaled with their authority, but which the facts themselves, critically weighed, appear to warrant.[১]

বঙ্কিমচন্দ্রও কৃষ্ণচরিত্রের দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপনে বলেছেন, 'কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার মানবচরিত্র সমালোচন করাই আমার উদ্দেশ্য।'

সীলির গ্রন্থ থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র আদর্শ পেয়েছিলেন। সীলি খ্রীস্টের যুগোপযোগী জীবনভাষ্য রচনা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও অনুশীলন-তত্ত্বের দৃষ্টান্ত রচনা করেছেন অলৌকিকতাবর্জিত যুক্তিসঙ্গত আলোচনায়। সীলির গ্রন্থ গোঁড়া খ্রীস্টানদের খুশি করে নি। বঙ্কিমের আলোচনাতেও বৈষ্ণব ভক্তরা খুশি হয় নি। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেও শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত মহাশয় বলেছিলেন[২]—

'সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্তিতার উপরও যে শুদ্ধতরা সাত্ত্বিকতরা ভক্তি আছে যাহা শ্রীগৌরাঙ্গদেব স্বয়ং আচরণ করিয়া পরকে শিখাইয়াছিলেন বঙ্কিম সে পর্যন্ত পৌঁছিতে পারেন নাই। বৈষ্ণবগণের ভাষায় তিনি বড় জোর শান্ত রস পর্যন্ত পৌঁছাইয়াছিলেন—তার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারেন নাই! বঙ্কিমের প্রচারিত ভক্তির অনেকটাই যেন বুদ্ধিবৃত্তির ক্রিয়া।'

এই মন্তব্যটি আসলে বঙ্কিমের অসামান্য মনীষার পরোক্ষ প্রশস্তি ছাড়া কিছুই নয়।

১ Seeley, *Ecce Homo*. 1866, preface. গ্রন্থটির প্রকাশের সময় লেখকের নাম ছিল না।

২ অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত, 'বঙ্কিমচন্দ্র' পৃ ৩১৬

বঙ্কিমচন্দ্র ও ভারতসংস্কৃতি

History supplies no second instance where the inward life of the soul has so completely absorbed all the practical faculties of a whole people.

—Max Muller

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আমাদের শিক্ষা এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে কয়টি শুভ লক্ষণ দেখা গিয়েছিল, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির আলোচনা তাদের অন্যতম। আমাদের জীর্ণ এবং ক্ষয়িষ্ণু সমাজের সম্মুখে যখন য়ুরোপীয় জীবনের প্রাণবন্ত আদর্শ এসে পড়ল, স্বভাবতই তখন চেষ্টা হয়েছিল আমাদের জীবনের আদর্শকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার জন্য। এই উদ্যমেই ইতিহাসচর্চা দেখা দিল এবং সেই উদ্যমেই প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য এবং ধর্মশাস্ত্রের পুনর্বিচার এবং পুনরনুসন্ধান চলেছিল। অবশ্য-এ কথা স্বীকার করতে হবে ইংরেজি বিদ্যার যুক্তিবাদিতা এবং তার বৈচিত্র্য আমাদের মনকেও জাগিয়ে দিয়েছিল। এর ফলে আমরা যে সর্বদা রক্ষণশীলতাকে প্রশ্রয় দিই নি, এ কথা সত্য নয়—সে কথা আজ আর অবিদিতও নেই।

নবজাগ্রত মনের ইতিহাসচর্চার জন্যই ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইতিহাস-গ্রন্থ রচনার প্রাচুর্যই চোখে পড়ে এবং সে-ইতিহাস পৃথিবীরই ইতিহাস। বহির্বিশ্বের সঙ্গে জ্ঞানের যোগে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া অবশ্যই কল্যাণকর; কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, আমাদের দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা ও অধ্যয়ন তখনও সর্বজনীন হয়ে ওঠে নি। সেই যুগে ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্ভবত স্কুলে অবশ্যপাঠ্য ছিল না। এ বিষয়ে শ্রীরামপুর মিশনের পাদ্রীরা ছিলেন অগ্রণী।[১] তাঁদের স্কুলে সম্ভবত ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ্য ছিল। জন ক্লার্ক মার্শম্যান ইংরেজিতে ভারতবর্ষের ইতিহাস (১৮৩১) রচনা করেছিলেন। ফেলিক্স কেরী মিলের ভারতবর্ষের ইতিহাস বাংলায় অনুবাদ করেন ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দের পূর্বেই। শ্রীরামপুর ছাড়া অ্যাডামের রিপোর্টে কলকাতার স্কুলগুলির মধ্যে Parental Academic Institution-এ ভারতবর্ষের ইতিহাস

১ যোগেশচন্দ্র বাগল, 'বাংলার জনশিক্ষা'। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, পৃ ১০

পাঠ্য ছিল বলে সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়।[১] আশ্চর্যের বিষয়, শ্রীরামপুর মিশনের পাদ্রীরা ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা এবং অধ্যাপনায় যত উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন তেমন আর কেউ নয়। শ্রীরামপুরের প্রকাশিত দিগ্‌দর্শন পত্রিকায় ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রকাশিত হয়েছিল। এই ইতিহাসটির জন্যই কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি পত্রিকাটি কিনে নেয়।[২] কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি থেকে একাধিক ইতিহাস-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল সত্য, কিন্তু সেগুলির অধিকাংশই ছিল পৃথিবীর ইতিহাস। ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ সেকালে নীতি হিসাবে সর্বত্র গৃহীত হয়েছিল বলে মনে হয় না।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধকে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শের ফলে সংঘাত এবং চাঞ্চল্যেরই যুগ বলা যায়। এই যুগে কেউই সম্ভবত সচেতন ভাবে ধ্রুব আদর্শের সাধনা করেন নি। বিচ্ছিন্নভাবে জাতীয় সংস্কৃতির সম্বন্ধে আলোচনা ও সন্ধান চলেছিল বটে, কিন্তু সমগ্রভাবে কোনো একটি অভিপ্রায়ের দিকে সেকালের চিন্তা লক্ষ্যবদ্ধ হয় নি। একদিকে রামমোহন রায়ের উদার মানবতাবোধ উপনিষদে তার ভাষা খুঁজে পেয়েছিল, আর-এক দিকে রাধাকান্ত দেব প্রাচীন আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সংস্কৃতির সর্বোত্তম বিকাশ দেখলেন; আবার সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভায় ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং সংস্কৃতির নিস্পৃহ নির্মোহ আলোচনা দেখা গেল। জ্ঞানোপার্জিকা সভার আলোচনা-পদ্ধতিতে প্রভাব পড়েছিল এশিয়াটিক সোসাইটির গবেষণারীতির। এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৭৮৪ সালে। সার উইলিয়ম জোন্‌স্‌, সার চার্লস্‌ উইলকিন্‌স, এইচ. টি. কোল্‌ব্রুক প্রভৃতির চেষ্টায় এশিয়াটিক রিসার্চেস পত্রিকায় প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের বিভিন্ন দিক্‌ নিয়ে প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হতে থাকে। এঁদের উদ্যমেই ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে নবপরিচয়-সাধনের বিস্তীর্ণ প্রয়াস দেখা দিল। বৈদেশিকদের দ্বারা প্রবর্তিত আলোচনা-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তাঁরা ছিলেন বৈজ্ঞানিক এবং যুক্তিবাদী। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি যে তাঁদের বিশেষ হৃদয়গত অনুরাগ ছিল এ কথা বলা চলে না। বঙ্কিমচন্দ্র পরে এঁদের কাছে অশেষ ঋণ স্বীকার করেও এঁদের যথেষ্ট সমালোচনা করেছিলেন।

১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার সভ্যরা যে দেশীয় অপেক্ষা বৈদেশিক সংস্কৃতির দ্বারা অধিকতর প্রভাবিত ছিলেন, এ কথা সকলেই জানেন। এঁদের আদর্শ ছিল যুক্তিবাদিতার আদর্শ। হিন্দু কলেজের ছাত্র মাধবচন্দ্র মল্লিক

১ Adam's Report on the State of Education in Bengal, 1835-38, Calcutta University p. 39.

২ ভবতোষ দত্ত, 'দিগ্‌দর্শন পত্রিকা', ইতিহাস, ভাদ্র-কার্তিক, ১৩৬১

সমাচারদর্পণে লিখেছিলেন[১]—

If there be anything under heaven that either I or my friends look upon with the most abhorrence it is Hindooism. And if there be anything that we regard as best instrument of evil it is Hindooism.

হিন্দু কলেজের এই ছাত্রদের দ্বারাই সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা গঠিত হয়। হিন্দুধর্মের প্রতি এঁদের বিরাগ থাকলেও ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রতি এঁরা বিমুখ ছিলেন না। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, গোবিন্দচন্দ্র সেন দেশের অতীত ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছেন। ডিরোজিও তাঁদের স্বাধীন চিন্তা করতে শিখিয়েছিলেন বটে, কিন্তু স্বদেশের কল্যাণসাধনে মমত্বহীন হতে শিক্ষা দেন নি। ডিরোজিও নিজে স্বদেশভূমি এই ভারতবর্ষের অতীত গৌরবে গর্বিত ছিলেন। জন্মভূমিকে উদ্দেশ করে তিনি একটি সুন্দর সনেটও রচনা করেছিলেন। স্বদেশের সংস্কারচিন্তাতেও তিনি ছিলেন উৎসাহী। সতীদাহ নিবারণে উল্লাস প্রকাশ করেও তাঁর সনেট আছে। বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ আন্দোলন করার আগে জ্ঞানোপার্জিকা সভার মুখপত্র বেঙ্গল স্পেক্টেটরে বিধবা-বিবাহের প্রয়োজনীয়তার কথা আলোচিত হয়েছিল।[২] নব্য বঙ্গের মনস্বী যুবকদের স্বাধীন চিন্তার সঙ্গে যদি স্বদেশের কল্যাণসাধনের চিন্তা যুক্ত হয়ে থাকে, তবে তার অন্যতম কারণ ছিলেন রামমোহন-সহচর তারাচাঁদ চক্রবর্তী এবং চন্দ্রশেখর দেব। তারাচাঁদ মনুসংহিতার অনুবাদ আরম্ভ করেছিলেন বলে প্যারীচাঁদ মিত্র উল্লেখ করেছেন।[৩] তারাচাঁদ এই নব্যবঙ্গের নেতারূপে দেখা দিয়েছিলেন। সম্ভবত তারাচাঁদ এবং চন্দ্রশেখরের মাধ্যমে জ্ঞানোপার্জিকা সভার সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্ববোধিনী সভার একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ সহযোগিতা স্থাপিত হয়েছিল। বেঙ্গল স্পেক্টেটর পত্রিকায় তত্ত্ববোধিনী সভার সশ্রদ্ধ উল্লেখ এবং বিবরণও লক্ষ্য করা যায়।[৪]

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতীয় সংস্কৃতির উচ্চ আদর্শের বাণী দিয়েছিলেন প্রথমত রামমোহন, দ্বিতীয়ত দেবেন্দ্রনাথ। রামমোহন যদিও যুক্তিবিচারের পথেই চলেছিলেন, কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন একটি মহৎ আদর্শকে জাগিয়ে তুলতে।

১ ৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৩১-এ লেখা চিঠি সমাচারদর্পণে প্রকাশিত হয় ৮ অক্টোবর, ১৮৩১।

২ *The Bengal Spectator*, July 1842, p. 51 এবং 15th January 1843, p. 21

৩ *A Biographical Sketch of David Hare*, 1877, p. 32.

৪ *The Bengal Spectator*, December 1, 1842, p. 161 এবং January 1, 1843, p. 5

বেদান্তের মধ্যেই তিনি পেয়েছিলেন বিশ্বমানবতাবোধ। তিনি সকল ধর্মাবলম্বীকে একটি প্রার্থনাসভায় মিলিত করতে চেয়েছিলেন—সেই সাহস এবং ভরসা তিনি লাভ করেছিলেন বেদান্তধর্মে। উপনিষদের ধর্ম একটি উদার সার্বভৌম উপলব্ধিতে নিয়ে যেতে পারে, ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ দানকে রামমোহন এইভাবেই কল্পনা করেছিলেন। তিনি বিভিন্ন ধর্ম পর্যালোচনা করেছিলেন এবং তারই মধ্যে বেদান্তের আশ্রয়ে সর্বজনীন সত্যে উপনীত হতে তাঁর বাধা হয় নি। রামমোহন শাস্ত্রবিচার করেছিলেন সত্য; কিন্তু আধুনিক পদ্ধতিতে নয়, আমাদের দেশের দুর্ধর্ষ নৈয়ায়িকের পদ্ধতিতে। সুতরাং রামমোহনের সংস্কৃতি-বিচারণায় তত্ত্ব বা চিন্তার প্রাধান্যই লক্ষ্য করা যায়। অথচ রামমোহনের মতো বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন কর্মবীর বিরল। এইজন্য মনে হয়, রামমোহনের আদর্শে তত্ত্ব ও কর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য-সাধনে খানিকটা অপূর্ণতা আছে; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ভক্তি দিয়ে সেই অপূর্ণতাটিকে সম্পূর্ণ করলেন। দেবেন্দ্রনাথ বললেন বাস্তব জীবনের মধ্যেই ব্রহ্মকে অনুভব করতে; সুতরাং জীবনের দায়িত্বভারকেই শ্রদ্ধার সঙ্গে তুলে নেওয়াই যথার্থ মনুষ্যত্ব। রামমোহন বা দেবেন্দ্রনাথ, কেউই ঠিক ঐতিহাসিক পদ্ধতির অনুসরণ করেন নি। কিন্তু তাঁরা উভয়েই প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে গিয়েছেন। দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের ধর্ম যথাযথ গ্রহণ করেন নি। তিনি ছিলেন ভক্তিপথের পথিক। নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনায় তিনি তৃপ্ত হন নি। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অক্ষয়কুমার দত্তের প্রভাবে তিনি বেদকে অভ্রান্ত মনে না করে উপনিষদ থেকে নতুন করে ধর্মশাস্ত্র সংকলন করলেন। অর্থাৎ তিনি উপনিষদকে শুধু বিচারের বস্তু করলেন না; তিনি তাকে জীবনধর্মে পরিণত করলেন। দেবেন্দ্রনাথ মূলত ছিলেন ধর্মপ্রবক্তা। তাঁর ধর্ম ছিল উপলব্ধির ধর্ম। ভারতবর্ষের প্রাচীন হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি দিয়েই তাঁর মনঃপ্রকৃতি গঠিত হয়েছিল। রাজনারায়ণ বসু 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' গ্রন্থে লোকধর্ম এবং দেবদেবী-বিবর্জিত উদার আত্মোপলব্ধির ধর্মসংস্কৃতির আলোচনা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তারই সমালোচনায় বিনয়সহকারে লিখলেন[১]—

'তিনি বলেন যে, ব্রহ্মোপাসনাই হিন্দুধর্ম। অতএব ব্রহ্মোপাসনা যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম কেবল তাহাই সমর্থন করা তাঁহার উদ্দেশ্য। এ দেশের সাধারণ ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। হিন্দুধর্ম সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম---কিন্তু আমাদের দেশের চলিত ধর্ম শ্রেষ্ঠ, এমত কথা তিনি বলেন না। যে ধর্মকে তিনি শ্রেষ্ঠ বলেন, তৎসম্বন্ধে লোকের বড় মতভেদ নাই। পরব্রহ্মের উপাসনা—সকল ধর্মের অন্তর্গত—সকলেরই সারভাগ।'

১ বঙ্কিম-গ্রন্থাবলী, বিবিধ, পরিষৎ-সংস্করণ, পৃ ৩২৮

দেবেন্দ্রনাথের প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ ভাব-বীজগুলি নিয়ে পরিকল্পিত হয়েছিল, সে কথা বঙ্কিমচন্দ্রও অস্বীকার করতে পারেন নি। অখণ্ড ভারতবর্ষের কল্পনাতেও দেবেন্দ্রনাথের অন্তর অনুরূপভাবেই আচ্ছন্ন ছিল। রাজনারায়ণ বসুর এই ভারতীয় জাতীয়তা বিশেষ করে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের চিন্তা হলেও জাতীয গৌরববোধের প্রাথমিক ভূমিকা রচিত হয়েছিল দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম ও সংস্কৃতিচর্চায়। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, দেবেন্দ্রনাথই ঋগ্‌বেদের অনুবাদ আরম্ভ করেছিলেন। রমেশচন্দ্র দত্ত সেই আরব্ধ কর্মটিকে পরের যুগে সুসম্পন্ন করেছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের লক্ষ্য ধর্ম হলেও ধর্মের আলোচনাপ্রসঙ্গে তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যরা প্রায় সকলেই প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি-আলোচনায় ব্যাপৃত হয়ে পড়েন। অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি সকলেই এই সাধারণ মনোভাবে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। অক্ষয়কুমার যুক্তিবাদী মনীষী। 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়' এবং 'প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্যবিস্তার' অক্ষয়কুমারের ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহের দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখযোগ্য। ঈশ্বরচন্দ্রের 'সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব' এবং মহাভারতের অনুবাদ ছাড়াও সংস্কৃত সাহিত্যের কাহিনী বাংলায় অনুবাদ করাতে আদর্শোজ্জ্বল ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতি তাঁর নিবিড় অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। তিনি যে সংস্কৃত-পণ্ডিতদের মনোভাবেই সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা করেন নি, যিনি তাঁর জীবনী আলোচনা করেছেন তিনিই সে কথা জানেন। আসলে তিনি তাঁর সমসাময়িক সমাজের কলহ ও মালিন্য থেকে মুক্তি খুঁজেছিলেন একটি বলিষ্ঠ উদার দীপ্ত সভ্যতার মধ্যে। সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা তাঁকে সেই অবকাশ দিয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবর্ষের গৌরবময় অতীত সংস্কৃতি নিয়ে যথেষ্ট চিন্তা এবং অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁর প্রবন্ধগুলিতে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি পূর্ববর্তীদের কোনো একটি পথের অনুসরণ না করে একটি সমন্বিত আদর্শ নিজের কল্পনায় সৃষ্টি করে নিয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অধ্যাত্মবিচারের ব্যক্তিতান্ত্রিক পদ্ধতির সঙ্গে তিনি প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার যুক্তিবিচারকেও গ্রহণ করলেন। এক দিকে যুক্তি ও তথ্য, অন্য দিকে একটি বলিষ্ঠ আদর্শকল্পনা—দুটিই বঙ্কিম একাধারে স্বীকার করে নিলেন। ফলে বঙ্কিমচন্দ্র সমালোচনার দুই বিপরীত আক্রমণের পথই উন্মুক্ত রাখলেন। কেউ বললেন, তিনি অধ্যাত্ম-উপলব্ধিকে মূল্য না দিয়ে শুধুই যুক্তির পথে গিয়েছেন, আবার কেউ বললেন, তিনি যুক্তিকেও নিজের কল্পিত আদর্শে সাজিয়ে নিয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তায় কিন্তু আর-একটি দিকের উপরেও জোর পড়ল। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্কিম বাংলাদেশের ইতিহাসের জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করলেন। বঙ্কিমের বঙ্গপ্রীতি বৃহত্তর ভারতচিন্তার বিরোধী নয়, এটা তাঁর সমগ্র রচনাবলী পর্যালোচনা করলেই বুঝতে পারা যায়। বঙ্কিমের বাংলাদেশ সম্বন্ধীয় রচনাগুলি পড়লে তাঁকে সংকীর্ণমনা বলে মনে হতে পারে; কিন্তু সমগ্রভাবে দেখলে বাংলা ও ভারতবর্ষ তাঁর চিন্তায় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। বাংলাদেশের গৌরব যে বৃহত্তর আর্য-গৌরব থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, এটা তিনি জানতেন। 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন—

'আর্যগণ বাঙ্গালায় তাদৃশ মহৎ কীর্তি রাখিয়া যান নাই—আর্যকীর্তিভূমি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল। এখন দেখা যাইতেছে যে আমরা সে কীর্তি ও যশেরও উত্তরাধিকারী। সেই কীর্তিমন্ত পুরুষগণই আমাদিগের পূর্বপুরুষ। দোবে চোবে পাঁড়ে তেওয়ারীর মত আমরাও ভারতীয় আর্যগণের প্রাচীন যশের ভাগী বটে।'

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশের ইতিহাস-সন্ধানে উত্তরভারতীয় আর্যদের সঙ্গে আত্মীয়তার যোগ অনুভব করেছেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, উনবিংশ শতাব্দীর উত্তরার্ধে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির চর্চা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছিল, তেমনি আর্যগৌরব-বোধও খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কাব্যের ক্ষেত্রে পুরাণ ইত্যাদি তো বটেই, রাজেন্দ্রলাল, রমেশচন্দ্র, রামদাস সেন, রজনীকান্ত গুপ্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ঐতিহাসিক প্রবন্ধাবলীতেও অতীতচারণের স্থর বেজে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনকে আশ্রয় করে ভারতসংস্কৃতি আলোচনার একটি পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে। এই আর্যগৌরব-বোধের মধ্যে থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশের ইতিহাসের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করলেন। এটা বিভক্ত মনোভাবের দৃষ্টান্ত নয়, এটা পূর্ণ ব্যক্তিত্বেরই দৃষ্টান্ত। সেই ব্যক্তিত্ব কিভাবে গড়ে ওঠে, তার বিশদ ব্যাখ্যাও বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্বে আছে[১]—

'এই জাগতিক প্রীতির সঙ্গে আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি এবং স্বদেশপ্রীতির প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধ নাই। আপাতত যে বিরোধ আমরা অনুভব করি, সেটা এই সকল বৃত্তিকে নিষ্কামতায় পরিণত করিতে আমরা যত্ন করি না এইজন্য। অর্থাৎ সমুচিত অনুশীলনের অভাবে।'

বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যকালে যাঁর কাছে শিক্ষানবিশি করেছিলেন, চিন্তাশীল ভাবুক বলে তাঁর কোনো খ্যাতি নেই। কবি ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বাঙালী মনোভাবের কথা উল্লেখ করেছিলেন। এই মনোভাব বঙ্কিমের তরুণ মনকে প্রভাবিত করে থাকবে। কিন্তু গভীরতর জ্ঞানসাধনায় যখন বঙ্কিমের মনীষা

১ ধর্মতত্ত্ব, চতুর্বিংশতি অধ্যায়

জেগে উঠল তখন তথ্য ও ইতিহাস-স্মৃতি দিয়ে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির মর্ম অনুধাবনে নিরত হলেন। এখানে আমরা স্মরণ করতে পারি ঈশ্বর গুপ্ত দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ব-বোধিনী সভার সভ্য হয়ে এবং অনেকটা এরই আদর্শে প্রণোদিত হয়ে ভারতীয় ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাপরবশ হয়েছিলেন। তিনি প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস কিংবা ধর্ম-দর্শনের আলোচনায় পটু ছিলেন না। তবে তিনি সাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করতে পারতেন।[১] ঈশ্বর গুপ্তের এই শক্তির একটি সুদূরপ্রসারী ফল দেখা গেল— মনীষীদের চিন্তাকে সাধারণ বাঙালীর সহজবোধ্য এবং গ্রহণীয় তিনিই করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের যে বাঙালী মনোভাবের উল্লেখ করেছেন, সেটি তাঁর কোনো মতবাদ নয়। সংবাদপ্রভাকরের পৃষ্ঠায় তিনি বাংলাদেশের সংবাদই যে পরিবেশন করতেন তা নয়, ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের সংবাদও তিনি প্রচার করতেন এবং স্বাদেশিক অনুভূতির বশে তাদের সম্বন্ধে মন্তব্য করতেন। ঈশ্বর গুপ্তই বোধহয় প্রথম ভারত-ভূমিকে 'জননী' সম্বোধন করেছিলেন—

জননী ভারতভূমি আর কেন থাক তুমি
ধর্মরূপ ভূষাহীন হয়ে ?
তোমার কুমার যত সকলেই জ্ঞানহত
মিছে কেন মর ভার বয়ে ?

এই কবিতাটি তিনি পড়েছিলেন একটি সভায় বক্তৃতা করার উপলক্ষ্যে। এই বক্তৃতায় ভারতবর্ষের অতীত গৌরবের প্রতি নিবিড় শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে[২]—

'এই দেশ যখন স্বাধীন ছিল অর্থাৎ আমরা স্বজাতীয় রাজার অধীনে অবস্থান করিতাম তখন হিন্দুজাতির গৌরব জগন্ময় কিরূপ বিস্তৃত হইয়াছিল, আমাদিগের রাজ্যই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন রাজ্য ছিল এবং আমরাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সভ্যরূপে বিখ্যাত ছিলাম, প্রথমতঃ এই দেশ হইতেই বিবিধ বিদ্যার সৃষ্টি হইয়াছে। জ্যোতিষ বিদ্যা, ক্ষেত্র পরিমাপক বিদ্যা, রেখাগণিত বিদ্যা এবং বিজ্ঞান বিদ্যা প্রভৃতি বহুবিধ জ্ঞানবর্ধিনী বিদ্যা প্রথমেই অস্মদ্দেশীয় কতিপয় মহাত্মা ব্যক্তিকে অবলম্বনপূর্বক পৃথিবীতে পদার্পণ করত হিন্দুসমাজে আদরপ্রাপ্তা হয়েন, ঐ সময়ে অবনীর অন্যান্য তাবদ্দেশ অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন ছিল···।'

ঈশ্বর গুপ্তের এই ভারতীয় দৃষ্টির সঙ্গে বাঙালী মনোভাবের কিছুমাত্র বিরোধ ঘটে

১ সাধারণের উপর ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব কি রকম ছিল, তার বর্ণনা দিয়েছেন শিবনাথ শাস্ত্রী। দ্রষ্টব্য 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', তৃতীয় সংস্করণ পৃ ২৩১।

২ সংবাদপ্রভাকর, ১ বৈশাখ ১২৫৫

নি। বঙ্কিমচন্দ্র সংবাদপ্রভাকরের পৃষ্ঠা থেকে ছাত্রাবস্থায় যে অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন, এই যুগ্মধারা তাকে রসসিঞ্চিত করেছিল বলে মনে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য স্বভাবতই বৃহত্তর উৎস থেকে পুষ্টিলাভ করেছিল, অন্তত বাল্যকালে তাঁর মনের পরিণতি-সাধনে সংবাদপ্রভাকর বাধার সৃষ্টি না করে আনুকূল্য করেছিল, এটুকু বলা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত নীলমণি বসাকের 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' উল্লেখযোগ্য। এই বইয়ের তিনটি খণ্ড; ১ম ভাগ হিন্দু যুগ, ২য় ভাগ মুসলমানদিগের রাজ্য, ৩য় ভাগ মোগল রাজাদিগের রাজ্যকাল। ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিরল আলোচনার যুগে নীলমণি বসাকের এই বইখানি বিশেষভাবেই স্মরণীয়। যে সব বই থেকে লেখক উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন, তাদের মধ্যে মনুসংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বিবিধার্থসংগ্রহ, আসিয়াটিক রিসার্চ, ওয়ার্ড সাহেবের হিন্দুবৃত্তান্ত ও এলফিনস্টোন, মরে, কিটলী, স্টুয়ার্ট সাহেবের ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং ফেরেস্তার পারশী গ্রন্থ অন্যতম। প্রথম ভাগের বিজ্ঞাপনে লেখক বলেছেন—

'এই দেশের যে পুরাবৃত্ত আছে তাহা ইংরাজী ভাষাতে লিখিত, বাঙ্গালা ভাষাতে এই পুরাবৃত্ত প্রায় নাই। এই ভাষাতে যে দুই একখানা পুস্তক দেখা যায় তাহা ইংরাজী হইতে ভাষান্তরিত, তাহাতে হিন্দুদিগের প্রাচীন বৃত্তান্ত কিছুই নাই এবং তাহা এমত নীরস যে কোন ব্যক্তি তাহা পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন না এবং পাঠ করিলেও তৃপ্তি-বোধ হয় না।'

বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস নিয়ে যে শ্রদ্ধা অনুরাগ এবং গর্ব লক্ষ্য করি এই ইতিহাসখানিতে তার সূচনা ছিল।[১]

অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার ইতিহাস রচনার সচেতন উদ্দেশ্য দ্বারা যেমন চালিত হয়েছিলেন, ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় তিনি সেভাবে ব্রতী হন নি। ভারতবর্ষ নিয়ে ইতিহাসাশ্রিত প্রবন্ধ তাঁর অন্তত তিনটি আছে—ভারতকলঙ্ক (বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১২৭৯), ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা (বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১২৮০) এবং প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি (বঙ্গদর্শন, আশ্বিন ১২৮০)। ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই জুলাই বঙ্কিমচন্দ্র নবীনচন্দ্রকে একটা চিঠিতে লেখেন তিনি ভারতবর্ষের একটি ইতিহাস রচনার অভিপ্রায় করেছেন। তাঁর সেই গ্রন্থটির পরিকল্পনা ছিল এই রকম[২]—

১ শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য' (১৯৫৯) গ্রন্থের ৪১৮-৪২০ পৃষ্ঠায় এই বইটির তাৎপর্যের অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সংকলিত 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' (সাহিত্য-সাধকচরিতমালা) গ্রন্থে পৃ ৯৬, একটি খসড়া খাতা থেকে উদ্ধৃত।

Character of the Ancient Hindus, Maritime Power and habits, External Commerce, Manners and Customs (women and widow marriage), Dates of authors, Wealth of Ancient India, Government, Military Power, Arab Expedition, Arab Geographers, Historical and Miscellaneous.

বঙ্কিমচন্দ্রের এই গ্রন্থটি আর লেখা হয় নি। যদি লেখা হত তবে বইতে বঙ্কিমচন্দ্র কী ভাবগত সূত্র অবলম্বন করতেন বলা শক্ত। কেননা সমগ্রভাবে ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা কী ছিল, সে-সম্বন্ধে আমরা তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ থেকে মাত্র অনুমানই করতে পারি। *তাঁর দুটি প্রবন্ধ 'ভারতকলঙ্ক' এবং 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা' বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক দৃষ্টির পরিচয় বহন করছে। এই দুটি প্রবন্ধ পড়লে তাঁর একটি অনুসন্ধিৎসা স্পষ্ট হয়। এই ভারতভূমিতে একটি জাতি পূর্বকাল থেকে বাস করছিল, তারা কোনোদিন একটি মাত্র জাতি হিসাবে বদ্ধ ছিল না। ভারতবর্ষ বারবার বাইরের জাতি দ্বারা বিভিন্ন সময়ে আক্রান্ত হয়েছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই বিজিত হওয়ার ফল বঙ্কিমচন্দ্র অনুধাবন করতে চেয়েছেন। বারবার বিজিত হওয়ার জন্যই স্বাধীনতা ও পরাধীনতার রাজনৈতিক তাৎপর্য তিনি বিশ্লেষণ করে দেখতে চেয়েছেন। কখনও কখনও বিজেতা জাতি এদেশ লুণ্ঠন করে ফিরে গিয়েছে, আবার কখনও বিজেতারা এ-দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। এ দেশের লোকেরা এই বিদেশী আক্রমণকে প্রতিহত করতে পারে নি কেন? সে কি বাহুবলের অভাব? সে কি একতার অভাব?

বঙ্কিমচন্দ্রের এই কৌতূহলের প্রেরণা ছিল দেশাত্মবোধ। কিন্তু যে সময়ে বঙ্কিম এই প্রবন্ধ লেখেন সে সময়ে তাঁর খরধার যুক্তিবোধ এবং প্রগাঢ় ইতিহাসজ্ঞান দেশাত্মবোধের অন্ধ আবেগের দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল না। তিনি একটি একটি করে তথ্য সমাবেশ করে ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের প্রকৃতি বিচার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে হিন্দুযুগের পৌরাণিক ঘটনাগুলির ভাবগত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন ; মধ্যযুগের লৌকিক ধর্মসংস্কৃতির মর্মও বুঝিয়ে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক ঘটনা অনুসরণ করেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাখ্যার প্রকৃতি অন্য রকম। তিনি ইতিহাসের ঘটনাধারার বস্তুভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে ভারতীয় জাতির উত্থান পতন থেকে নৈতিক সূত্র নির্ণয় করেছেন।

এইজন্য বিশেষ করে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতের পূর্বস্থাপিত অধিবাসীদের সঙ্গে বহিরাগত জাতির সংঘাতের ঘটনাগুলিই আলোচনার বিষয় রূপে গ্রহণ করেছেন। কারণ এর

দ্বারাই জাতিগত দুর্বলতা অথবা শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যাবে—যেটা আধুনিক ভারতীয় জাতিগঠনে বিশেষ দিক্‌নির্দেশের কাজ করতে পারে। দুটি প্রধান কারণের তিনি উল্লেখ করেছেন। প্রথমত 'ভারতবর্ষীয়েরা স্বভাবতই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা-রহিত', দ্বিতীয়ত 'হিন্দুসমাজের অনৈক্য, সমাজমধ্যে জাতিপ্রতিষ্ঠার অভাব, জাতি-হিতৈষার অভাব'। তিনি বলেছেন গ্রীকরা ভারতবর্ষ জয় করতে এসেছিল, কিন্তু যেটুকু সাফল্য লাভ করেছিল সেটুকু হিন্দুদের দুর্বলতার জন্য, বাহুবলের অভাবের জন্য নয়। তেমনি আরবদেশীয়রাও চেষ্টা করেও ভারতবর্ষ দখলে রাখতে পারে নি। সে কেবল হিন্দুদের রণনৈপুণ্যের জন্য। তুরকীয়েরাও আরবীয়দের মতোই ব্যর্থ হয়েছিল। সফল হয়েছিল শুধু পাঠানরা। 'আরব্য, তুরকী এবং পাঠান, এই তিন জাতির যত্ন-পারম্পর্যে সার্ধ-পাঁচশত বৎসরে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লুপ্ত হয়।' তখন হিন্দুদের 'রাজলক্ষ্মী ক্রমে ক্রমে মলিনা' হয়ে এসেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, হিন্দুরা জাতিপ্রতিষ্ঠা করতে পারে নি, তার কারণ বাহুবলের অভাব নয়—স্বাধীনতার-ই আকাঙ্ক্ষা ছিল না বলে। তাদের সাহিত্যে কোথাও স্বাধীনতার গুণগান নেই। 'তাহাদিগের বিবেচনায় যে ইচ্ছা রাজা হউক, আমাদের কি ? স্বজাতীয় রাজা, পরজাতীয় রাজা, উভয় সমান।' ভারতীয় চরিত্রে পার্থিব বিষয়ে এই ঔদাসীন্যই তাদের ভাগ্য নির্ধারণ করেছে। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র মেবারকে ব্যতিক্রম ধরেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে জাতিগঠনের দুটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন, শিবাজীর এবং রণজিৎ সিংহের।

'ভারতকলঙ্ক' পড়লে মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র জাতি বলতে শুধু হিন্দু জাতিকেই বুঝিয়েছেন। এই প্রবন্ধ লেখার কয়েক মাস পরে প্রকাশিত 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা' পড়লে দেখা যায় এ যেন পূর্ব প্রবন্ধেরই অনুবৃত্তি। বহিরাগত জাতি যদি দেশে স্থায়ী হয়ে বসে তবে রাজনৈতিক পরিস্থিতি কী রকম হয় ? এই সূত্রেই তিনি স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা, স্বতন্ত্রতা এবং পরতন্ত্রতার অর্থ বুঝিয়েছেন এবং বর্তমান ভারতবর্ষের সঙ্গে মোগল যুগের ভারতবর্ষের পরোক্ষ তুলনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিম একটি গভীর মন্তব্য করেছেন—

'পরতন্ত্র রাজ্যকেও স্বাধীন বলা যাইতে পারে। যথা, প্রথম জর্জের সময়ে হানোবর, মোগলদিগের সময়ে কাবুল। পক্ষান্তরে কখনও স্বতন্ত্র রাজ্যকেও পরাধীন বলা যাইতে পারে ; যথা নর্মাণদিগের সময়ে ইংলণ্ড, ঔরঙ্গজেবের সময়ে ভারতবর্ষ। আমরা কুতবউদ্দিনের অধীন উত্তর-ভারতবর্ষকে পরতন্ত্র ও পরাধীন বলি, আক্‌বরের শাসিত ভারতবর্ষকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বলি।'

এই সূত্র অনুযায়ী ইংরেজ আমলের ভারতবর্ষ পরতন্ত্রও বটে, পরাধীনও বটে। পরাধীনতার প্রকৃতি বোঝাতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র আর-একটি অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ উক্তি করেছেন, প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণেরাই প্রকৃতরূপে রাজপুরুষপদে বাচ্য। ব্রাহ্মণশাসিত সমাজকে স্বাধীন বলা যায় কি? 'যে পীড়িত হয় তাহার পক্ষে স্বজাতির পীড়ন ও ভিন্ন জাতির পীড়ন উভয়ই সমান'। প্রাচীন হিন্দুভারত ও মধ্যযুগের ভারতের সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে তুলনা করেই ইংরেজ আমলের ভারতবর্ষের চরিত্র এবং কর্তব্য নির্ধারণ করতে হবে। ইংরেজ আমলের ভারতবর্ষ হিন্দু এবং মুসলমান জনসাধারণের ভারত। এই সম্মিলিত জাতির প্রতিপক্ষ হচ্ছে বিদেশী ইংরেজ।

বঙ্কিমচন্দ্র ভারতর্ষের ইতিহাসের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের মর্ম এবং অর্থ নিষ্কাশন করেছেন। স্বভাবতই মধ্যযুগের ইতিহাসই হয়েছে তাঁর বিশেষ আলোচ্য। প্রসঙ্গত হিন্দুযুগের সমাজব্যবস্থার তিনি আলোচনাও করেছেন। বৌদ্ধযুগ সম্বন্ধে বলেছেন[১]—

'আদ্যকালে ক্ষত্রিয়েরাই রাজা ছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধকালে মৌর্য প্রভৃতি সংকরজাতীয় রাজবংশ দেখা যায়। চীন পরিব্রাজক হোয়েন্থ সাঙ সিন্ধুপারে ব্রাহ্মণ রাজা দেখিয়া গিয়াছিলেন।'

বঙ্কিমচন্দ্র স্বভাবতই প্রাচীন ভারতবর্ষের সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রকাশ করে সেকালের জ্ঞানসাধনা ও মনীষার পরিচয় দিয়ে বহু প্রবন্ধ লিখেছিলেন। বঙ্গদর্শনের যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের কৌতূহল ছিল স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসাবশত ঐতিহাসিক। সাংখ্যদর্শন (১২৭৯-৮০), Buddhism and The Sankhya Philosophy (১৮৭১খ্রী) প্রভৃতি দার্শনিক আলোচনা, উত্তরচরিত (১২৭৯), দ্রৌপদী (১২৮২), আর্যজাতির সূক্ষ্মশিল্প (১২৮১) প্রভৃতি সাহিত্যিক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও শিল্প-সম্বন্ধীয় বহু বিস্তীর্ণ প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। পরবর্তী পর্যায়ে বঙ্কিমের আলোচনা শাস্ত্র-ঘেঁষা হয়েছিল। ধর্ম-আলোচনায় লিপ্ত হয়েছিলেন বলেই জ্ঞান, হিন্দুধর্ম, Vedic Literature, Letters on Hinduism প্রভৃতি লেখাগুলিতে প্রাচীন হিন্দুসংস্কৃতির মর্ম ব্যাখ্যা করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। 'কৃষ্ণচরিত্রে'র মতো গ্রন্থেও তিনি নিয়মিত গবেষণাপদ্ধতি অবলম্বন করলেও বিশেষ প্রেরণাতেই তিনি সে কার্যে ব্রতী হয়েছিলেন।[২]

১ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা

২ এই প্রসঙ্গে বিমানবিহারী মজুমদারের '"কৃষ্ণচরিত্রে"র ঐতিহাসিক পুনর্বিচার' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য—সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, বর্ষ ৭২ সংখ্যা ১-৪, ১৩৭২।

প্রসঙ্গত প্রাচীন ভারতবর্ষের বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধযুগ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের সশ্রদ্ধ উল্লেখ স্মরণীয়। তখনও এদেশে বুদ্ধদেব সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনা আরম্ভ হয় নি। বঙ্গদর্শনে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, বুদ্ধদেব বা বৌদ্ধ-সংস্কৃতি সম্বন্ধে রামদাস সেন প্রবন্ধ লিখেছেন। রামদাস সেন ১৮৭৬-এ 'ঐতিহাসিক রহস্য' ২য় ভাগ প্রকাশ করলেন ; তাতে 'বৌদ্ধধর্ম', 'শাক্যসিংহের দিগ্বিজয়', 'বৌদ্ধমত ও তৎসমালোচন' বেরিয়েছিল। রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রকাশ করেছিলেন Lalitavistara (1877)। রাজেন্দ্রলাল বিবিধার্থসংগ্রহে 'অশোকরাজার উপাখ্যান' লিখেছিলেন ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে।[১] বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে 'সাম্য' প্রবন্ধটিতে লিখেছিলেন—

'যখন বৈদিক ধর্মসঞ্জাত বৈষম্যে ভারতবর্ষ পীড়িত, তখন ইনি জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষের উদ্ধার করিয়াছিলেন। পৃথিবীতে যতপ্রকার সামাজিক বৈষম্যের উৎপত্তি হইয়াছে, ভারতবর্ষের পূর্বকালিক বর্ণবৈষম্যের ন্যায় গুরুতর বৈষম্য কখন কোন সমাজে প্রচলিত হয় নাই।···তখন বিশুদ্ধাত্মা শাক্যসিংহ অনন্তকালস্থায়ী মহিমা বিস্তারপূর্বক, ভারতাকাশে উদিত হইয়া দিগন্তপ্রধাবিত রবে বলিলেন, "আমি এ উদ্ধার করিব। আমি তোমাদিগের উদ্ধারের বীজমন্ত্র বলিয়া দিতেছি, তোমরা সেই মন্ত্র সাধন কর। তোমরা সবই সমান।"'

বুদ্ধদেবের আবির্ভাবে ভারতবর্ষে যে সমৃদ্ধি সাধিত হয়েছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। সাংখ্যদর্শন প্রবন্ধেও বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—

'সহস্র বৎসর কাল বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের প্রধান ধর্ম ছিল। ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত মধ্যে যে সময়টি সর্বাপেক্ষা বিচিত্র এবং সৌষ্ঠবলক্ষণযুক্ত সেই সময়টিতেই বৌদ্ধধর্ম এই ভারতভূমির প্রধান ধর্ম ছিল।'

কমলাকান্তের দপ্তরেও কমলাকান্ত বেদনার্ত হৃদয়ে শাক্যসিংহকে স্মরণ করে বলেছেন[২]—

'কথাটি প্রাচীন। সার্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্বে শাক্যসিংহ এই কথা কত প্রকারে বলিয়া গিয়াছেন। তাহার পর, শত সহস্র লোকশিক্ষক শত সহস্র বার এই শিক্ষা শিখাইয়াছেন। কিন্তু কিছুতেই লোকে শিখে না—কিছুতেই আত্মাদরের ইন্দ্রজাল কাটাইয়া উঠিতে পারে না।'

বঙ্কিমচন্দ্র আর-একটি প্রবন্ধে শাক্যসিংহকে স্মরণ করেছেন। প্রবন্ধটির নাম

লোকশিক্ষা'। বুদ্ধদেবের সঙ্গে লোকজীবনের ঘনিষ্ঠ যোগের উল্লেখ করে তিনি বলেছেন[১]—

'লোকশিক্ষার উপায় না থাকিলে শাক্যসিংহ কি প্রকারে সমগ্র ভারতবর্ষকে বৌদ্ধধর্ম শিখাইলেন? মনে করিয়া দেখ, বৌদ্ধধর্মের কূটতর্কসকল বুঝিতে আমাদিগের আধুনিক দার্শনিকদিগের মস্তকের ঘর্ম চরণকে আর্দ্র করে; মক্ষমূলর যে তাহা বুঝিতে পারেন নাই কলিকাতা রিবিউতে তাহার প্রমাণ আছে। সেই কূটতত্ত্বময় নির্বাণবাদী অহিংসাত্মা, দুর্বোধ্য ধর্ম, শাক্যসিংহ এবং তাঁহার শিষ্যগণ সমগ্র ভারতবর্ষকে—গৃহস্থ, পরিব্রাজক, পণ্ডিত, মূর্খ, বিষয়ী, উদাসীন, ব্রাহ্মণ, শূদ্র সকলকে শিখাইয়াছিলেন।'

বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীন হিন্দুযুগের পটভূমিতে কোনো কাহিনী রচনা করেন নি; তবে 'যুগলাঙ্গুরীয়ে'র কাহিনী বৌদ্ধযুগের পটভূমিতে পরিকল্পিত বটে। এতেও যুগের পরিবেশ তেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। প্রাচীন ভারতের অন্যান্য দিক নিয়ে তাঁর বিশেষ আলোচনা নেই। সীতারাম উপন্যাসে উড়িষ্যার শিল্পকীর্তি বর্ণনায় ভারতসংস্কৃতির শিল্পপ্রতিভার প্রশস্তি আছে। শকুন্তলা, উত্তরচরিত প্রভৃতি প্রবন্ধে সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা আছে।[২] বঙ্কিমচন্দ্র মধ্যযুগ সম্পর্কে প্রত্যক্ষত বিশেষ কিছু লেখেন নি, যদিও প্রসঙ্গত অনেকবারই তিনি এর উল্লেখ করেছেন। এখানে স্মরণীয়, তাঁর উপন্যাসগুলি অধিকাংশই মধ্যযুগীয় পটভূমিতে রচিত। খানিকটা এ যুগের মতোই ভারতসংস্কৃতি বলতে প্রাচীন ভারতবর্ষকেই তিনি বুঝেছেন। শুধু বঙ্কিমচন্দ্র কেন, সে যুগের মনস্বী ব্যক্তিদের সকলেরই ছিল এই মনোভাব। এর একটা কারণ বোধহয় এই যে, প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে মধ্যযুগের চেয়ে প্রাচীন যুগের প্রতিই ঐতিহাসিকদের ঝোঁক পড়েছিল। আর-একটি কারণ অবশ্য সদ্যোবিগত মধ্যযুগের উৎপীড়নের দুঃসহ স্মৃতি। রামমোহন থেকে আরম্ভ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর বোধহয় এমন কেউ ছিলেন না যিনি মুসলমান শাসনের চেয়ে ইংরেজ শাসনকে বরণীয়তর মনে করেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয়তার এত বড়ো উদ্গাতা হয়েও ইংরেজ রাজত্বকে চেয়েছিলেন, অনেকের কাছে এ একটা বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নেই। বঙ্কিমচন্দ্র সে যুগের পক্ষে রাজনীতিক স্বাধীনতার চেয়ে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতাকেই অধিকতর প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছেন। সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের ফলে মানুষ তৈরী হলে রাজনৈতিক অধিকার লাভের যোগ্যতা অনায়াসেই আসবে। রবীন্দ্রনাথও আত্মিক শক্তির বিকাশকে সর্বোপরি স্থান দিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র

মনুষ্যত্বকে অনুশীলন বা সংস্কৃতির দ্বারাই লভ্য ভেবেছিলেন, এবং তাঁর মতে এর দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষের ঐতিহ্যেই আছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবর্ষের ঐতিহ্য বিচার করতে গিয়ে তাঁর যুগের প্রয়োজনটাকেই বড়ো করে দেখেছেন। তাঁর পক্ষে এটা শুধু গবেষণার আনন্দই ছিল না। ভারতীয় সংস্কৃতির মহৎ ঐশ্বর্যের সন্ধানে স্বভাবতই তিনি অধ্যাত্ম-সাধনার ধ্যানের দিকটা বাদ দিয়ে কর্ম এবং কীর্তির দিকটাই দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সংস্কৃতির ধ্যানের সত্যটিকেই বড়ো করে দেখেছিলেন। তাতেই নিহিত আছে বিশ্বাত্মীয়তার তত্ত্ব। তপোবনের যুগটি ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ আর-একটি যুগকে অন্তরে গ্রহণ করেছিলেন—বৌদ্ধযুগ। উপনিষদের মন্ত্রবাণী এবং বুদ্ধবাণীকে রবীন্দ্রনাথ প্রায় একই আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু এই দুই যুগের কোনটিতেই জাতি বা সমাজ-সংগঠনের ইঙ্গিত ধ্বনিত হয় নি।

বঙ্কিমচন্দ্র আকৃষ্ট হলেন আর-একটি যুগে, যখন মানুষের মহৎ মানস-সম্পদ মহৎ কর্মে প্রযুক্ত হল। বঙ্কিমের মতে সেই যুগ হচ্ছে মহাভারতের যুগ। মহাভারত থেকে তিনি কৃষ্ণচরিত্র উদ্ধার করলেন। মানবতার পূর্ণ বিকাশ যাঁকে তিনি মনে করেছিলেন, তাঁকে আমরা পাই এক প্রচণ্ড কর্মসংঘাতময় যুগে। কৃষ্ণচরিত্র ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতীক বলেই কৃষ্ণ-কল্পনার বিবর্তনেই জাতীয় মানসেরও বিবর্তন হয়েছে—'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বিস্ময়কর বিশ্লেষণের সঙ্গে সেটা দেখিয়েছেন।[১] তাঁর মতে মহাভারতে আমরা যে কর্মবীর কৃষ্ণকে পাই তিনি হচ্ছেন মানবতার পূর্ণ আদর্শ। কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থ-রচনায় তিনি নিজের মনোগত আদর্শ দ্বারা চালিত হয়েছেন—রবীন্দ্রনাথের এ সমালোচনা সত্য। বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিব আলোচনায় তাঁর সমসাময়িক সমাজের নির্দেশ খুঁজেছিলেন। কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থটিই তার প্রমাণ। কৃষ্ণচরিত্রের আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র যা আমাদের বোঝাতে চেয়েছিলেন, ধর্মতত্ত্বে তারই বিশদ ব্যাখ্যা আছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অনুশীলন-ধর্মকে বলেছেন doctrine of culture। 'আমাদিগের সমস্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তি অনুশীলন ও পরিচালনাই ধর্ম, ও তাহার অভাবই অধর্ম।'[২] কৃষ্ণের মধ্যে তিনি এই ধর্মের পূর্ণতাকে দেখতে পেয়েছেন।[৩]

বঙ্কিমচন্দ্র বাস্তব-জীবনকে পরম মর্যাদা দিয়েছেন, তাই দেহপ্রকৃতিকেও তুচ্ছ করেন নি। বাস্তব-জীবনের প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের ভাবনাটা বঙ্কিম-সাহিত্যের একটি ঋজু

১ বঙ্কিম-গ্রন্থাবলী, বিবিধ, পরিষৎ সংস্করণ. পৃ ৩৭৫

২ ধর্মতত্ত্ব, প্রথম অধ্যায়

৩ কৃষ্ণচরিত্র, প্রথম বারের বিজ্ঞাপন

ও কঠিন জিজ্ঞাসা। মানুষকে বাঁচতে হলে তার দেহের পরিপুষ্টি চাই, দেহের পুষ্টির জন্য সমাজ চাই, সমাজের জন্য স্বদেশ চাই। প্রত্যেকটি স্তরের সমঞ্জসীভূত সাধনার নামই অনুশীলন-ধর্ম। অনুশীলন বলতে কর্মপ্রচেষ্টাকেই বোঝায়। কর্মশক্তির চর্চা না হলে অনুশীলন হয় না। সুতরাং বঙ্কিমের মতে জীবনের কর্মময় বিকাশেই সংস্কৃতির বিকাশ। এইজন্যই বঙ্কিম ভারত-ইতিহাসের উপনিষদের যুগকে বরণ না করে বরণ করেছিলেন মহাভারত-পুরাণের যুগকেই। প্রাচীন ভারতের নির্জন ব্যক্তিকেন্দ্রিক সত্যসাক্ষাৎকার মহাভারতের মুখর জীবনে প্রকাশমান হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালীর জীবনের গঠনপর্বে স্বভাবতই সেই পৌরাণিক যুগের সাধনারই শরণ নিয়েছিলেন।

প্রশ্ন এই যে, বঙ্কিম যে অনুশীলন-ধর্মের কথা বলে গিয়েছেন, তাকে ভারতবর্ষের সভ্যতারই শ্রেষ্ঠ সম্পদরূপে গ্রহণ করা যায় কি? নবমানবধর্ম প্রচারে বঙ্কিম বরং পাশ্চাত্য দার্শনিক কোমতের কাছেই ঋণী—এ কথাই সকলে জানেন। কোমতের মতবাদ উনবিংশ শতকের বাঙালী চিন্তাকে বিশেষ প্রভাবিত করেছিল, সন্দেহ নেই। বঙ্কিমকেও করেছিল, কিন্তু বঙ্কিম ভারতীয় ঐতিহ্যের সমর্থন না পেলে কোমতকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করতেন কি না সন্দেহ। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'হিন্দুধর্মের কোন অংশের সঙ্গে যদি কোমত মতের কোথাও কোন সাদৃশ্য ঘটিয়া থাকে, তবে যবনস্পর্শযোগ ঘটিয়াছে বলিয়া হিন্দুধর্মের সেটুকু ফেলিয়া দিতে হইবে কি?' অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের এই ব্যাখ্যা যে অভ্রান্ত, এ-কথা বলা যায় না। তিনি হিন্দু সংস্কৃতির যে বিশ্লেষণ করে একটি উদার মানবধর্মে পৌঁছেছেন, সেটা অনেকটাই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির ফল। বঙ্কিমচন্দ্র তা জানতেন। এই সংস্কৃতির যে যুগোপযোগী রূপ আছে, এই সত্যটিই বঙ্কিমের গর্বের বিষয়। পাশ্চাত্য দেশ থেকে স্পষ্টতই মানবসংস্কৃতির সম্পদকে স্বীকার করে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতিকে পূর্ণ রূপ দিতে চেয়েছেন। বৈদান্তিক ধর্মের সর্বব্যাপী শক্তিই আধুনিক জ্ঞান ও শিক্ষার পথে বাধা ঘটায় নি। আনন্দমঠের উপসংহারে তিনি বলেছেন, 'অন্তর্বিষয়ক যে জ্ঞান, সে-ই সনাতন ধর্মের প্রধান ভাগ। কিন্তু বহির্বিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই।...অতএব ভিন্ন দেশ হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান আনিতে হইবে।'

বঙ্কিম ভারতীয় সংস্কৃতির সেই তত্ত্বটিকেই জানতে চেয়েছিলেন, যা জীবন্ত, যা নতুন করে বিকাশ পায়, আধুনিক য়ুরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলতে যার বাধা ঘটে না। তিনি বলেছেন, 'হিন্দুধর্মের সেই মর্মভাগ অমর; চিরদিন চলিবে, মনুষ্যের হিত সাধন করিবে; কেননা, মানবপ্রকৃতিতেই তাহার ভিত্তি। তবে বিশেষ

বিধি সকল, সকল ধর্মেই সময়োচিত হয়। তাহা কালভেদে পরিহার্য বা পরিবর্তনীয়।'[১] হেস্টির সঙ্গে বঙ্কিমের যে বাদানুবাদ হয়েছিল, তার উপসংহারেও তিনি অনুরূপ উক্তি করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে ভারতসংস্কৃতি হচ্ছে গতিশীল এবং যুগোপযোগী। এই সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই যে, তিনি সেকালের পাশ্চাত্য জীবনের প্রবল প্রতিঘাতে সংস্কৃতির যে সর্বংসহ রূপটির ব্যাখ্যা করলেন, মধ্যযুগের ইসলাম সংস্কৃতির কষ্টিপাথরে তার যাচাই করেন নি। বঙ্কিম কোনো নতুন ধর্মপ্রচার করতে চান নি, এটাও মনে রাখা দরকার। তিনি যে সমাজে মানুষ হয়েছিলেন, সেই সমাজের ভূমিতে দাঁড়িয়েই তিনি সংস্কৃতির চিন্তা করেছিলেন। এইজন্য তাঁর আদর্শে হিন্দুত্বের বিশিষ্ট বর্ণটি লুপ্ত হয় নি। কিন্তু হিন্দুসংস্কৃতির একটি উদার মানবিক রূপই তাঁর কল্পনার বিষয় ছিল। ইসলাম ধর্মের সঙ্গে যদি তাঁকে সংস্কৃতির পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হতে হত, তিনি তার মত রক্ষা করতে পারতেন বলেই মনে হয়। কারণ বঙ্কিমের মতে 'মানবপ্রকৃতি'তেই এই সংস্কৃতির ভিত্তি। বিশেষত ইসলাম সংস্কৃতিতেও ইহলৌকিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রাধান্যও বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমতের অনুকূল হত। ষোড়শ শতাব্দীর চৈতন্যধর্মে প্রাচীন ভারতীয় অধ্যাত্মদৃষ্টির সঙ্গে নবলব্ধ ইসলামিক সংস্কৃতির বাস্তবপরায়ণতার মিলন ঘটেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এই দৃষ্টান্তটির উল্লেখ করেন নি। কিন্তু তাঁর ধর্মতত্ত্বের একটি অনুক্ত দৃষ্টান্তরূপে এই তথ্যটিকে গ্রহণ করা যেতে পারে। এই ঘটনাটি ঐতিহাসিক ; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ হয়তো এতেও তৃপ্ত হত না। কারণ চৈতন্যধর্মের ভক্তিভাবের আতিশয্য তিনি চাইতেন না ; তিনি চাইতেন সবগুলি বৃত্তিরই সমঞ্জসীভূত রূপ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের কৃষ্ণ নয়, মহাভারতের কৃষ্ণই ছিলেন তাঁর আদর্শ।

সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র যে তাঁর ঐতিহ্যের মধ্যে থেকেই উদার সংস্কৃতির কল্পনা করেছিলেন তা অস্বীকার করা যায় না। বিশেষকে অক্ষুণ্ন রেখেই নির্বিশেষ মানবতার কল্পনা করেছিলেন। এ সম্পর্কে তাঁর মত সম্ভবত এই যে, হিন্দুধর্মের মধ্যে যদি সত্য থেকে থাকে তবে সে সত্য অন্যকে তিরস্কৃত করে নয়, অন্যকে শ্রদ্ধায় স্বীকার করে নিয়েই সে সত্য। সেইখানেই ভারতীয় সংস্কৃতির ঔদার্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব। এই উদার রূপ কল্পনা করতে গিয়ে অনেক অনাবশ্যককেই তিনি পরিহার করেছেন। আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে সমন্বিত করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র এ যুগের যা অপরিহার্য তারই সূত্র সন্ধান করেছেন প্রাচীন ভারতবর্ষের জীবনসাধনায়। এইজন্যই ব্যক্তিতান্ত্রিক অধ্যাত্মসাধনায় তিনি প্রবেশ করতে চান নি। সন্ন্যাসবাদ তাঁর মতে গ্রহণযোগ্য নয় ; আবার ভোগলিপ্ত স্বার্থপর জীবনকেও তিনি ধিক্কার দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই মধ্যম পন্থাটি বিশিষ্টরূপে

১ ধর্মতত্ত্ব, পঞ্চম অধ্যায়

তাঁরই উপলব্ধি, এ কথাও যথার্থ নয়। বস্তুত ত্যাগ ও ভোগের সামঞ্জস্য-তত্ত্বই উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের মর্মবাণী। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর ধর্মের আদর্শে এরই সূচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ পিতৃদত্ত সাধনার রিক্‌থ গ্রহণ করেছিলেন; তাঁর কাব্যসাধনা ও জীবনসাধনা এই প্রেরণারই আলোকে আলোকিত। 'ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে'—রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে এই ছিল ভারতসংস্কৃতির অন্তরের কথা। এখানে মনীষী বিপিনচন্দ্র পালের একটি কথা উদ্ধৃতিযোগ্য[১]—

'বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্মের নূতন ব্যাখ্যা দ্বারা হিন্দুধর্ম এবং ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে একটা সমন্বয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। তাঁহার অনুশীলন-ধর্ম ব্রাহ্মধর্মেরই নামান্তর মাত্র।'

কথাটা শোনায় বিচিত্র, কিন্তু ভিত্তিহীন নয়। নতুন জ্ঞান ও শিক্ষার প্রভাবে সেকালের মনীষীদের চিত্তক্ষেত্রে বিচিত্র ভাবের ফসল ফলেছিল; তারা যে একই ঋতুর ফসল এটা যেন ভুলে না যাই। নব্যবঙ্গের যুবকরা আর কিছু না মানলেও সত্যকে মানতেন—Indeed, the college boy was a synonym for truth.[২] হিন্দু কলেজের ছাত্রদের এই সত্য ছিল নৈতিক। দেবেন্দ্রনাথ যে-সত্যকে আরাধ্য করেছিলেন, সে-সত্য আধ্যাত্মিক, ব্যক্তির উপলব্ধিগম্য ধ্যানের সত্য। এই জীবনকে আচ্ছন্ন করলেও এর নির্বিশেষ ভাবস্থির মহিমা জীবনের ঊর্ধ্বে। রবীন্দ্রনাথ সত্যকে রসরূপেও অনুভব করলেন। মহর্ষির কবি-মন রবীন্দ্রনাথেও সঞ্চারিত হয়েছে। তাই তাঁর সৌন্দর্যলক্ষ্মী সত্যস্বরূপিণী। বঙ্কিমচন্দ্র নির্বিশেষ সত্যের বিশদ আলোচনা করেন নি। কিন্তু তিনি বলেছেন,[৩] 'সত্য ভিন্ন অসত্যে কখনও মঙ্গল নাই। সত্যই ধর্ম, সত্যই শুভ, সত্যই বাঞ্ছনীয়, সত্যমেব জয়তি।' তথাপি এ কথা ঠিক, সত্যকে নিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির গৌরব, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাখ্যায় সত্যের কোনো নির্বিশেষ রূপ নেই।[৪] দেশে কালে তার রূপ বিচিত্র। ভারতীয় সংস্কৃতির বিবর্তনেই সত্যকে বহুরূপে প্রকাশমান দেখতে পাই। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে এই প্রাণবত্তাই এর গৌরব। এই পরিবর্তনশীল সত্যসাধনায় মানুষ যতই উপযোগী হয়ে উঠবে, ততই হবে মানবতার চরিতার্থতা এবং সেটাই বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন-ধর্ম।

১ বিপিনচন্দ্র পাল, 'নবযুগের বাংলা', গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৩৬২, পৃ ১৮৫

২ Thomas Edwards, *Derosio*, 1884, pp. 67-68

৩ বঙ্কিম-গ্রন্থাবলী, বিবিধ, পরিষৎ-সংস্করণ, পৃ ৩৬৫

৪ 'বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

বঙ্কিমচন্দ্র ও বাংলার ইতিহাস

গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং

—কৃষ্ণমিশ্র

বাংলা দেশের ইতিহাস যিনি রচনা করতে যাবেন, বঙ্কিমচন্দ্রের নাম তিনি শ্রদ্ধা-নম্রচিত্তে স্মরণ করবেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে বাংলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করেন নি বটে, কিন্তু বাংলার অতীত সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহলের সীমা ছিল না। এ-কৌতূহল বৈজ্ঞানিকের নিস্পৃহ অনুসন্ধিৎসা থেকেই জাগে নি, এর মূলে ছিল দেশপ্রেমিকের নিবিড় অনুরাগ। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার প্রাণচেতনা দেশের অতীতকে অবলম্বন করে প্রকাশ পেয়েছিল, বঙ্কিমচন্দ্র সেই চেতনাকে সাহিত্যিক কল্পনায় ভাষা দিলেন। তাঁর একখানি ছাড়া সবগুলি উপন্যাসই বাংলার অতীত অথবা সমসাময়িক সমাজের ভূমিকায় রচিত। বাংলার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবশত তিনি 'বঙ্গদর্শন' নাম দিয়ে মাসিক পত্র প্রকাশ করলেন। তাকে ঘিরে সৃষ্টি হল বাংলার ইতিহাস সমাজ সংস্কৃতি প্রভৃতি আলোচনার আবর্ত। বাংলাদেশকে জননী কল্পনা করে মাতৃমন্ত্র উচ্চারণ করলেন আনন্দ-মঠে আর মাতৃস্নেহের অসহ্য উন্মাদনা বেদনাময় হয়ে উঠেছে কমলাকান্তের অস্থিরতায় আর তার স্বপ্নদর্শনে।

কবে কেমন করে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে বঙ্গপ্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল, সে ইতিহাস আমাদের অজ্ঞাত। বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো সুলিখিত সম্পূর্ণ জীবনী নেই। তাঁর শিক্ষাকালের সব কাহিনীও আমাদের জানা নেই। বাংলা দেশের ইতিহাস না হলেও সাধারণভাবে ঐতিহাসিক চেতনা বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকালেই নবপ্রবুদ্ধ বাঙালীর মনে দেখা দিয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। ইতিহাস-চেতনা জাগ্রত মনের পরিচয়। বাঙালী যে মানবসমাজ এবং মানবজাতি সম্পর্কে ঔৎসুক্য প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে, এটা আধুনিক মনের একটি পরম কল্যাণকর লক্ষণ। বঙ্কিমচন্দ্র যখন শিশু, তখন ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে স্থাপিত হয়েছিল সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা। এই সভার সভ্য ছিলেন হিন্দু কলেজের একদল তরুণ ছাত্র যাঁদের বলা হত 'ইয়ং বেঙ্গল' অথবা ইয়ং ক্যালকাটা। প্রাচীন সংস্কার মোচনের চেষ্টায় এঁরা প্রথম জীবনে কিছু উচ্ছৃঙ্খলতাই করে ফেলেছিলেন ; কিন্তু এঁদের এই দিক্‌টাকেই একমাত্র না দেখে নবযুগ রচনায় এঁদের উচ্ছৃঙ্খলতার পরোক্ষ সুফলটুকুই আজ বিচার করা প্রয়োজন। সাধারণ

জ্ঞানোপার্জিকা সভাতেই সর্বপ্রথম তাঁদের সংযত চিত্তপ্রকর্ষের বিকাশ হল। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, গোবিন্দচন্দ্র সেন প্রভৃতি মনস্বী যুবকেরা এই সভায় যেসব বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা করতেন, বাংলার সমাজ এবং দৃষ্টি সে-সবের দ্বারাই অনেকটা প্রস্তুত হয়েছিল। জ্ঞানোপার্জিকা সভার কিছু কিছু প্রবন্ধ নির্বাচিত হয়ে সংকলিত হয়েছিল। জনৈক পাঠক এইরূপ একটি প্রবন্ধসংগ্রহের সমালোচনা-প্রসঙ্গে ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া পত্রে[১] দুটি প্রবন্ধের বিশেষ উল্লেখ করেছিলেন—কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত On the Nature and Importance of the Study of History, অপরটি প্যারীচাঁদ মিত্র-রচিত The States of Hindoostan under the Hindoos. এই গ্রন্থটি সম্পর্কে পত্রিকা-সম্পাদকের মন্তব্যও প্রণিধানযোগ্য[২]—

The greater number of these Essays are either historical or topographical. There is one besides on general knowledge, another on the cultivation of the vernacular language of Bengal, one on Poetry, one on the condition of Hindu women and the last of the volume is on civil and social Reform among the Educated Hindoos. The mere mention of these topics will show the practical character of the Society's discussions and not less their patriotic and human aspirations.

এর থেকে বুঝতে পারা যায় নব্যশিক্ষিতদের মধ্যে ঐতিহাসিক চেতনা কীভাবে প্রস্তুত হয়ে উঠছিল। এদের ভিতর থেকেই জেগে উঠছে নতুন জীবনের আভাস। দেশ এবং জাতির সম্পর্কেও গঠনমূলক চিন্তা দেখা দিতে শুরু করেছে। বলা যেতে পারে, নবাগত জর্জ টমসনও তরুণ বঙ্গকে দেশের বর্তমান এবং অতীত পর্যালোচনায় অনুপ্রাণিত করেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর বাংলার ইতিহাসে[৩] লিখেছেন, চারটি বিষয়ে টমসন তাঁদের অনুপ্রেরণা দেন। প্রথমত সকলের একবাক্যে দেশের মঙ্গল সাধনে যত্নবান হওয়া; দ্বিতীয়ত স্বদেশের প্রাচীন ইতিবৃত্ত এবং বর্তমান অবস্থা উত্তমরূপে জানা; তৃতীয়ত গবর্নমেণ্টের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ; চতুর্থত ইংরেজের ন্যায়পরায়ণতায় বিশ্বাস রেখে স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্য প্রস্তুত হওয়া। স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে দেশের জাগ্রত বিচারবুদ্ধিকে বৈনাশিক কার্য থেকে

১ *The Friend of India*, November 5, 1840.

২ *The Friend of India*, December 3, 1840.

৩ 'বাংলার ইতিহাস' তৃতীয় ভাগ, গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৯০৩, দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রতিনিবৃত্ত করে কল্যাণকর সংগঠনকর্মে নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন টমসন। টমসনের শিক্ষার সুফল ফলেছিল। ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত প্যারীচাঁদের The Zeminder and the Ryot প্রবন্ধটি টমসনের অভিপ্রায়কে চরিতার্থ করেছিল। এতে ছিল দেশের প্রাচীন ও বর্তমান অবস্থার তথ্যানুসন্ধান এবং দেশের মঙ্গলসাধনে স্বাধীন বিচারণা। বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদেশের কৃষক এবং রমেশচন্দ্র দত্তের The Peasantry of Bengal পরবর্তী কালে এই আদর্শকেই অনুসরণ করেছিল।

দেশের শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে এই ভাবেই ইতিহাসচর্চার উৎসাহ দেখা দিচ্ছে। বঙ্কিমচন্দ্র তখন বালক। ১৮৫৩-র পূর্বে একমাত্র সংবাদপ্রভাকরের মাধ্যম ছাড়া কলকাতার বিদ্বৎসমাজের সঙ্গে তাঁর বিশেষ যোগ ছিল না। তবে জানা যায়, বাল্যকাল থেকেই ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরাগ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। অপেক্ষাকৃত প্রাপ্ত বয়সে উপনীত হয়ে তিনি সেকালের শিক্ষিত জনসমাজের ইতিহাসচর্চার পরিচয় পেয়েছিলেন বলে অনুমান করা যেতে পারে। কিন্তু বিশেষ করে বাংলা দেশের সম্পর্কে তাঁর আগ্রহের কোনো সূচনাই আমাদের জানা নেই। বরং লক্ষ্য করা যায় যে রামমোহন রায় বাঙালীর যে মনোভঙ্গি জাগাতে চেয়েছিলেন, তা ছিল ভারতমুখী। প্রাচীন শাস্ত্র ইত্যাদির অনুবাদ দ্বারা তিনি প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির নবরূপায়ণে ব্রতী হয়েছিলেন এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাও প্রধানত সেই নির্দেশকেই অনুসরণ করেছিল। ১৮৩৫ সালে এদেশে নবশিক্ষার দ্বিতীয় পর্ব থেকে বাংলার ইতিহাস বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীতে পাঠ্য হতে থাকে।[১] দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী পাঠশালাতেও সর্বোচ্চ দুই শ্রেণীতে পাঠ্য ছিল History of Bengal—সম্ভবত মার্শম্যানের। এই শিক্ষানীতির জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে জুনিয়র সেকশনে বঙ্গেতিহাস পড়েছিলেন। বঙ্গেতিহাস বিশেষ কোনো বইয়ের নাম না-ও হতে পারে। সেকালে এডুকেশন কাউন্সিলের শিক্ষানীতিতে বাংলার ইতিহাস পাঠ নিম্নশ্রেণীতেই সমাপ্ত হত। সুতরাং সমগ্রভাবে ভারতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষভাবে ঔৎসুক্য প্রকাশ না করে শুধু বাংলাদেশের ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্র কেন আগ্রহী হয়ে উঠলেন তার বিশেষ কারণ খুঁজে পাওয়া শক্ত। বঙ্কিমচন্দ্র যখন প্রথম বাংলায় উপন্যাস লিখলেন, তখনই দেখতে পাই বাংলার অতীত তরুণ বঙ্কিমকে আচ্ছন্ন করেছে। আশ্চর্যের বিষয়, তখনও পর্যন্ত বাংলার এমন ইতিহাস প্রকাশিত হয় নি যা বঙ্কিমের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে থাকতে পারে। পরবর্তী কালে যখন তিনি বাংলার ইতিহাস নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করছিলেন, তখনও তিনি স্টুয়ার্ট এবং মার্শম্যানের বাংলার ইতিহাসের

১ প্রবোধচন্দ্র সেন, 'বাংলার ইতিহাস-সাধনা', ১৩৬০, পৃ ১৬১

প্রশংসা করতে পারেন নি। সুতরাং এই ইতিহাস দুটি থেকে তিনি বাংলা দেশের গৌরব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, মনে হয় না। জুনিয়র সেকশনে তিনি যে বঙ্গেতিহাস পড়েছিলেন, সেটা কার রচনা জানা যায় না। ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে মার্শম্যানের বইয়ের তিনখানি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। এদের মধ্যে ওয়েঙ্গার এবং গোবিন্দচন্দ্র সেনের বই মার্শম্যানকে সমগ্রভাবে অনুসরণ করেছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাঙ্গালার ইতিহাস দ্বিতীয় ভাগ, মার্শম্যানের বইয়ের শেষাংশের অনুবাদ। মনে রাখা দরকার স্টুয়ার্টের বইতে (১৮১৩) তুর্কি-বিজয়ের পূর্বের বাংলা দেশের ইতিহাস দেওয়া হয় নি; মার্শম্যানের বইতেও (১৮৩৯) সেই ইতিহাস একটি মাত্র পরিচ্ছেদে দেওয়া হয়েছে। বাল্যকাল থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের মনে যদি বাংলার হিন্দু রাজাদের সম্বন্ধে কোনো কৌতূহল জেগে থাকে, তবে তার সূচনা ঘটিয়েছিল, এমন কোনো বইয়ের সংবাদ আমাদের জানা নেই, একমাত্র গোবিন্দচন্দ্র সেনের অনুবাদে মার্শম্যানের বই ছাড়া। অথচ পরবর্তী কালে বঙ্কিমচন্দ্র মার্শম্যানের বই সম্বন্ধে অকরুণ মন্তব্য তো করেছিলেনই, গোবিন্দচন্দ্র সেনের বইয়ের নামও তিনি কোথাও করেন নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদেশপ্রীতির মূলে নির্দিষ্ট কোন গ্রন্থের অনুপ্রেরণা না থাকলেও তাঁর এ বিষয়ে অনুকূল মনোভাব গড়ে উঠবার পক্ষে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদপ্রভাকরের প্রভাব অনুমান করা অসংগত হবে না। লক্ষ্য করা যেতে পারে সেকালে সুপ্রচারিত সমাচার-দর্পণ পত্রিকাকে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কবিতা প্রকাশের আশ্রয়রূপে গ্রহণ না করে সংবাদ-প্রভাকরকেই বরণ করেছিলেন। সমাচারদর্পণ ছিল মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত ও সম্পাদিত। এই পত্রিকা দেশীয় রুচির বিরোধী বলে ঈশ্বর গুপ্ত একে বহুবার সমালোচনা করেছিলেন। সংবাদপ্রভাকর সে যুগে বাংলা দেশ ও সমাজ সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট মনো-ভাব অবলম্বন করে দেশপ্রীতির আয়োজন সম্পূর্ণ করে তুলেছিল; সে যুগে এটা ঠিক সুলভ ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে কবির খাঁটি বাঙালী মানসিকতার যে বিশদ আলোচনা করেছিলেন, এ-প্রসঙ্গে তাও স্মরণীয়। এ কথা ঠিক, ঈশ্বর গুপ্ত বঙ্গপ্রীতিতে অনুপ্রাণিত থাকলেও সমগ্র ভারতবর্ষ সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন না। সংবাদপ্রভাকরের সংবাদগুলি পর্যালোচনা করলে এ কথা বুঝতে পারা যায়। 'জননী ভারতভূমি' নামে যে কবিতাটি তাঁর কাব্যগ্রন্থভুক্ত হয়েছে, সেটি আসলে স্বদেশসেবা বিষয়ক একটি বক্তৃতার উপলক্ষ্যে রচিত হয়েছিল।[১] এসব সত্ত্বেও ঈশ্বর

১ সংবাদপ্রভাকর, ১লা বৈশাখ, ১২৫৫। গোবিন্দচন্দ্র সেনের সভাপতিত্বে "স্বকীয় স্বজন বান্ধব পাঠকবর্গকে এবং নগরীর সংবাদপত্র সম্পাদক সকলকে এবং সংস্কৃত কলেজের উপাধ্যায় এবং অন্যান্য অধ্যাপকগণ"-এর সভায় ঈশ্বরচন্দ্র এই বক্তৃতা দেন।

গুপ্ত বিশেষভাবে বাংলা দেশ এবং সমাজের জন্যই তাঁর চিন্তা ও কল্পনাকে নিয়োজিত করেছিলেন। বাংলার অতীত নিয়ে সংবাদপ্রভাকর সে রকম ঐতিহাসিক গবেষণা করে নি, যদিও এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে কবিওয়ালাদের জীবনী সংগ্রহ করে এবং ভারতচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত রচনা করে ঈশ্বর গুপ্ত ইতিহাস-নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছিলেন। নির্দিষ্ট কোন রাজনৈতিক আদর্শবাদিতার সঞ্চার না করলেও সংবাদপ্রভাকরের পৃষ্ঠায় বাঙালী জাতীয় জীবন এবং সমাজ সম্পর্কে যে মমত্ববোধ ফুটে উঠেছিল, তরুণ বঙ্গের কঠোর নিস্পৃহ যুক্তিবাদিতার পর সাধারণ পাঠককে স্বভাবতই তার আন্তরিকতাটুকু স্পর্শ করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র এবং অন্যান্য যাঁরা সংবাদপ্রভাকরের লেখকশ্রেণীভুক্ত ছিলেন, তাঁরা সকলেই একটি সাধারণ বাঙালী মনোভাবে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার সভ্যদের তুলনায় এঁদের এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যগোচর হওয়া স্বাভাবিক। ঈশ্বর গুপ্ত ঠিক চিন্তাশীল মনীষী ছিলেন না বলেই বাংলা দেশ সম্পর্কে তাঁর মমত্বকে ঠিক ঐতিহাসিক যুক্তিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। এই অপূর্ণতাটি বঙ্কিমচন্দ্রের মনীষায় পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছিল।

বিবিধপ্রবন্ধ, দ্বিতীয় ভাগের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, 'এক সময়ে ইচ্ছা করিয়াছিলাম বাঙ্গালার ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া একখানি বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিব। অবসরের অভাবে এবং অন্যের সাহায্যের অভাবে সে অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। অন্যকে প্রবৃত্ত করিবার জন্য বঙ্গদর্শনে বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। বঙ্গদর্শনের দ্বারা সর্বাঙ্গসম্পন্ন সাহিত্যসৃষ্টির চেষ্টায় সচরাচর আমি এই প্রথা অবলম্বন করিতাম।' বঙ্কিমচন্দ্রের উল্লিখিত প্রবন্ধগুলি মিলিয়ে বাংলা দেশের ইতিহাস সম্পূর্ণ হয় না, কিন্তু এরই ভিতর থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের ধ্যানের বাংলাকে মোটামুটি বুঝতে পারা যায়। তিনি বাংলার যে অতীতকে দেখেছেন সে অতীত কীর্তিতে উজ্জ্বল, প্রাণের আবেগে স্পন্দিত। এ দেখা শুধু প্রত্নতাত্ত্বিকের তথ্যসংগ্রহে মাত্র পর্যবসিত করতে তিনি চান নি, যদিও তাকে তিনি ইতিহাস উদ্ধারে প্রাথমিক প্রয়োজন বলেই মনে করেছেন। তাঁর মতে 'কোন দেশের ইতিহাস লিখিতে গেলে সেই দেশের ইতিহাসের প্রকৃত যে ধ্যান, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা চাই।'[১] এই 'ধ্যান' কথাটি দিয়ে তিনি বাংলা দেশের একটি জীবন্ত সমগ্র মূর্তিকল্পনাকেই বুঝতে চেয়েছিলেন। পূর্ণাঙ্গ কল্পনার অভাবে ইতিহাস অনেক সময়েই প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় মাত্র পরিণত হয়—পূর্ণ রূপ নিয়ে চোখের সম্মুখে সজীব

১ 'বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ'

হয়ে ওঠে না। তবে এটাও ঠিক যে উপাদান সংগৃহীত না হলে মূর্তি-কল্পনা সম্ভব হয় না। বঙ্কিমের সময় পর্যন্ত বাংলার ইতিহাসের উপাদান-সংগ্রহ সম্পূর্ণ হয় নি এবং এক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রথম শিক্ষা বাংলার ইতিহাস' (১৮৭৪) ছাড়া আর কোন বই তাঁকে তৃপ্ত করে নি। তার কারণ আর কোন লেখকই বাংলা দেশের মূর্তিকে ধ্যানে জাগ্রত করতে পারেন নি। স্টুয়ার্ট, মার্শম্যান, লেথব্রীজ—কেউই বাঙালী ছিলেন না। গোবিন্দচন্দ্র সেন এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্বাধীনভাবে ইতিহাস রচনা করেন নি। বঙ্গভূমির ইতিহাসকে যিনি অনুরাগের সঙ্গে সশ্রদ্ধচিত্তে বুঝতে চাইবেন, এমন ঐতিহাসিকের সাক্ষাৎ তিনি তখনও পান নি। এ বিষয়ে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের উপর বঙ্কিমচন্দ্রের আস্থা ছিল। পুরাবৃত্ত আলোচনায় রাজেন্দ্রলালকে বঙ্কিমচন্দ্র প্রামাণিক ধরেছেন ; কিন্তু আক্ষেপ করে তিনি বলেছেন,[১] 'বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মনে করিলে স্বদেশের পুরাবৃত্তের উদ্ধার করিতে পারিতেন কিন্তু এক্ষণে তিনি যে এ পরিশ্রম স্বীকার করিবেন, আমরা এত ভরসা করিতে পারি না।' রমেশচন্দ্র দত্তের বাংলার ইতিহাস (১৮৯২) তখনও প্রকাশিত হয় নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পিত বাংলার ইতিহাসে রাজনৈতিক কাঠামো পুরোপুরি রক্ষিত হলেও লোকবৃত্তও তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল। বঙ্গদেশের কৃষক প্রবন্ধটিতে কৃষকসমাজের অতীত অবস্থা ঐতিহাসিক নিষ্ঠার সঙ্গে পর্যালোচিত হয়েছে। বস্তুত বাংলা দেশের ইতিহাস রচনায় বঙ্কিম তিন দিক দিয়েই অনুসন্ধানের সূচনা করেছিলেন—নৃতত্ত্ব, রাজবৃত্ত এবং লোকবৃত্ত। প্রথম শ্রেণীতে বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার (বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১২৮০, অগ্রহায়ণ ১২৮২) এবং বাঙ্গালির উৎপত্তি (বঙ্গদর্শন, পৌষ ১২৮৭, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮) ; দ্বিতীয় শ্রেণীতে বাঙ্গালার ইতিহাস (বঙ্গদর্শন, মাঘ ১২৮১), বাঙ্গালার কলঙ্ক (প্রচার, শ্রাবণ ১২৯১), বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ (বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯) ; তৃতীয় শ্রেণীতে, বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা (বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ ১২৮৭), বঙ্গদেশের কৃষক (বঙ্গদর্শন, ভাদ্র, কার্তিক, পৌষ, ফাল্গুন ১২৭৯)। সর্বশেষে উল্লিখিত রচনাটিকে ঠিক ঐতিহাসিক প্রবন্ধ বলা না গেলেও এতে প্রখর ইতিহাসনিষ্ঠার পরিচয় আছে। এই রচনাটি আসলে সর্বপ্রথমে লিখিত হয়েছিল। এই কয়টি প্রবন্ধ ছাড়াও আরও কয়েকটি প্রবন্ধ আছে, যেগুলি ঠিক ইতিহাস-বিষয়ক নয় বটে, কিন্তু দেশপ্রীতির প্রত্যক্ষ প্রেরণায় সেগুলি অনুপ্রাণিত। বাঙ্গালির বাহুবল (বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১২৮১), বাহুবল ও বাক্যবল (বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ও ভাদ্র ১২৮৪) প্রবন্ধ দুটির নাম করা যেতে পারে।

লোকবৃত্তকে জানবার জন্যই তিনি আধুনিক বাঙালী জাতির উৎপত্তির ইতিহাস

১ 'বাঙ্গালার ইতিহাস'

সন্ধান করেছেন। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ—এই প্রধান তিনটি সামাজিক বিভাগ ছাড়াও বাংলা দেশে বহু জাতি রয়েছে, বাঙালীর গোষ্ঠীনির্ণয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাদের সকলকেই স্মরণ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধান যথাযথ হয় নি। ১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দে এশিয়াটিক রিসার্চেস পত্রিকায় প্রকাশিত কোলব্রুক সাহেবের Enumeration of Indian Classes প্রবন্ধটির পর মোটামুটি তাঁরই বিশ্লেষণ-পদ্ধতি সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীতে অনুসৃত হয়েছে। এই পদ্ধতিতে বিশেষ করে আশ্রয় করা হয়েছে পুরাণ তন্ত্র মনু প্রভৃতির সাক্ষ্য। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত Hindu Caste প্রবন্ধটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।[১] বাঙালীর সমাজবিন্যাস সম্পর্কে একটা ধারণা এতে জন্মালেও ইতিহাসনির্ণয়ে এই পদ্ধতিকে নির্দোষ বলা চলে না। লালমোহন বিদ্যানিধির 'সম্বন্ধনির্ণয়' নামক গ্রন্থটিও এই কারণেই ইতিহাস হিসাবে সম্পূর্ণ নির্ভর-যোগ্য নয়। ঐতিহাসিক রমাপ্রসাদ চন্দের মতে 'বঙ্কিমচন্দ্রই বাঙ্গালায় বাঙ্গালা ভাষায় জাতিতত্ত্বের আলোচনারও গুরু, কেননা তাঁহার প্রথম প্রস্তাব লালমোহন বিদ্যানিধির "সম্বন্ধনির্ণয়" গ্রন্থের পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল।' বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার' দ্বিতীয় প্রস্তাব এই গ্রন্থখানি অবলম্বন করে রচিত হয়েছিল। তবে 'বঙ্কিমচন্দ্রের পরে এ দেশে জাতিতত্ত্ব আলোচনার নূতন রীতি অবলম্বিত হইয়াছে। রিজলি সাহেব ভাষা ছাড়িয়া মস্তকের নাসিকার এবং দেহের দৈর্ঘ্যের পরিমাণের ভেদানুসারে জাতিবিভাগ করিয়াছেন।'[২] উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী সাহিত্যিকদের মধ্যে যে আর্য-গৌরববোধ দেখা দিয়েছিল আজ দেখা যাচ্ছে ইতিহাসের সাক্ষ্য তার অনুকূল নয়। তবে বঙ্কিম-চন্দ্রের সিদ্ধান্ত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য এইজন্য যে তাঁর মধ্যে যেমন আর্য-গৌরববোধ ছিল, তেমনি আর একদিকে ছিল সমগ্রভাবে বাঙালী সম্পর্কে পূর্ণ সচেতনতা। বঙ্কিম-চন্দ্র দেখেছেন[৩], খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে বাংলা দেশে আর্য ছিল না। একাদশ শতাব্দীতেও আর্য ব্রাহ্মণ এদেশে ছিল বিরল। এতে আমাদের প্রাচীনত্বের কিছু হানি হলেও—

'আমরা সেই প্রাচীন আর্যজাতি সম্ভূতই রহিলাম—বাঙ্গালায় যখন আসি না কেন, আমাদের পূর্বপুরুষগণ সেই গৌরবান্বিত আর্য। বরং গৌরবের বৃদ্ধিই হইল। আর্যগণ বাঙ্গালায় তাদৃশ কিছু মহৎ কীর্তি রাখিয়া যান নাই—আর্যকীর্তিভূমি উত্তর পশ্চিমাঞ্চল। এখন দেখা দেখা যাইতেছে যে আমরা সে কীর্তি ও যশেরও উত্তরাধিকারী।

১ *Calcutta Review*, January-June, 1851.

২ 'মানসী ও মর্মবাণী' আষাঢ় ১৩৩১, রমাপ্রসাদ চন্দ 'বঙ্কিমচন্দ্র ও বাঙ্গালার ইতিহাস' পৃ ৪৬৫

৩ 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার'

'আমাদের আর একটি কলঙ্কের লাঘব হইতেছে। বল্লালের দেড় শত বৎসর পরে মুসলমানগণ বঙ্গজয় করেন। তখন বঙ্গীয় আর্যগণের সংখ্যা অধিক সহস্র নহে, ইহা অনুমেয়। তখনও তাঁহারা এ দেশে ঔপনিবেশিক মাত্র। সুতরাং সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গজয়ের যে কলঙ্ক, তাহা আর্যদিগের কিছু কমিতেছে বটে।'

বাংলার ইতিহাসের এই ব্যাখ্যাটুকু বঙ্কিমচন্দ্রের। এই ব্যাখ্যাতে ফুটে উঠেছে গভীর দেশাত্মবোধের আভাস। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার যে ইতিহাস চেয়েছিলেন, তার সঙ্গে দেশপ্রেমের ব্যগ্র ব্যাকুলতাটুকু থাকবে এটাই ছিল তাঁর প্রত্যাশা। বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক কালে বাংলা দেশে যে আর্য-গর্ববোধ সুলভ হয়েছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের এই ব্যাখ্যাটুকু তারই একটা প্রকাশ বলে ধরা যেতে পারে। যদিও এক দিকে বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে সচেতনতা দেখা দিচ্ছে, তথাপি উত্তর-ভারতীয় আর্যকেই আমাদের পূর্বপুরুষ কল্পনা করে নূতন জাতিগঠনের আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত হয়েছিল। 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার' প্রবন্ধের উপসংহারে সেই আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে।

কিন্তু সে যুগে বাংলার ইতিহাস-কল্পনায় বঙ্কিমচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। বাঙালী জাতি বলতে তিনি শুধু উচ্চ বর্ণকেই ধরেন নি, যদিও এ বিশ্বাস তাঁর ছিল যে উপরের স্তরে প্রায় কেবলই আর্য, নিম্নস্তরে রয়েছে বাঙালী অনার্য বা মিশ্রিত আর্য এবং বাঙ্গালী মুসলমান। 'এই জন্য দূর হইতে দেখিতে বাঙালী জাতি অমিশ্রিত আর্যজাতি বলিয়াই বোধ হয় এবং বাঙ্গালার ইতিহাস এক আর্যবংশীয় জাতির ইতিহাস বলিয়া লিখিত হয়।'[১] সুতরাং বাংলার ইতিহাস অর্থ যেমন শুধু রাজকাহিনী নয়, তেমনি শুধু উচ্চবর্ণের কীর্তির ইতিহাসও নয়। সামাজিক ইতিহাস রচনার প্রেরণাতেই যেমন তিনি এক দিকে 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার', 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি' এবং ইংরেজীতে Origin of Hindu Festival রচনা করেছিলেন, তেমনই 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধেও অর্থনৈতিক লোকবৃত্ত রচনা করতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু বাংলার ইতিহাস রচনায় রাজকাহিনীকে মাত্র একক প্রাধান্য দেওয়া যেমন ঠিক নয়, তেমনি রাজবৃত্তকে একেবারে বহিষ্কৃত করলেও ইতিহাস রচনায় বাধা ঘটতে পারে। আমাদের লোকজীবন রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে আপাতদৃষ্টিতে অচঞ্চল বলে

মনে হতে পারে কিন্তু সংঘাত সেখানেও এসেছে; কোনবার সাংস্কৃতিক পরিবর্তন হয়েছে প্রধান, কোনবার অর্থনৈতিক পরিবর্তন হয়েছে লক্ষণীয়। নূতন ধর্মের উদ্ভব, সাহিত্যের নূতন বিকাশ, সাধারণ জীবনযাত্রার ধারার পরিবর্তন—বাংলার ইতিহাস বিচার করলে এ সবই লক্ষ্য করা যাবে। পাল, সেন, পাঠান অথবা মোগল রাজত্বে সামাজিক জীবনের সঙ্গে অর্থনৈতিক বিবর্তন স্পষ্টতই চোখে পড়ে। সুতরাং লোকবৃত্ত ইতিহাস রচনায় প্রধান হলেও রাজবৃত্তের কাঠামোটিকে অনুসরণ না করলে চলে না। বঙ্কিমচন্দ্রের অতীত আলোচনায় বাংলার ইতিহাসের এই দিকটির সম্পর্কেও ইঙ্গিত আছে। মনে হয়, তাঁর কল্পিত বাংলার ইতিহাসে চারটি স্তরভাগের আভাস পাওয়া যায়। প্রথম, তুর্কী বিজয় পর্যন্ত; দ্বিতীয়, মোগল বিজয় পর্যন্ত; তৃতীয়, ইংরেজ বিজয় পর্যন্ত; চতুর্থ, ইংরেজ বিজয়ের পর। অবশ্য ইংরেজ বিজয়ের পর বাংলা দেশের ইতিহাস রচনা করবার সময় আসে নি। ইংরেজ রাজত্বে বাংলা এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস কি রকম দাঁড়াতে পারে, তার ইঙ্গিত অবশ্য তাঁর রচনায় আছে। এখানে উল্লেখযোগ্য, এক রাজসিংহ ছাড়া তাঁর সব উপন্যাসই বাংলা দেশের ভূমিকায় রচিত। এর মধ্যেও আবার কৌতূহলের বিষয়, ইতিহাসের প্রাধান যুগসন্ধিগুলি তাঁর কয়েকটি উপন্যাসের কালপরিবেশ রচনা করেছে। তুর্কী বিজয় নিয়ে মৃণালিনী, মোগল বিজয় নিয়ে দুর্গেশনন্দিনী, ইংরেজ বিজয় নিয়ে আনন্দমঠ। মোগল-পতনের যুগান্তর কালের উপন্যাস সীতারাম। বলা বাহুল্য, উপন্যাস রচনা ইতিহাসের ধারাবাহিক কালক্রম ধরে হয় নি। দুর্গেশনন্দিনীতে ইতিহাসকে শুধু কাহিনী হিসাবেই নেওয়া হয়েছে, তাতে লেখকের কোন অভিপ্রায় এসে যুক্ত হয় নি। মৃণালিনীতে সচেতন ইতিহাস-জিজ্ঞাসার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেশপ্রেম। পরবর্তী গ্রন্থগুলিতে বিশেষত সীতারাম এবং আনন্দমঠে ইতিহাস যেমন উজ্জ্বল, দেশপ্রেমও ততখানি গভীর ভাবেই আভাসিত।

মৃণালিনী (১৮৬৯) রচনাকালেই বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাধীন ইতিহাস-সন্ধানী মন জেগে উঠেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় লক্ষ্মণ সেনের রাজসভা বর্ণনায়। এ-বর্ণনা নিশ্চয়ই রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রবন্ধ শিলালিপির বিবরণ, প্রাচীন সংস্কৃত নাটক, কৌটিল্য ইত্যাদি থেকে সংগৃহীত। মৃণালিনী -উপন্যাসের রাজনৈতিক কাঠামো এবং বিবরণ খুব সম্ভবত মিনহাজউদ্দিনের ইতিহাস থেকে নেওয়া। পশ্চিমদেশীয়রা গৌড় জয় করবে—মিনহাজউদ্দিন এই প্রবাদের উল্লেখ করেছেন। নদীয়া বিজয় বর্ণনা-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি[১]—

১ 'মৃণালিনী' ৪ খণ্ড, ৪ পরিচ্ছেদ

'ষষ্টি বৎসর পরে যবন ইতিহাসবেত্তা মিন্‌হাজউদ্‌দীন এইরূপ লিখিয়াছিলেন। ইহার কতদূর সত্য, কতদূর মিথ্যা, তাহা কে জানে? যখন মনুষ্যের লিখিত চিত্রে সিংহ পরাজিত, মনুষ্য সিংহের অপমানকর্তা স্বরূপ চিত্রিত হইয়াছিল, তখন সিংহের হস্তে চিত্রফলক দিলে কিরূপ চিত্র লিখিত হইত? মনুষ্য মূষিকতুল্য প্রতীয়মান হইত সন্দেহ নাই।'

ঠিক এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি পাই বহু পরের রচনায়[১]—

'নীতিকথায় বাল্যকালে পড়া আছে, এক মনুষ্য এক চিত্র লিখিয়াছিল। চিত্রে লেখা আছে মনুষ্য সিংহকে জুতা মারিতেছে। চিত্রকর মনুষ্য এক সিংহকে ডাকিয়া সেই চিত্র দেখাইল। সিংহ বলিল, সিংহেরা যদি চিত্র করিতে জানিত তাহা হইলে চিত্র ভিন্নপ্রকার হইত। বাঙ্গালীরা কখনও ইতিহাস লেখে নাই। তাই বাঙ্গালীর ঐতিহাসিক চিত্রের এ দশা হইয়াছে।'

মৃণালিনীতেই নবদ্বীপ বিজয়ের পর মাধবাচার্য হেমচন্দ্রকে যে কথা বলেছিলেন, সেটাও বঙ্কিমেরই কথা—'যবনেরা নবদ্বীপ অধিকার করিয়াছে বটে, কিন্তু নবদ্বীপ তো গৌড় নহে।'[২] এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে—

'উত্তর বাঙ্গালা, দক্ষিণ বাঙ্গালা কোন অংশই বখতিয়ার খিলিজি জয় করিতে পারে নাই। লক্ষ্মণাবতী নগরী এবং তাহার পরিপার্শ্বস্থ প্রদেশ ভিন্ন বখতিয়ার খিলিজি সমস্ত সৈন্য লইয়াও কিছু জয় করিতে পারে নাই। সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখতিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, এ কথা যে বাঙ্গালীতে বিশ্বাস করে সে কুলাঙ্গার।'[৩]

বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি যে নেহাত দেশপ্রীতির অন্ধতা থেকেই উচ্চারিত হয়েছে তা বলা ঠিক নয়। কারণ পরবর্তী কালে ঐতিহাসিকরাও মিনহাজউদ্দিনের উক্তিতে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।[৪]

১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দে বাংলা দেশ মোগলদের দ্বারা অধিকৃত হওয়া পর্যন্ত বাংলার পাঠান রাজত্বকাল সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব ছিল সশ্রদ্ধ। কিন্তু তাঁর বিশ্বাস ছিল পাঠানরা

১ 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা'

২ 'মৃণালিনী' ৪ খণ্ড, ১২ পরিচ্ছেদ

৩ 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা'। 'মৃণালিনী' রচনার পর নবদ্বীপ বিজয় সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের নিজেস্ব ধারণা সমর্থিত ও গঠিত হয় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বই ও প্রবন্ধের দ্বারা। এ বিষয়ে বর্তমান লেখকের প্রবন্ধ 'স্বর্ণের মুষ্টি' দ্রষ্টব্য। দ্রষ্টব্য 'রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা,' ৫ জুলাই ১৯৭০।

৪ রমেশচন্দ্র মজুমদার, History of Ancient Bengal, 1971, pp. 256-257

কোনদিনই সমগ্র বাংলাদেশ জয় করতে পারে নি। পাঠান এবং মোগল রাজত্বের তুলনা করে তিনি দেখিয়েছেন পাঠানেরা স্বদেশ বলে এদেশেই স্থায়িভাবে বসবাস করেছিল এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করে নিয়েছিল। কিন্তু মোগলেরা এ দেশ জয় করেছিল বটে, কিন্তু বঙ্গভূমিকে স্বদেশ বলে কখনোই গ্রহণ করে নি। পাঠান ও মোগল রাজত্বের তুলনার এই ইঙ্গিত তিনি রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বই থেকে পেয়েছিলেন মনে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে বাঙালীর মানসিক জ্যোতি পাঠান রাজত্বকালের মত আর কখনই হয় নি। হুসেন শাহর পৃষ্ঠপোষকতায় গৌড়ে বাংলা সাহিত্যের উজ্জীবন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। চৈতন্যের আবির্ভাব হল এই সময়ে। তাঁরই প্রেরণায় বৃন্দাবনের ষড়্‌গোস্বামী বিভিন্ন বৈষ্ণব নিবন্ধ রচনা করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মকে উচ্চ দার্শনিক ভিত্তিতে স্থাপন করে গেলেন; বৈষ্ণব পদকর্তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হল পদাবলীর গান; ব্রজবুলির সৃষ্টি হল এক নূতন কাব্যভাষারূপে। রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ ইতিপূর্বেই শুরু হয়ে গিয়েছিল, এবার ভাগবতের অনুবাদও ব্যাপক ভাবে হতে লাগল। চৈতন্যভাগবতের বর্ণনায় বুঝতে পারা যায়, নব্যন্যায় প্রভৃতি বিশুদ্ধ জ্ঞানের চর্চা দেশে প্রসার লাভ করেছে। রঘুনাথ শিরোমণি এলেন আর স্মার্ত রঘুনন্দন প্রাচীন হিন্দু সমাজকে নূতন ব্যবস্থায় বেঁধে দিলেন।[১] এক কথায় বলতে গেলে সেই প্রাচীন উক্তি—কাব্যেঽপি কোমলধিয়ো বয়মেব নান্যে, তর্কেঽপি কোমলধিয়ো বয়মেব নান্যে—সার্থক হয়েছিল মোগল শাসন দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করবার পূর্বেই। মোগল শাসনের পূর্ববর্তী এই উজ্জীবন সম্পর্কে বিশেষ লক্ষণীয় এই যে, এতে অনুকরণের চেয়ে মৌলিকতাই ছিল বেশি। ঊনবিংশ শতাব্দীর উজ্জীবনের সঙ্গে এর পার্থক্য এইখানেই। আধুনিক নবজাগরণে খানিকটা বিদেশীয় সংস্কৃতির অনুকরণ ছিল, এবং এর সমর্থনে বঙ্কিমচন্দ্রকে 'অনুকরণ' নামে প্রবন্ধটি লিখতে হয়েছিল। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর উচ্ছ্বাস অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে জাতির অন্তর থেকেই এসেছিল।

এই প্রাণশিখা মোগল শাসনকালে অনুজ্জ্বল হয়ে এল। বঙ্কিমচন্দ্র 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রবন্ধে লিখেছেন—

'যে আকবর বাদশাহের আমরা শতমুখে প্রশংসা করিয়া থাকি, তিনিই বাঙ্গালার কাল। তিনিই প্রথম প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালাকে পরাধীন করেন। সেই দিন হইতে বাঙ্গালার শ্রীহানির আরম্ভ। মোগল পাঠানের মধ্যে আমরা মোগলের অধিক সম্পদ্ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া মোগলের জয় গাইয়া থাকি, কিন্তু মোগলই আমাদের শত্রু, পাঠান আমাদের মিত্র। মোগলের অধিকারের পর হইতে ইংরেজ শাসন পর্যন্ত একখানি ভাল গ্রন্থ

১ বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

বঙ্গদেশে জন্মে নাই। যে দিন হইতে দিল্লীর মোগলের সাম্রাজ্যে ভুক্ত হইয়া বাঙ্গালা দুরবস্থা প্রাপ্ত হইল, সেইদিন হইতে বাঙ্গালার ধন আর বাঙ্গালায় রহিল না, দিল্লীর বা আগ্রার ব্যয়নির্বাহার্থ প্রেরিত হইতে লাগিল।'

বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তির সারবত্তা আমরা বুঝতে পারি যখন ভেবে দেখি মোগল শাসনে সত্যই বাঙালীর মনের ক্ষেত্রে কোন নবীন শস্য জন্মে নি ; শুধু পূর্বে উদ্‌ভাবিত শস্যের থেকেই বীজ বপন করে যাওয়া হয়েছে মাত্র। পূর্ববর্তী কাব্যের আদর্শের অনুসরণে বহিরঙ্গ-পারিপাট্যে মনোহরণ করে মঙ্গল কাব্য এবং বৈষ্ণব কাব্যের দুই ধারা চলে আসে। ধর্মের দিক দিয়েও বৈষ্ণব ধর্মের উদ্দীপনা স্তিমিত হয়ে শাক্তধর্মের প্রান্তরে পথ হারায়। সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব মোহান্তদের জীবনী এবং বৈষ্ণবধর্মের ইতিহাস রচনার সঙ্গে পদাবলীসংকলনও হতে থাকে। এগুলি ঠিক মৌলিক নয়, মৌলিক সৃষ্টির সালতামামী। মোগল শাসনে একখানি 'ভাল গ্রন্থে'র অভাব বলতে বঙ্কিমচন্দ্র বোধ হয় পূর্ববর্তী যুগের প্রতিভার স্বাভাবিক উৎসারকেই স্মরণ করেছিলেন। পাঠানকে যে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার মিত্র বলে আখ্যাত করেছেন তার কারণ পাঠানরা ভিন্নজাতীয় হলেও বাংলাকেই স্বদেশরূপে গ্রহণ করেছিলেন। পরন্তু মোগল রাজারা দিল্লী থেকে সুবাদারের সহায়তায় শাসন করতেন বলে বাংলাদেশ তাঁদের করদরাজ্যে পরিণত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের এই অভিযোগ আধুনিক ঐতিহাসিকও সমর্থন করবেন[১]—

Mughal rule in Bengal preserved its character of a foreign conquest. The viceroys and officers came and went without taking any real interest in the life of the province. A considerable part of the resources of the land was drained away to Upper India in the form of presents or cash tributes.

মোগলশাসনের এই বৈদেশিক প্রকৃতির মধ্যে সুফলও ছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তাকে সহৃদয়চিত্তে গ্রহণ করতে পারেন নি। পাঠানশাসনকালে বাংলা দেশ আপন গণ্ডিতে সংকুচিত হয়ে পড়েছিল। মোগল শাসনেই বাংলা উত্তর-ভারতীয় জীবন-ধারার পথে এসে দাঁড়াল। শুধু তাই নয়, আকবরের শাসন-ব্যবস্থা এ দেশে অনেকটা শান্তি ও শৃঙ্খলা এনে দিল। আকবরের বঙ্গদেশ জয়ের পর নূতনতর শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং সেই সঙ্গে তোডরমল্লের রাজস্ব-বন্দোবস্ত বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা এনে

১ **Tapan Kumar Roychoudhuri,** ***Bengal under Akbar and Jahangir,*** **Calcutta 1953, p. 43**

দিল। মোগল রাজত্বের প্রয়োজনে জমিদারসম্প্রদায়ের উদ্ভব; কর সংগ্রহের জন্যে এদের সৃষ্টি। রাজার রাজস্ব আদায় করে যার যত বেশি লাভ থাকত সে ততই ধনী হয়ে উঠত। সুতরাং এদের বলা যেতে পারে করসংগ্রহের কন্‌ট্রাক্‌টর। অবশ্য এ কথা স্বীকার করতেই হবে, মোগল রাজত্বের পূর্ব থেকেই বাংলা দেশে জমিদার-জাতীয় কয়েকটি রাজপরিবার ছিল; কিন্তু এটাও ঠিক যে, মোগল যুগে রাজস্ব-ব্যবস্থার জন্য ছোটবড় অসংখ্য জমিদার দেশে এক নূতন শ্রেণী সৃষ্টি করে। 'কর-সংগ্রহের কন্‌ট্রাকটর' কথাটি বঙ্কিমচন্দ্র সম্ভবত ওয়েস্টল্যাণ্ডকে অনুসরণ করেই প্রয়োগ করেন। জমিদারসম্প্রদায়ের উদ্ভব এবং তাদের প্রজাপীড়ন সম্পর্কে মোগল শাসনকে দোষারোপ করে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন সেটা সম্পূর্ণ তাঁরই মত মনে করলে ভুল হবে। প্যারীচাঁদ মিত্রের পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধেও এই তথ্যটিই দেখানো হয়েছে[১]—

The word Zemindar, although an indefinite term, has no reference, like other Persian words of similar termination to ownership of land. This innovation in name was followed by another of a more radical nature. And it arose from a love of exaction. Several districts were incorporated into one great fiscal division and committed to the charge of individuals who were designated Talukdar or Zemindar-Talukdar. This Talukdari or farming system on an extensive scale was vigorously carried on in Bengal by Jaffier Khan alias Murshidkuly Khan, in consequence of his having found the ancient Zemindars reluctant to submit to his extortions, The Zemindar-Talukdars were neither the actual collectors, nor did they in any way bring themselves in contact with the people. They were averse to this trouble and they farmed the revenue to others between whom and the Government they stood as middlemen.

ইংরেজরা এ দেশে এল মোগল সাম্রাজ্যের ভগ্নদশায়। জমিদারেরা তখন প্রবল হয়ে দিল্লীর শাসন লঙ্ঘন করতে সাহসী হয়ে উঠেছে। এই সময়কে দৃশ্যপট করে বঙ্কিমচন্দ্র একাধিক উপন্যাস লিখেছেন। সীতারাম, দেবীচৌধুরাণী, চন্দ্রশেখর, আনন্দমঠ

১ *Calcutta Review*, 1846, No. XII, Vol. VI. The Zemindar and the Ryot.

—এই চারখানি উপন্যাস মোগল রাজত্বের পতন এবং ইংরেজ শাসনের অভ্যুদয়ের মাঝামাঝি সময়ের ইতিহাস আশ্রয় করে রচিত। কেন্দ্রের শাসন যখন শিথিল, তখন সেই বিশৃঙ্খলার যুগেই সীতারামের মতো রাজার উদ্ভব। তারপর দেশব্যাপী অরাজকতা এবং বিশৃঙ্খলার সুযোগে ইংরেজ ভারতভূমিতে সাম্রাজ্য বিস্তার করল।

ইংরেজরা দেশের শাসনভার গ্রহণের পূর্ণ দায়িত্ব স্বীকার করবার পূর্বে মন্বন্তর ইত্যাদি যে বিপর্যয় ঘটেছিল, আনন্দমঠ তারই পটভূমিতে লেখা। অবশ্য আনন্দমঠে সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের ঐতিহাসিকতা তিনি রক্ষা করেন নি। উপন্যাস বলেই আমরা এর থেকে ইতিহাস-চিন্তা ঠিক প্রত্যাশা করি না। এই বিদ্রোহ বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনাকে মহোজ্জ্বল রাগে রঞ্জিত করেছে। আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্র অতীত থেকে ভবিষ্যতের পথে পদক্ষেপ করেছেন। ভবিষ্যৎ বাঙালীর অন্তর্বিষয়ক ও বহির্বিষয়ক জ্ঞানের সুসমঞ্জস সমৃদ্ধির তিনি স্বপ্ন দেখছেন। আনন্দমঠে ইতিহাসের অতীতচারণ মুখ্য নয়, ভবিষ্যতের প্রত্যাশাই মুখ্য। এই যুগটি নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের কোন প্রবন্ধ নেই, শুধু 'বঙ্গদেশের কৃষকে' এর প্রাসঙ্গিক আলোচনা আছে। আচার্য যদুনাথ সরকার এই যুগটি সম্বন্ধে বলেছেন[১]—

'দেবীচৌধুরাণীতে বর্ণিত যুগে ইংরেজরা জমির অস্থায়ী বন্দোবস্ত করিতেন, নিলামে সর্বোচ্চ দরে এক এক বৎসরের জন্য (পরে একবার ৫ বৎসরের জন্য) জমিদারীগুলি ইজারা দেওয়া হইত। ইতিহাস-পাঠক সর্বদেশেই দেখিয়াছেন যে এই কুপ্রথার ফল ভীষণ প্রজাপীড়ন, চাষের হ্রাস, জমিদারের সর্বনাশ এবং রাজারও নিয়মিত বার্ষিক আয়ে দ্রুত অবনতি। দেশের এই দুর্দশার চিত্র বঙ্কিম ঠিক আঁকিয়াছেন, ইহার কোন অংশ কল্পিত বা অতিরঞ্জিত নহে। কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩) আর যাহাই করুক না কেন, অনেক বৎসর ধরিয়া মফঃস্বলে শান্তি, প্রজার সুখ এবং রাজস্বের নির্দিষ্টতা আনিয়া দেয়।'

বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রশংসা করতে পারেন নি। তাঁর মতে এতে উৎপীড়ন ঠিকই চলল, শুধু জমিদারেরা উৎপীড়ন করার চিরস্থায়ী অধিকার পেল।[২] এ বিষয়ে রমেশচন্দ্র ভিন্ন মত পোষণ করতেন।[৩] চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বঙ্কিমচন্দ্র-কৃত সমালোচনা তাঁর চিন্তার অগ্রগামিতার পরিচয় দেয়।

১ দেবীচৌধুরাণী, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ, ভূমিকা

২ বঙ্গদেশের কৃষক, চতুর্থ পরিচ্ছেদ

৩ বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৬০ সংখ্যায় অর্থনীতিবিদ্ অধ্যাপক ডক্টর ভবতোষ দত্ত-লিখিত 'রমেশচন্দ্র দত্ত ও ভারতবর্ষের আর্থিক ইতিহাস' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ইংরেজ রাজত্বের সমালোচনা বঙ্কিমচন্দ্র কম করেন নি। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতাকেও তিনি কঠিন ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন, তবু শেষ পর্যন্ত তিনি ইংরেজ শাসনকেই চেয়েছিলেন। বাংলার ইতিহাসে ইংরেজরা যে অধ্যায় রচনা করতে এসেছিল, সেই অধ্যায়কে উনবিংশ শতাব্দীর কোন মনীষীই লঘু করতে পারেন নি। সে যুগের মনীষীদের মধ্যে এক দিকে প্রখর দেশপ্রীতি আর একদিকে ইংরেজপ্রীতি অনেককেই বিভ্রান্ত করে। কিন্তু এটাই ছিল ইতিহাসের শিক্ষা। রামমোহনের জীবনীতেও কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখেছেন[১]—

In his youth he was violently opposed to the English Government. But as he saw more of it, and learnt to compare it with the Mahommedan Government his strong aversion was converted into a warm admiration for its general character. He considered the conquest of this country by the English nation as a providential interposition calculated to answer important ends in the economy of the moral world. Though he was fully cognizant of the complex organization of the Government and of all wrongs and grievances inseparable from its operation, yet he cheerfully and gratefully admitted the manifold blessings it conferred on his country; and was strongly of opinion that the English were better fitted to govern it than the natives themselves.

রামমোহন সম্পর্কে প্রযুক্ত এই কথাগুলি সেকালের প্রায় সকল মনস্বী ব্যক্তিরই কথা বলে ধরা যেতে পারে। তাঁরা বঙ্গভূমির ইতিহাসকে ধূসর অতীত থেকে সুদূর ভবিষ্যতের অনন্ত সম্ভাবনায় প্রসারিত দেখতে পেয়েছিলেন। এক সময়ে তার গৌরবদীপ জ্বলে উঠেছে, দুঃশাসনে বিপর্যয়ে এক সময়ে সে নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে। একটি দুর্মদ বলিষ্ঠ সভ্যতার রূঢ় আঘাতে সেই মৃতপ্রায় দেহটি যদি সঞ্জীবিত করে তোলা যায় তবে বিদেশী বলেই তাকে পরিহাস করা অনুচিত। বাংলা দেশের আধুনিক ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্র সেই আশাই পেয়েছিলেন।

১ *Calcutta Review* (Selections Vol. IV), '*Rammohun Roy*'। প্রবন্ধটি প্রথমে ক্যালকাটা রিভিউ ১৮৪৫-এ প্রকাশিত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র ও সংস্কৃত সাহিত্য

Those who care for the preservation, the extension and the advancement of our culture cannot fail to interst themselves in our classical heritage.

—T. S. Eliot.

বঙ্কিমচন্দ্র যে-সময়ে বাল্যশিক্ষা লাভ করেছিলেন সে-সময়ে স্কুল-কলেজে সংস্কৃত পড়ানোর ব্যবস্থা ছিল না। সংস্কৃত কলেজে অবশ্য সংস্কৃত অধ্যয়ন-অধ্যাপনা চলেছে, কিন্তু হিন্দু কলেজ, হুগলি কলেজ অথবা কৃষ্ণনগর কলেজে সংস্কৃত পড়ানো হত না। তখনও পর্যন্ত সংস্কৃত পড়তে হত টোলে। বঙ্কিমচন্দ্র স্কুল-কলেজে সংস্কৃত পড়েন নি। তার শিক্ষা প্রথমাবধি ইংরেজি সাহিত্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের ভিত্তিতেই গঠিত হয়েছিল। (বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা এবং সংস্কৃত কাব্যের যে-আলোচনা যেখানে করেছেন, সেখানেই দেখা যায় পাশ্চাত্য সাহিত্যসমালোচনা-পদ্ধতিকে আশ্রয় করেই করেছেন। উত্তরচরিতের বিখ্যাত সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃত আলংকারিকদের প্রণাম করে বিদায় দিয়েছিলেন।)

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীতে সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রপাঠের প্রভাব এতই প্রচুর পরিমাণে ছড়িয়ে আছে যে সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর প্রবেশের গভীরতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। বিশাল মহাভারত কাব্য মন্থন করে তিনি কৃষ্ণচরিত্র রচনা করেছিলেন, শেষ বয়সে তিনি ভগবদ্গীতার টীকা লিখতে আরম্ভ করেছিলেন; এ-ছাড়া ভক্তিশাস্ত্র, ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণ, সাংখ্যদর্শন নিয়ে তাঁর বহু রচনা আছে। বৈদিক সাহিত্য সম্বন্ধে ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটে তাঁর বক্তৃতাগুলিও বিখ্যাত। বঙ্কিমচন্দ্রের সংস্কৃত ভাষাচর্চার দুটি দিক আছে। সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থাদি অধ্যয়নের ফলে তাঁর সাহিত্যবোধ যেমন সমৃদ্ধ হয়েছিল, তেমনি তাঁর উপন্যাস এবং সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলি বিশিষ্টতা অর্জন করেছিল। পরবর্তী কালে বঙ্কিমচন্দ্র শাস্ত্রচর্চাই বিশেষ ভাবে করেছিলেন এবং তার দ্বারা একটি নতুন ধর্মদর্শন সৃষ্টি করে তুলেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের পরিবারে সংস্কৃত চর্চা যেমন দেবেন্দ্রনাথের সময় থেকে অব্যাহত ভাবে চলে এসেছে, বঙ্কিমচন্দ্রের পরিবারে ঠিক তেমন ভাবে হয় নি। দ্বিজেন্দ্রনাথ সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন, উপনিষদের চর্চা এবং দেবেন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্র অধ্যয়ন তাঁর অবশ্যকৃত্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা

যাদবচন্দ্র সংস্কৃত বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন বলে জানা যায় না। তিনি সরকারি কাজে নিযুক্ত ছিলেন। সেই উপলক্ষে তাঁকে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। তবে পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের সংস্কৃতশিক্ষার ভিত্তি সম্বন্ধে কয়েকটি সংবাদ জানিয়েছেন। সেগুলি অবশ্য মূল্যবান। যাদবচন্দ্র যখন মেদিনীপুরে কাজ করতেন তখন বালক বঙ্কিমচন্দ্র টিড নামে এক ইংরেজ হেডমাষ্টারের কাছে শিক্ষা লাভ করেছেন। বলা বাহুল্য সে-শিক্ষা ইংরেজি শিক্ষা। সেই সময়ে সেই ইংরেজ পরিবারের সঙ্গে তাঁর মেলামেশাও হয়েছিল। কিন্তু পিতা পুত্রের শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে কাঁঠালপাড়ায় পাঠিয়ে দেন। তখন সাধারণভাবে সংস্কৃতচর্চার প্রচলন ছিল। বিশেষ করে নৈহাটি তখন পণ্ডিতসমাজের কেন্দ্রস্থল। কাঁঠালপাড়ায় এসে বঙ্কিমচন্দ্র বহু সংস্কৃত শ্লোক এবং বাঙ্গালা কবিতা আবৃত্তির অভ্যাস করেছেন। পূর্ণচন্দ্র বলেছেন, 'বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যকালে অনেকগুলি শ্লোক ও কবিতা আবৃত্তি করিতেন। তাঁহার আবৃত্তির সময়াসময় ছিল না'।

তখন ভাটপাড়ার বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন হলধর তর্কচূড়ামণি। ইনি মাঝে মাঝে যাদবচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসতেন। বঙ্কিমের মুখে একদিন তিনি শুনলেন পদাঙ্কদূতের[১] একটি শ্লোক—'গোপীভর্তুর্বিরহবিধুরা কাচিদিন্দুবরাক্ষী'। তর্কচূড়ামণি নাকি বঙ্কিমের আবৃত্তিতে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে সংস্কৃত শিক্ষা দেবার প্রস্তাব করেছিলেন। ইংরেজি এবং সংস্কৃত এক সঙ্গে দুটি ভাষা শেখা কঠিন হবে—এই কারণে যাদবচন্দ্র সে-প্রস্তাব গ্রহণ করেন নি। কিন্তু যাদবচন্দ্র যথারীতি সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা না করলেও বঙ্কিমচন্দ্রকে তিনি উৎসাহ দিয়েছেন। এটা খুবই স্বাভাবিক ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের নানা রচনাতে শিক্ষিতজনের প্রসঙ্গ আনতে গেলে ন্যায়চুঞ্চু, তর্কপঞ্চানন, শিরোমণি প্রভৃতিরই উল্লেখ করতেন। এর কারণ স্কুল-কলেজে ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও সাধারণ টোল ইত্যাদি তখন যথেষ্টই প্রচলিত, বিশেষত ভাটপাড়া কাঁঠালপাড়ার খুব কাছে। সেই আবহাওয়া বঙ্কিমকে সহজেই স্পর্শ করেছে। সহজ জ্ঞানস্পৃহা এবং সাহিত্যরসাস্বাদের জন্যই তিনি সংস্কৃত কাব্যপাঠে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। বঙ্কিচন্দ্রের মাতামহ সেকালে সংস্কৃত শাস্ত্রে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন বলে শোনা যায়। তিনি বহু ব্যয়ে এবং যত্নে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ সংগ্রহ করেছিলেন। সংস্কৃতের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের আগ্রহ দেখে তাঁর সেই গ্রন্থসংগ্রহ তিনি তাঁকেই দান করেন। সেই সংগ্রহে জ্যোতিষ-তন্ত্রের পুঁথিও ছিল। পূর্ণচন্দ্র বলেছেন, এই সব সংস্কৃত গ্রন্থ পড়েই বঙ্কিমের সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য জন্মে। তা ছাড়া শ্রীরাম ন্যায়বাগীশের টোলে মাঘ, ভারবি,

১ নদীয়া-রাজসভার কৃষ্ণ সার্বভৌম দ্বারা ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত।

নৈষধ প্রভৃতি কাব্যও তিনি পড়েন। এই সময় থেকেই নাকি বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজি বই পড়া ছেড়ে সংস্কৃত গ্রন্থপাঠে মনোনিবেশ করেন।[১]

এই প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মৃতিও উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন—'কাব্যের উপর বঙ্কিমবাবুর খুব ঝোঁক ছিল। তিনি কলেজ হইতে বাহির হইয়া ভাটপাড়ার শ্রীরাম শিরোমণি মহাশয়ের নিকট রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, শকুন্তলা পড়িয়াছিলেন। ভাল শাব্দিক হইলেও শিরোমণি মহাশয়ের কাব্য বুঝিবার ক্ষমতা খুব ছিল। আমি তাঁহার নিকট মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের শেষ অংশ ও জয়কৃষ্ণের সারমঞ্জরী পড়িয়াছিলাম। তাহার পর তিনি আমাকে নৈষধ পড়াইতে আরম্ভ করেন। নৈষধ পড়িতে গিয়া কাব্যাংশই তিনি বুঝাইতে চান, ব্যাকরণ বা দর্শনের দিকে তিনি ফিরিয়াও চান না। সেকালের টোলের পণ্ডিতেরা অলংকার খুব কমই পড়িতেন। যদি বা দুই একজন পড়িতেন, তাঁহারা কাব্যপ্রকাশের জগদীশ তর্কালংকারের টীকা পড়িতেন এবং ন্যায়শাস্ত্রের কচকচি লইয়াই থাকিতেন। সেকালে লোকে যে সকল ইংরাজী কাব্য পড়িত সে সকলই বঙ্কিমবাবুর পড়া ছিল।'[২]

টোলে এবং সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা এবং অধ্যয়নের যে ধারা প্রচলিত ছিল, তাতে তখনকার নব্যশিক্ষিত বাঙালী সমাজ কতখানি প্রভাবিত হয়েছিল বলা কঠিন। নব্য ইংরেজি-শিক্ষিতরা ইংরেজি সাহিত্যের মোহেই মুগ্ধ ছিল। সংস্কৃতের চর্চা ইংরেজ প্রাচ্যতত্ত্ববিদগণ করেছেন, কিন্তু সে চর্চা সম্পূর্ণ ভিন্নতর ধারার। বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করবার অভিপ্রায় তাতে ছিল না। ফলে সংস্কৃত-পণ্ডিত এবং ইংরেজি শিক্ষিত নব্য বলতে গেলে সাহিত্যরসাস্বাদনের প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতেরই বিচরণ করে ফিরেছেন। মধুসূদনের উক্তি মনে পড়ে—সংস্কৃত পণ্ডিতরা জানে না কাব্যরস কাকে বলে। তারা জানে শুধু অলংকার। মধুসূদন যে-নূতন ধরনের কাব্যের প্রবর্তন করলেন তার রসাস্বাদন-পদ্ধতি আলাদা, তার বিষয়-বিন্যাস ভিন্ন। কিন্তু রামায়ণ মহাভারত কালিদাস ভবভূতির কাব্যের উৎকর্ষ অস্বীকার করবার সাহস কার? বরং মঙ্গলকাব্য পাঁচালি নিয়ে প্রশ্ন চল্‌তে পারে, কিন্তু সংস্কৃত কাব্য নিয়ে কখনই নয়। অতএব সংস্কৃত কাব্যরসাস্বাদনের আধুনিক পদ্ধতির প্রয়োজন হয়ে পড়ল। মল্লিনাথ যে ভাবে টীকা রচনা করেছিলেন, কিংবা সাহিত্যদর্পণকার যেভাবে কাব্যালোচনা করেছিলেন সে-ভাবে আধুনিক পাশ্চাত্য-প্রভাবিত সাহিত্যের বিচার চলতে পারে না।

১ বঙ্কিমপ্রসঙ্গ পৃ ৯৩

২ ঐ পৃ ১৫৭

শুধু তাই নয়। হোমার শেকস্‌পীয়র মিলটন পড়ে নব্য বাঙালী সাহিত্যের যে স্বাদ পেয়েছে, তার তুলনায় বাংলা সাহিত্যের দীনতা তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। আমাদের দেশের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে প্রমাণিত করবার স্বাভাবিক বাসনা দেখা দিল। ধর্মের ক্ষেত্রে রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ লোকাচারমুক্ত বিশুদ্ধ হিন্দুধর্মকে খ্রীষ্টীয়নীতি-বাদের তুলনায় সমপর্যায়ে স্থাপন করতে চেয়েছেন। তেমনি আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের মহিমা প্রদর্শনের দ্বারাও ভারতীয় ঐতিহ্যের মহত্ত্ব তুলে ধরবার চেষ্টা হয়েছে। ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের জন্য হিন্দু কলেজ স্থাপনের সঙ্গে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করে সংস্কৃতচর্চাকে আধুনিক যুগ ও জীবনের সম্মুখবর্তী করে তোলবার প্রয়াস এর মূলে ছিল। অবশ্য শাসক দেশের প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতিকে কোনো ক্রমে বিচলিত না করবারই পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু স্মৃতি ন্যায় ব্যাকরণ দর্শন কাব্য যেখানে পড়ানো হত, সেখানে বিদ্যাসাগর মহাশয় যে-পরিবর্তন নিয়ে আসার প্রস্তাব করে-ছিলেন তার অনুপ্রেরণা নিশ্চয়ই অনুধাবনীয়। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন—

It will be generally admitted that at the present day, in the full blaze of the light which the science and the philosophy of Europe pours upon us, the value the Hindu philosophy, for the sake of the knowledge of Nature which it can impart is insignificant.

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃত কাব্য সম্বন্ধে এমন কথা বলেন নি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সংস্কৃত কাব্যের রসোৎকর্ষ বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলেন। তা না হলে রঘুবংশ, কিরাতার্জুনীয়, শিশুপালবধ, কুমারসম্ভব, কাদম্বরী, মেঘদূত, উত্তরচরিত, অভিজ্ঞানশকুন্তল, হর্ষচরিত প্রভৃতি সংস্কৃত সাহিত্য-গ্রন্থ সম্পাদনা করতেন না। তবে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত সাহিত্যালোচনায় কিছু কিছু আধুনিক মান ব্যবহার করলেও পুরোপুরি পাশ্চাত্যপন্থী হয়ে ওঠা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমালোচনারীতির নিদর্শন হিসাবে তাঁর উত্তরচরিত গ্রন্থের ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত করা করা যেতে পারে—

'ভবভূতি ভারতবর্ষের এক অতি প্রধান কবি। কবিত্বশক্তি অনুসারে গণনা করিতে হইলে কালিদাস, মাঘ, ভারবি, শ্রীহর্ষ ও বাণভট্টের পর তদীয় নামনির্দেশ, বোধহয় অসঙ্গত নহে। ভবভূতির সবিশেষ প্রশংসনীয় কতিপয় অসাধারণ গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার গ্রন্থে অর্থের যেরূপ ঔদার্য ও গাম্ভীর্য আছে, অন্যান্য

কবির গ্রন্থে প্রায় সেরূপ লক্ষিত হয় না। ভবভূতি ভিন্ন ভারতবর্ষীয় অন্যান্য কবির কাব্যে গিরি, নদী, অরণ্য প্রভৃতির প্রকৃত রূপ বর্ণনা নিতান্ত বিরল। অন্যান্য কবিরা অনাবশ্যক স্থলেও আদিরস অবতীর্ণ করিয়াছেন; কিন্তু ভবভূতি সে দোষে দূষিত নহেন। তিনি, অনাবশ্যক স্থলে, স্বীয় রচনাকে কদাচ আদিরসে কলুষিত করেন নাই; আবশ্যক স্থলেও আদিরস বর্ণনাকালে অত্যন্ত সাবধান হইয়াছেন। ইঁহার যেমন অসাধারণ গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনই অসাধারণ দোষও লক্ষিত হইয়া থাকে। তদীয় কাব্যের অনেক স্থলে অনায়াসে অর্থগ্রহ হওয়া দুর্ঘট, এবং মধ্যে মধ্যে সংস্কৃতে এবং প্রাকৃতে এমন দীর্ঘ সমাসঘটিত রচনা আছে, যে তাহাতে অর্থবোধ এবং রসগ্রহ বিষয়ে বিলক্ষণ ব্যাঘাত ঘটিয়া উঠে। নাটকে কথোপকথনস্থলে সেরূপ দীর্ঘসমাস অবলম্বন অত্যন্ত দোষাস্পদ।'

বিদ্যাসাগর বিষয়গত বৈশিষ্ট্য নির্দেশ এবং আদিরসের অপেক্ষাকৃত বিরল ব্যবহারের যে উল্লেখ করেছেন, তাতে স্পষ্টতই একটি পরিবর্তিত আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে। প্রসঙ্গত অবশ্য উল্লেখযোগ্য, খুব সম্ভবত বিদ্যাসাগরই শকুন্তলা নাটক সম্বন্ধে গ্যেটের বিখ্যাত উক্তিটি তাঁর সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাবে (১৮৫৩) প্রথম উদ্ধৃত করেছিলেন। অতঃপর রবীন্দ্রনাথ এই উক্তি অবলম্বনেই তাঁর 'প্রাচীন সাহিত্যে'র অন্তর্গত প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র গ্যেটের এই মন্তব্যটি ব্যবহার করেন নি। সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে আধুনিক দৃষ্টিতে গভীর আলোচনা বিদ্যাসাগরের পূর্বে বিশেষ পাওয়া যায় না। তবে সংস্কৃত কাব্যনাটকের অনুবাদের প্রচলন শুরু হয়ে গিয়েছিল। এই রকম অনুবাদ-প্রচেষ্টার পশ্চাৎপটে যে-মনোভাব ছিল, তার অন্যতম লক্ষ্য ছিল বাংলা ভাষার ও সাহিত্যমানের সমৃদ্ধি-সাধন। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা টোলে চতুষ্পাঠীতে যে-কাব্য পড়াতেন তাতে 'ভাষা'র জন্য উৎকণ্ঠা ছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু সেকালের দিনে নিশ্চয়ই কেউ কেউ ছিলেন যাঁরা বাংলা ভাষাকে গ্রাম্য লৌকিক দীনতা থেকে উদ্ধার করতে চেয়েছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় শুধু যে সংস্কৃত কাব্য নাটক সম্পাদনা করেছেন, তা নয়। শকুন্তলা, সীতার বনবাস, মহাভারতের অনুবাদ করেছেন বাংলা ভাষাতে। বাংলা গদ্যভাষা নির্মাণ এবং বাঙালীর পরিশুদ্ধ সাহিত্য-রুচি প্রস্তুত করাও নিশ্চয়ই তাঁর পরোক্ষ বাসনা ছিল। তারাশংকর তর্করত্নের কাদম্বরী ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সে-বইও মূলের অবিকল অনুবাদ নয়। 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র থেকে যে কয়টি সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদের কথা জানা যায়, তার কোনোটাই বিশুদ্ধ সাহিত্যগ্রন্থ নয়। এদের মধ্যে প্রধান গীতা, মহাভারত, শৃঙ্গারতিলক, মোহমুদ্গর, বৈরাগ্যশতক, নীতিশতক। চিরঞ্জীব শর্মার বিদ্বোন্মাদতরঙ্গিণী এবং কৃষ্ণ

মিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক দুটিও অনুবাদিত হয়েছে। দ্বিতীয় বইখানির প্রসঙ্গে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যে মন্তব্য করেছিলেন তার থেকে জানা যায়, ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে রামকান্ত ভট্টাচার্যের শকুন্তলার অনুবাদের পূর্বে সংস্কৃত নাটকের মধ্যে একমাত্র এই বইয়েরই অনু-বাদ হয়েছে।[১] ঈশ্বর গুপ্তের এই মন্তব্যের পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাব্যনাটকানুবাদ ছাড়াও বেরিয়েছিল লালমোহন গুহ এবং ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষের মেঘদূত (১২৫৭), দ্বিজেন্দ্র-নাথ ঠাকুরের মেঘদূত (১৮৬০),[২] মাধবচন্দ্র শর্মার ঋতুসংহার (১৮৫৫), প্যারীমোহন সেনগুপ্তের কুমারসম্ভব (১৮৬১) এবং হরিমোহন গুপ্তের শকুন্তলা (১৮৬৯)। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের অনুবাদ করেন বোধেন্দুবিকাস (১৮৬৩) নামে। মনে হয় বিদ্যাসাগর-তারাশংকরের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়েই সংস্কৃত কাব্যনাটকের প্রতি বাঙালীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তাছাড়া এ বিষয়ে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের উদ্যমও শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণীয়। বিবিধার্থসংগ্রহে মাঝে মাঝেই তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের বিবরণ প্রকাশ করেছেন। 'অভিজ্ঞানশকুন্তল নামক নাটকের সংক্ষেপ বিবরণ (২ পর্ব ১৮৫২), কাদম্বরী গ্রন্থের সারসঙ্গ্রহ (২ পর্ব ১৮৫২), প্রবোধচন্দ্রোদয়ের মর্ম (২ পর্ব ১৮৫২), রত্নাবলী নাটকের সংক্ষেপ ইতিহাস (২ পর্ব ১৮৫২), বেণীসংহার নাটকের সমালোচনা (৩ পর্ব ১৮৫৩), রত্নাবলী নাটকের সমালোচনা (৫ পর্ব ১৮৫৫), মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক (৬ পর্ব ১৮৫৬)—'এই প্রবন্ধগুলি সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালী পাঠকের পরিচয় গ্রহণে বিশেষ সহায়তা করেছিল সন্দেহ নেই। কালীপ্রসন্ন সিংহ, রামনারায়ণ তর্করত্ন, শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি আরও কেউ কেউ সংস্কৃত নাটক অবলম্বন অথবা অনুবাদ করেছেন এই সময়েই।

যে-সব কাব্যনাটকের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হল, সেগুলিই যে সেকালে একমাত্র পঠিত এবং আলোচিত হত, একথা ভাববার কারণ নেই। বাংলা ভাষাতে সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চার নিদর্শন বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভাবের পূর্বে যা পাওয়া যায়, সেই দিক দিয়েই এগুলির উল্লেখযোগ্যতা। এদের মধ্যে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে কালিদাস ভবভূতি বাণভট্ট এবং শ্রীহর্ষ—প্রধানত এঁরাই বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন রচনায় এঁদের উল্লেখ তো আছেই, তা ছাড়া অন্যান্য সংস্কৃত

১ সংবাদপ্রভাকর ২৮ জুন ১৮৪৮

২ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মেঘদূত'-অনুবাদ সম্পর্কে মধুসূদনের উক্তি-'আমার ধারণা ছিল বাঙ্গলায় ভাল করিয়া কবিতা রচিত হোতে পারে না, 'মেঘদূত' পড়ে দেখচি সে ধারণা ভুল।'—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিকথা, পুরাতনপ্রসঙ্গ

কবিদের প্রসঙ্গও আছে। ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে 'মৃণালিনী' উপন্যাসটি প্রকাশিত হলে রাজেন্দ্রলাল মিত্র রহস্যসন্দর্ভ পত্রিকায় তার একটি সমালোচনা লেখেন। তাতে প্রসঙ্গত তিনি বলেন[১]—

'তিনি বাল্যকালাবধি ইংরাজীর অনুরাগী; ২৩ বৎসর বয়ক্রম পর্যন্ত বিদেশীয় ভাষারই সর্বদা অনুশীলন করিয়া তাহাতে বি-এ উপাধি প্রাপ্ত হন। তৎকালমধ্যে বাঙ্গালীর অল্পমাত্র অনুধাবন করিয়াছিলেন এবং বোধ হয়, সংস্কৃতে তিনি অভিজ্ঞ নহেন।'

রাজেন্দ্রলাল গল্প রচনায় এবং বাংলা ভাষায় অধিকারের ভূয়সী প্রশংসা করেও সংস্কৃত সাহিত্যে বঙ্কিমের জ্ঞান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সংশয় প্রকাশ করেছেন। কিন্তু দুর্গেশনন্দিনীতে ইংরেজি রচনাবিন্যাসের লক্ষণ যথেষ্ট থাকলেও দ্বিতীয় উপন্যাস কপালকুণ্ডলায় বঙ্কিমচন্দ্রের সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের নিদর্শনও প্রচুর। কপালকুণ্ডলার নামকরণ বা চরিত্র-পরিকল্পনায় সংস্কৃত প্রভাবের সুস্পষ্ট লক্ষণ ছাড়াও উপন্যাসের বিভিন্ন পরিচ্ছেদের শীর্ষে সংস্কৃত কাব্যনাটক থেকে উদ্ধৃতি তাঁর সংস্কৃত ও ইংরেজি কাব্যে অনুরাগ এবং বহুপঠনশীলতার পরিচয় দেয়। রঘুবংশ থেকে তিনটি উদ্ধৃতির মধ্যে 'দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী' নবকুমারের আবৃত্তির ফলে সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকের কাছেও সুপরিচিত হয়েছে। এ ছাড়া প্রথম খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদে এবং চতুর্থ খণ্ডের নবম পরিচ্ছেদের শ্লোক দুটি যথাক্রমে রঘুবংশের ষোড়শ[২] এবং অষ্টম সর্গ থেকে নেওয়া হয়েছে। শকুন্তলা নাটক থেকে উদ্ধৃতি আছে প্রথম খণ্ডের নবম পরিচ্ছেদের শীর্ষে; মেঘদূত থেকে আছে একবার, দ্বিতীয় খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদে কপালকুণ্ডলার দ্বিতীয় খণ্ড দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে মতিবিবির রূপ—'আবার কখনও লোলাপাঙ্গে ক্রূর কটাক্ষ'—যেন মেঘমধ্যে বিদ্যুদ্দাম', মেঘদূতের 'লোলাপাঙ্গৈর্যদি ন রমসে লোচনৈর্বঞ্চিতোঽসি' মনে করিয়ে দেয়। মেঘ-বিদ্যুতের উপমা মেঘদূত-স্মৃতি থেকে আহৃত বলেই মনে করি। কুমারসম্ভব থেকে শ্লোক তুলেছেন দুবার, দ্বিতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে এবং চতুর্থ খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে; রত্নাবলী থেকে দুবার, প্রথম খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে এবং তৃতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে। এই কয়টি সুপরিচিত সংস্কৃত সাহিত্যগ্রন্থ ছাড়া 'উদ্ধবদূত' নামক শ্লোকসংগ্রহ থেকে তিনি দুবার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এবং তৃতীয় খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে। উদ্ধবদূতের উদ্ধৃতি একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য আকর্ষণ করে। কেননা উদ্ধবদূত বহুপঠিত বা বহুজ্ঞাত রচনা নয়। উদ্ধবসন্দেশ রূপ গোস্বামীর রচনা বটে,

১ রহস্যসন্দর্ভ ১৯২৭ সংবৎ, ৫৭ খণ্ড, পৃ ১৪২

২ রঘুবংশের 'বিভর্ষি চাকারমনির্বৃতানাং' মৃণালিনীর আখ্যাপত্রেও ব্যবহৃত।

কিন্তু উদ্ধবদূতের কবি মাধব শর্মা।[১] শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত হেবারলিনের কাব্য-সংগ্রহে (১৮৪৭) উদ্ধবসন্দেশের ১৩৮টি এবং উদ্ধবদূতের ১৪১টি শ্লোক সংগৃহীত আছে। বঙ্কিমচন্দ্র সম্ভবত হেবারলিনের কাব্যসংগ্রহই পড়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পরিবারে গৃহদেবতা ছিলেন রাধাকৃষ্ণ। এই বৈষ্ণব পরিবারে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য সমাদৃত ছিল, তার একটি নিদর্শন ইতিপূর্বেই দেওয়া হয়েছে। পদাঙ্কদূতের আবৃত্তি করতে তিনি ভালোবাসতেন। জয়দেবের গীতগোবিন্দ তিনি যে কপালকুণ্ডলা রচনার পূর্বেই পড়েছিলেন তা অনুমান করা যায় চতুর্থ খণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদের নামকরণে—'কৃতসঙ্কেতে'। এটা স্পষ্টতই গীতগোবিন্দের পঞ্চম সর্গের—'নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃদু বেণুম্' থেকে গৃহীত। জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে জয়দেবের প্রভাব সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা বিরূপ হলেও জয়দেবের কাব্যের প্রভাব বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের রচনার গভীরে প্রবেশ করেছিল, এ সম্বন্ধে যথাসময়ে আলোচনা করব।

বঙ্কিমের রচনায় বিশেষ প্রভাব দেখা যায় কালিদাসের। কালিদাসের শকুন্তলা চরিত্র যে কপালকুণ্ডলার পশ্চাৎপটে ছিল এ বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। কপালকুণ্ডলার অধিকারীর আশ্রয় থেকে বিদায় নেওয়ার অধ্যায়ে কণ্বের উক্তির প্রয়োগে সেটা আরও সুস্পষ্ট হয়েছে। অবশ্য শুধু তপোবনপালিতা শকুন্তলা নয়, দ্বীপবাসিনী মিরাণ্ডার কল্পনাও এর সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। তবে নায়িকার বিচিত্র নামকরণে ভবভূতির মালতীমাধব ছিল নিশ্চিতই। মালতীমাধবের সঙ্গে কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের আর বিশেষ মিল নেই। অঘোরঘণ্টের শিষ্যা কপালকুণ্ডলা মালতীকে অপহরণ করেছিল। মালতীমাধব নাটকে শ্মশানচিত্র আছে, 'করালা' নামে চামুণ্ডার পূজার অনুষ্ঠান আছে সেখানে। হয়তো বঙ্কিমচন্দ্র কালীপূজা এবং তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা সেখান থেকেই পেয়ে থাকবেন। তবে সেকাল-প্রচলিত আর-একটি নাটকের উল্লেখও অকারণ হবে না। কৃষ্ণ মিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের তৃতীয় এবং পঞ্চম অঙ্কে কাপালিক-প্রসঙ্গ আছে। সেখানেও কাপালিক চরিত্র পাঠকের মনে কোনো শ্রদ্ধা জাগায় না, তার আচরণ ও ধর্মবিশ্বাসও মিথ্যা আত্মপ্রবঞ্চনা বলে ধিকৃকৃত। ঈশ্বর গুপ্তের বোধেন্দুবিকাস প্রবোধচন্দ্রোদয়ের অনুবাদরূপে প্রচলিত ছিল; সেই সূত্রেও এই নাটকটির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় থাকা ছিল খুবই স্বাভাবিক।

১ কেউ কেউ উদ্ধবসন্দেশ এবং উদ্ধবদূতকে অভিন্ন অথবা একই ব্যক্তির রচনা বলে মনে করেন। কিন্তু জীব গোস্বামী রূপ গোস্বামী-কৃত রচনার যে-তালিকা দিয়েছেন তাতে উদ্ধবদূতের নাম নেই, উদ্ধবসন্দেশের নাম আছে। রূপের রচনা-তালিকার জন্য দ্রষ্টব্য সুশীলকুমার দে, *Early History of Vaisnava Faith and Movement* (1942) পৃ ১১৩-১১৪।

বঙ্গদর্শনের প্রকাশের সময় থেকেই সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে বঙ্কিমের পরিচয় বিস্তৃত-ক্ষেত্রে দেখা গেল—উপন্যাসে এবং প্রবন্ধে। প্রবন্ধে তিনি প্রাচীন সাহিত্য-সমালোচনায় ব্যাপৃত হলেন। বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, সীতারামে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাব আছে। কালিদাস এবং ভবভূতি দুয়েরই প্রভাব প্রবল। প্রাচীন সাহিত্য-সমালোচনামূলক প্রবন্ধ তাঁর এই কয়টি—উত্তরচরিত (১২৭৯), প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত (১২৮০), বিদ্যাপতি ও জয়দেব (১২৮০), দ্রৌপদী (১২৮২), শকুন্তলা মিরন্দা এবং দেসদিমোনা (১২৮২)। এ ছাড়া গীতিকাব্যে (১২৮০) প্রসঙ্গক্রমে সংস্কৃত কাব্যের আলোচনা আছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সংস্কৃত সাহিত্যালোচনার সূত্রে স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা মনে পড়ে। দেখা যাচ্ছে, কালিদাসের প্রতি দুজনেরই অনুরাগ প্রগাঢ়, যদিও দুজনের আলোচনাপদ্ধতিতে পার্থক্য আছে। আবার রামায়ণের প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে পরিমাণ মনোযোগ, মহাভারতের প্রতি বঙ্কিমের মনোযোগ সেই পরিমাণেই। বঙ্কিম যেমন দ্রৌপদী চরিত্রের ব্যাখ্যা করেছেন, রবীন্দ্রনাথ তেমনি ব্যাখ্যা করেছেন রামায়ণের গৌণ নায়িকাদের। রবীন্দ্রনাথ 'রামায়ণী কথা'র ভূমিকা উপলক্ষে ভারতীয় জীবনে রামায়ণ মহাকাব্যের প্রভাব এবং উন্নত নৈতিক গার্হস্থ্য আদর্শের নিপুণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্র আদর্শ ঐতিহাসিক মানবকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বিশ্লেষণ করেছেন কৃষ্ণচরিত্রকে। রবীন্দ্রনাথ রাম এবং রামায়ণের প্রসঙ্গ পুনঃ পুনঃ বিভিন্ন উপলক্ষে নিয়ে আসতে ভালোবাসতেন। 'সাহিত্য' গ্রন্থে সংকলিত 'জাতীয় সাহিত্য' প্রবন্ধে তিনি রাম-চরিত্র অবলম্বনে জাতীয় মানস এবং জাতীয় সাহিত্যের বিবর্তন দেখিয়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্র তেমনি কৃষ্ণচরিত্র অবলম্বনে এই বিবর্তন-ধারার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন। অবশ্য মহাভারত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধাও সুবিদিত। মহাভারতকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'চরিত্রচিত্রশালা'। তথাপি বিরাট মহাকাব্যের পরিসমাপ্তি যে বৈরাগ্যের ভিতর দিয়ে হয়েছে, শিল্প হিসাবে আধুনিক মন যদি বা তাতে পরিতৃপ্তি নাও পেয়ে থাকে, তথাপি এই পরিণাম-কল্যাণেই ভারতীয় সাহিত্যের যথার্থ বৈশিষ্ট্য। মেঘদূত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা সর্বত্রই সেই বিচিত্র ভারতীয় মনের কল্যাণবোধ ক্রিয়াশীল। এমন-কি উত্তরকাণ্ড সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য—

'যে সোনার তরণী দীর্ঘকাল যুঝিয়া ঝড়ের হাত হইতে উদ্ধার পাইল, ঘাটের পাষাণে ঠেকিবামাত্র এক মুহূর্তে তাহা দুইখানা হইয়া গেল! গল্পের উপর যাহার কিছুমাত্র মমতা আছে সে কি এমন আকস্মিক উপদ্রব সহ্য করিতে পারে? যে বৈরাগ্যপ্রভাবে আমরা গল্পের নানাবিধ প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক বাধা সহ্য করিয়াছি,

সেই বৈরাগ্যই গল্পটির অকস্মাৎ অপঘাত মৃত্যুতে আমাদের ধৈর্য রক্ষা করিয়া থাকে।'[১]

বস্তুত রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাখ্যাই তাঁর সংস্কৃত সাহিত্যালোচনায় সর্বত্রই অব্যাহত। ভারতীয় মনটিকে তিনি অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে দেখতে পেয়েছিলেন এবং একই সূত্রে তিনি প্রাচীন সাহিত্যের বিভিন্ন প্রবন্ধে ঐক্য রক্ষা করেছেন। এদিক দিয়ে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথও প্রাচীন সাহিত্যালোচনায় তত্ত্ব সন্ধান করেছেন। শকুন্তলার দুঃখভোগকে বলতে হয়েছে তপস্যা, দুষ্মন্তের অনুশোচনাও সেই তপস্যা।[২] শকুন্তলা বা উমার বাসনাবেগ যথাকালে মথিত হয়ে অবশেষে কল্যাণবোধে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গ্যেটের সুবিখ্যাত উক্তিটি স্বভাবতই এই ব্যাখ্যায় দীপবর্তিকার মতো কাজ করেছিল। রবীন্দ্রনাথের ভোগ ও ত্যাগের সামঞ্জস্য-সাধন-ব্যাখ্যাটি কিন্তু 'কুমারসম্ভব'-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র আগেই সংকেতিত করেছিলেন[৩]—

'শারীরিক ভোগাতিশয্যই দূষ্য ; নচেৎ পরিমিত শারীরিক সুখ সংসারের নিয়ম, সংসার রক্ষার কারণ, ঈশ্বরাদিষ্ট এবং ধর্মের পূর্ণতাজনক। এই শারীরিক এবং পারত্রিকের পরিণয় গীত করাই কুমারসম্ভব কাব্যের উদ্দেশ্য। পার্থিব পর্বতোৎপন্ন উমা শরীররূপিণী, তপশ্চারী মহাদেব পারত্রিক শান্তির প্রতিমা। শান্তির প্রাপণাকাঙ্ক্ষায় উমা প্রথমে মদনের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু নিষ্ফল হইলেন।'

কিন্তু এটা তত্ত্ব ; বঙ্কিমের ভাষায় 'এই কাব্যের তাৎপর্য অতি গূঢ়'। বঙ্কিমের কালিদাস-ভবভূতির আলোচনা কোনো তত্ত্বের আলোচনা নয়। বরং দ্রৌপদীর পঞ্চপতিত্বের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি নিষ্কাম তত্ত্বের ব্যাখ্যা এনেছিলেন। নতুবা বঙ্কিম সাহিত্যালোচনা করেছেন জীবনেরই মানদণ্ডে। বঙ্কিমের দুটি প্রবন্ধের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দুটি প্রবন্ধের তুলনা করলে এটা সহজেই বোঝা যায়। 'শকুন্তলা-মিরান্দা-দেসদিমোনা' প্রবন্ধের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'শকুন্তলা' এবং 'প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃতে'র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রামায়ণ-প্রবন্ধের উপসংহার-ভাগের তুলনায় দুটি দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ শকুন্তলা-চরিত্রসৃষ্টি এবং নাটকের গল্পবিন্যাসে একটি বিশিষ্ট বক্তব্যকে প্রমাণ করতে অতি মনোহর কাব্য ব্যাখ্যা করেছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু এতে নায়ক দুষ্মন্ত হয়েছেন ম্লান এবং গৌণ ; শকুন্তলারও সর্বাঙ্গীণ মানবিক অর্থাৎ মনস্তাত্ত্বিক

১ প্রাচীন সাহিত্য, 'কাদম্বরীচিত্র'

২ দুষ্মন্তের অনুশোচনাকে তপস্যা বলতে সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত দ্বিধা করেছেন। দ্রষ্টব্য Das Gupta & De. *A History of Sanskrit Literature, Classical Period,* Introduction.

৩ বিবিধ প্রবন্ধ 'প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত'

বিশ্লেষণ হয় নি। বঙ্কিমচন্দ্র মিরাণ্ডা এবং ডেসডিমোনার সঙ্গে তুলনায় দেশকালপাত্রগত যৌক্তিকতা ও বাস্তবতা বিচার করেই শকুন্তলার চরিত্র ব্যাখ্যা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র কবির কোনো ব্যক্তিগত অভিপ্রায়ের সন্ধান করেন নি। সেইজন্য বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাখ্যায় দুষ্মন্ত যথার্থ রাজসিক মহিমায় মহিমান্বিত।—

'দুষ্মন্তের চরিত্রগৌরবে ক্ষুদ্রা শকুন্তলা এখানে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। ফর্দিনন্দ বা রোমিও ক্ষুদ্র ব্যক্তি, নায়িকার প্রায় সমবয়স্ক, প্রায় সমযোগ্য অকৃতকীর্তি—অপ্রথিতযশাঃ কিন্তু সসাগরা পৃথিবীপতি মহেন্দ্রসখ দুষ্মন্তের কাছে শকুন্তলা কে? দুষ্মন্ত-মহাবৃক্ষের বৃহচ্ছায়া এখানে শকুন্তলা-কলিকাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।··· এ প্রণয়সম্ভাষণ নহে—রাজক্রীড়া, পৃথিবীপতি কুঞ্জবনে বসিয়া সাধ করিয়া প্রেম-করারূপ খেলা খেলিতে বসিয়াছেন; মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় শকুন্তলা-নলিনীকোরককে শুণ্ডে তুলিয়া, বনক্রীড়ার সাধ মিটাইতেছেন, নলিনী তাহাতে ফুটিবে কি?'

বঙ্কিমচন্দ্রের এই ব্যাখ্যার উপলক্ষ দুষ্মন্তের মুখের একটি উক্তি—'ননু কমলস্য মধুকরঃ সন্তুষ্যতি গন্ধমাত্রেণ।' এটি কিন্তু প্রচলিত শকুন্তলার দেবনাগরী সংস্করণে নেই, বঙ্গীয় সংস্করণে আছে।[১] বঙ্কিমচন্দ্র শকুন্তলার আলোচনায় দেবনাগরী সংস্করণ ব্যবহার করেন নি, বঙ্গীয় সংস্করণের পাঠই ব্যবহার করেছিলেন। যে-সব উক্তির সাহায্যে তিনি শকুন্তলা এবং দুষ্মন্তের চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন, তার অধিকাংশই শুধু বঙ্গীয় পাঠেই লভ্য। যেমন তৃতীয় অঙ্কের শকুন্তলার উক্তি 'অদ্ধপথে স্মুমরিঅ এদস্স হত্থব্ভংসিণো মিণালবলঅস্স কদে পড়িণিবুত্তহ্মি' দ্বারা শকুন্তলার 'কেবল লুকোচুরি—একটু একটু চাতুরী' দেখিয়েছেন। তেমনি 'স্ত্রীণামশিক্ষিতপটুত্বম' অপবাদ শুনে 'শকুন্তলা ক্রোধে, দম্ভে, পূর্বের বিনীত, লজ্জিত, দুঃখিত ভাব পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "অনার্য, আপনার হৃদয়ের ভাবে সকলকে দেখ?" তখন তদুত্তরে রাজা রাজার মত, বলিলেন, "ভদ্রে, দুষ্মন্তের চরিত্র সবাই জানে", তখন শকুন্তলা ঘোর ব্যঙ্গে বলিলেন—

তুহ্মে জ্জেব পমাণং জানধ ধম্মত্থিদিঞ্চ লোঅস্স
লজ্জাবিণিজ্জিদাও জাণন্তি ণ কিম্পি মহিলাও॥'—৫ম অঙ্ক

১ খুব সম্ভবত বঙ্গীয় পাঠের ব্যবহার বঙ্কিমের উদ্দেশ্য-প্রণোদিত নয়। তিনি বাড়িতে পণ্ডিতের কাছে সংস্কৃত পড়তেন। টোলে সেকালে বঙ্গীয় পাঠই প্রচলিত ছিল। মনিয়র উইলিয়মস শকুন্তলার সংস্করণে (১৮৫৩) উত্তর ভারতে প্রচলিত নাগরী পাঠ ব্যবহার করেন। তৎপূর্বে করেন জোন্‌স্‌। প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ বাংলা দেশের পাঠ-সম্বলিত বঙ্গাক্ষরে শকুন্তলার সম্পাদনা করেন ১৭৬১ শকাব্দে=১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এবং দেবনাগরী অক্ষরে কাউএলের ভূমিকা-সহ সম্পাদনা করেন ১৭৮১ শকাব্দে=১৮৬০ খ্রীঃ।

—শকুন্তলার এই উক্তিও বঙ্গীয় সংস্করণের পাঠ। আবার রাজার দৃষ্টিতে শকুন্তলার বেদনাকাতর অথচ কঠোর মূর্তির বর্ণনাও বঙ্গীয় সংস্করণ থেকেই সংকলিত—

ন তির্যগবলোকিতং, ভবতি চক্ষুরালোহিতং
বচোঽতিপরুষাক্ষরং ন চ পদেষু সংগচ্ছতে।
হিমার্ত ইব বেপতে সকল এব বিম্বাধরঃ
প্রকামবিনতে ভ্রুবৌ যুগপদেব ভেদং গতে ॥—৫ম অঙ্ক।

মিরাণ্ডা এবং ডেসডিমোনার সঙ্গে তুলনায় বঙ্কিমচন্দ্র শকুন্তলা চরিত্রের নিজস্ব বিশিষ্টতা দেখাবার জন্য যে সব উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, সেগুলি নিঃসন্দেহে চরিত্রদ্যোতক। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যালোচনা-পদ্ধতিতে শেক্সপীয়রীয় জীবনাভিজ্ঞান বা 'অবজেকটিভিটি' দ্বারাই প্রভাবান্বিত হয়েছেন।

এখানেই রবীন্দ্রনাথের পদ্ধতির সঙ্গেও তাঁর অমিল ঘটবে। 'প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত' প্রবন্ধে বঙ্কিমের বক্তব্য এই যে, কাব্যে মানবিক গুণ থাকলেই সহৃদয়তা জন্মে। দেবচরিত্রও মানবিক গুণসম্পন্ন না হলে লোকমনোরঞ্জন করে না। কুমারসম্ভব দেবচরিত্র-বর্ণনায় পূর্ণ; এজন্য তাকে গূঢ় বলেছেন এবং নিছক কবিত্বের দিক দিয়ে উচ্চ স্থান দিয়েছেন। কিন্তু সাহিত্যকে জীবনানুগামী হতেই হবে, এই মতে অচল-প্রতিষ্ঠ থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা করেছেন। অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'যাঁহারা বাস্তব সত্যের অনুসরণে ক্লান্তি বোধ করেন না, কাব্যকে যাঁহারা প্রকৃতির দর্পণমাত্র বলেন, তাঁহারা জগতে অনেক কাজ করিতেছেন—তাঁহারা বিশেষ ভাবে ধন্য হইয়াছেন—মানবজাতি তাঁহাদের কাছে অনেক ঋণী। অন্যদিকে যাঁহারা বলিয়াছেন "ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ", যাঁহারা পরিপূর্ণ পরিণামের মধ্যে সমস্ত খণ্ডতার সুষমা, সমস্ত বিরোধের শান্তি উপলব্ধি করিবার জন্য সাধনা করিয়াছেন তাঁহাদের ঋণও কোনোকালে পরিশোধ হইবার নহে।' বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর-চরিতের সমালোচনা-প্রসঙ্গে সাহিত্যকে বলেছেন 'স্বভাবানুকরণ'। এই জন্যই তিনি শকুন্তলা-চরিত্রকে যথার্থ মানবমনস্তত্ত্ব ও আচরণের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছেন। অপরন্তু রবীন্দ্রনাথ শকুন্তলার আলোচনা করতে গিয়ে দেখালেন, 'য়ুরোপীয় কবি সাংসারিক সত্যের নকল করিতেন—সংসারে ঠিক যেমন, নাটকে তাহাই ঘটাইতেন।'[১]

বঙ্কিমচন্দ্রের সুপরিচিত উত্তরচরিত-সমালোচনার পদ্ধতিও এই রকম। এটি বঙ্কিমচন্দ্রের—বাংলা সাহিত্যেরও, একটি শ্রেষ্ঠ সমালোচনা-প্রবন্ধ। রামচন্দ্র এবং সীতার অগাধ দাম্পত্য-প্রেমকে বঙ্কিমচন্দ্র ভবভূতির নিপুণ চরিত্রাঙ্কণ-বিশ্লেষণের দ্বারা

১ প্রাচীন সাহিত্য 'রামায়ণ'

উজ্জ্বল করে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথের কালিদাস-আলোচনার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের ভবভূতির-আলোচনার তুলনাতেও দুজনের পদ্ধতিগত বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরচরিত-সমালোচনার উপস্থিত উপলক্ষ ছিল নৃসিংহ মুখোপাধ্যায়-কৃত অনুবাদ।[১] বঙ্কিমচন্দ্র বস্তুত ভবভূতির নাট্যকৃতিত্বই আলোচনা করেছেন; বঙ্গানুবাদ যেখানে করতে হয়েছে সেখানে নৃসিংহচন্দ্রের অনুবাদই উদ্ধৃত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র উত্তরচরিত-সমালোচনায় সংস্কৃত আলংকারিকদের পদ্ধতি ইচ্ছাক্রমেই পরিহার করেছেন, এবং প্রবন্ধের উপসংহারে আধুনিক পাশ্চাত্য পদ্ধতিকে বিশ্লেষণ করে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। উত্তরচরিতের বিশ্লেষণে কাব্য এবং নাটকের প্রকৃতিগত পার্থক্য বারবার নির্দিষ্ট করে দেখিয়ে ঘটনাগত বাস্তবতা কার্যকারণ-পরম্পরা এবং চরিত্রগত স্বাতন্ত্র্য সংলাপে আচরণে কতটুকু হয়েছে, সেই দিকেই তার আলোচনা লক্ষীভূত। দেশকাল শিল্পীর শিল্পসৃষ্টিকে কতখানি নিয়ন্ত্রিত করে বাল্মীকির রামচন্দ্র ও ভবভূতির রামচন্দ্রের তুলনাতেও তার নির্দেশ আছে।) অথচ সেই সঙ্গে আছে বঙ্কিমের সহৃদয় রসানুভব। তৃতীয় অঙ্ক সম্বন্ধে তাঁর উক্তি—

'এই অঙ্কের অনেক দোষ আছে। ইহা নাটকের পক্ষে নিতান্ত অনাবশ্যক। নাটকের যাহা কার্য, বিসর্জনান্তে রাম সীতার পুনর্মিলন, তাহার সঙ্গে ইহার কোন সংস্রব নাই। বিশেষ ইহাতে রামবিলাপের দৈর্ঘ্য এবং পৌনঃপুন্য অসহ্য। তাহাতে রচনাকৌশলের বিপর্যয় হইয়াছে। কিন্তু সকলেই মুক্তকণ্ঠে বলিবেন যে, অন্য অনেক নাটক একেবারে বিলুপ্ত হয়, বরং তাহাও স্বীকর্তব্য তথাপি উত্তরচরিতের এই তৃতীয়াঙ্ক ত্যাগ করা যাইতে পারে না। কাব্যাংশে ইহার তুল্য রচনা অতি দুর্লভ।'[২]

বঙ্কিমচন্দ্র তৃতীয় অঙ্কের সংলাপ এবং সীতাচরিত্রমাধুর্য বিশ্লেষণ করে এর কাব্যরস চমৎকার বুঝিয়েছেন। কিন্তু তিনি কোনো তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করতে যান নি। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন তাঁর রচনায় কালিদাসের বক্তব্য তাঁর নাটকে কী ভাবে কল্পিত ঘটনা ও চরিত্র-সাহায্যে স্বতঃই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত তিনি উত্তরচরিতেরও উদাহরণ দিয়েছেন—

১ এই বইয়ের আখ্যাপত্র— উত্তরচরিত। / বাঙ্গালা অনুবাদ। / সংক্ষিপ্ত টীকা সমেত ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষার্থীদিগের ব্যবহারার্থ। / শ্রীনৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন / এম, এ, বি এল, / কর্তৃক প্রণীত / কলিকাতা / প্রাকৃত যন্ত্রে / শ্রীকালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা / মুদ্রিত। / পটলডাঙ্গা সেন ব্রাদার্স দিগের পুস্তকালয়ে / ও সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরীতে প্রাপ্য। মূল্য ৸৵০ আনা।

২ একই অভিমত তিনি প্রকাশ করেছেন 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধে নাটক ও কাব্যের পার্থক্য-নির্দেশ করতে গিয়ে।

'উত্তরচরিতেও প্রকৃতির সহিত মানুষের আত্মীয়বৎ সৌহার্দ্য এইরূপ ব্যক্ত হইয়াছে। রাজপ্রাসাদে থাকিয়াও সীতার প্রাণ সেই অরণ্যের জন্য কাঁদিতেছে। সেখানে নদী তমসা ও বসন্তবনলক্ষ্মী তাঁহার প্রিয়সখী, সেখানে ময়ূর ও করিশিশু তাঁহার কৃতকপুত্র, তরুলতা তাঁহার পরিজনবর্গ।'

উত্তরচরিত বঙ্কিমচন্দ্রের বিস্তৃত সংস্কৃত কাব্যসমালোচনা। এতখানি বিস্তৃতভাবে তিনি আর কোনো বইয়ের সমালোচনা করেন নি। কিন্তু বঙ্গদর্শনের যুগ থেকে বিভিন্ন প্রসঙ্গে তিনি প্রাচীন কবিদের উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন কবিদের মধ্যে কালিদাসকেই তিনি শ্রেষ্ঠ গণ্য করতেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবন-চরিতের এক জায়গায় তিনি কালিদাসকে 'ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কবি' বলে উল্লেখ করেছেন। উত্তরচরিতে তিনি কালিদাসের 'অতি প্রসিদ্ধ বর্ণনাশক্তি', 'অতুল উপমাপ্রয়োগে'র কথা বলেছেন। বীভৎস রসে কালিদাস সফল হন না, কিন্তু মধুরে কালিদাসের সমকক্ষ কেউ নেই। 'মধুরে কালিদাস অদ্বিতীয়—উৎকটে ভবভূতি'। বঙ্কিমচন্দ্র কুমারসম্ভব ও শকুন্তলার অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আলোচনা করলেও এবং রঘুবংশের বিস্তৃত ব্যাখ্যান না করলেও রঘুবংশ কাব্যখানি তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল বলে অনুমান করি। কমলাকান্তে এবং তাঁর উপন্যাসের বিভিন্ন স্থলে রঘুবংশের উদ্ধৃতি আছে। কপালকুণ্ডলার কথা আগেই বলা হয়েছে। বিষবৃক্ষেও নগেন্দ্রনাথের অনুশোচনাকালে গতপ্রাণা ইন্দুমতীকে স্মরণ করে বিখ্যাত অজবিলাপের পংক্তিগুলিই তার মনে এসেছে—'গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।' এই অজবিলাপ থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র অনুমান করেছেন রঘুবংশ কালিদাসের যৌবনের রচনা। অজবিলাপের 'ইদমুচ্ছ্বসিতালকং মুখং তব বিশ্রান্তকথং দুনোতি মাম্' এবং কুমারসম্ভবের 'গত এব ন তে নিবর্ততে স সখা দীপ ইবানিলাহতঃ' পাশাপাশি তুলে কমলাকান্ত বলছে অজের কান্না যৌবনের কান্না, রতিবিলাপে 'বুড়াবয়সের কান্না'। সেই প্রসঙ্গে আসতে গিয়ে কমলাকান্ত বলছে—

'তবে স্থির, বনে যাওয়া হবে না। তবে কি করিব? হিন্দুশাস্ত্রের বশবর্তী হইয়া কালিদাসও সর্বগুণবান্ রঘুগণের বার্ধক্যে মুনিবৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমি নিশ্চিত বলিতে পারি—কালিদাস চল্লিশ পার হইয়া রঘুবংশ লিখেন নাই।'[১]

১ কমলাকান্তের পত্র—'বুড়া বয়সের কথা'। প্রথম সংস্করণ কমলাকান্তের পত্রের এই অংশে রঘুবংশের প্রথম সর্গ থেকে মূল সংস্কৃত উদ্ধৃতি ছিল—শৈশবেভ্যস্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাং। বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তিনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাম্॥

রঘুবংশ কুমারসম্ভবের পূর্বের রচনা এ মত অবশ্য সর্বস্বীকৃত নয়। রঘুবংশের রচনাশৈলী অধিকতর পরিণত। রঘুবংশে নিছক সৌন্দর্য-রচনা নয়, মনুশাসিত সমাজের পরিণত নীতিবোধ প্রচ্ছন্ন বলে অনুমিত।

সীতারাম উপন্যাসের রাজা সীতারামের উচ্ছৃঙ্খল ভোগ এবং রাজ্যধ্বংসের সময়ে—

'নগরে শুনিলাম, রাজ্যের নাকি বড় গোলযোগ। আর তুমিই নাকি তার কারণ। টোলে টোলে শুনিয়া আসিলাম, ছাত্রেরা সব রঘুর উনবিংশের শ্লোক আওড়াইতেছে।'

সীতারামে গঙ্গারামের লালসার ইঙ্গিত করতে শরনিক্ষেপরত কামদেবের বর্ণনা কুমারসম্ভব থেকে উদ্ধৃত। কুমারসম্ভবের পঞ্চম স্বর্গ থেকে উমাজননীর 'পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলবং শিরীষপুষ্পং ন পুনঃ পতত্রিণঃ' উপমাটি বঙ্কিম-রচনায় কয়েকবারই ব্যবহৃত হয়েছে। তার মধ্যে একবার হয়েছে সীতারামের স্ত্রীচরিত্রের নমনীয়তার আভাস দেবার জন্য জয়ন্তীর উক্তিতে (৩।২২)। কিন্তু কুমারসম্ভবের রতিবিলাপটিও বঙ্কিম কয়েকবার কাজে লাগিয়েছেন। রাজসিংহের ব্যর্থ নায়িকা জেবউন্নিসার শোকাহত রূপকে তিনি কামবধূর কান্না দিয়েই ফুটিয়ে তুলেছেন—অথ সা পুনরেব বিহ্বলা বসুধালিঙ্গনধূসরস্তনী বিললাপ বিকীর্ণমূর্ধজা। আবার আনন্দমঠের উৎসর্গপত্রেও অত্যাগসহন বন্ধুর স্মৃতিতে উদ্ধৃত হয়েছে রতিবিলাপেরই কয়েকটি পংক্তি—'ক নু মাং ত্বদধীনজীবিতাং' বিনিকীর্য ক্ষণভিন্নসৌহৃদঃ। নলিনীং ক্ষতসেতুবন্ধনো জলসংঘাত ইবাসি বিদ্রুতঃ॥'

বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যনাটকের আরও অন্যান্য গ্রন্থের নাম করেছেন বিভিন্ন প্রসঙ্গে। তাদের মধ্যে কিরাতার্জুনীয়ম, বাসবদত্তা, রত্নাবলী, শিশুপালবধ এমন কি বিহ্লনের চৌরপঞ্চাশতেরও নাম আছে। কিন্তু উল্লেখের চেয়ে অধিকতর ব্যবহার নেই। অবশ্য মহাভারত নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে গবেষণা করেছিলেন তা ঐতিহাসিকের আলোচনার বস্তু। তেমনি গীতাও বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাকে কতখানি অধিকার করেছিল, সেটা ভিন্ন এবং বিস্তৃত আলোচনার বিষয়। বস্তুত বলা যেতে পারে উপনিষদ এবং বুদ্ধজীবন রবীন্দ্রনাথকে যেমন বিশেষ ভাবে আচ্ছন্ন করেছিল, বঙ্কিমকে তেমনি প্রভাবিত করেছিল মহাভারত। 'মহাভারতে যে একটা বিপুল কর্মের আন্দোলন দেখা যায়, তাহার মধ্যে একটি বৃহৎ বৈরাগ্য স্থির অনিমেষভাবে রহিয়াছে'—রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যটির অন্তর্নিহিত সত্যতাই বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র চিন্তা-ধ্যানকে প্রভাবিত করেছিল বলেই নিষ্কাম কর্মব্রত ব্যাখ্যা করেই তাঁর জীবনের অর্ধাংশ কেটে গেছে।

কালিদাস-ভবভূতির কাব্যনাটক বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যবোধকে বিশেষ ভাবেই সমৃদ্ধ

করেছিল দেখা যায়। শুধুই সাহিত্যবোধ নয়, সাহিত্যসৃষ্টিতেও নানাভাবে এঁদের প্রভাব পড়েছে। তবে রবীন্দ্রনাথের কবিমানসে যে ভাবে পড়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের ঔপন্যাসিক মনে ঠিক সেভাবে পড়ে নি। রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যরসিক এবং সৌন্দর্যমুগ্ধ কবি। কালিদাসের কাব্যনাটকের ভাববস্তু তাঁর বহু কবিতার বিষয় হয়ে উঠেছে। মেঘদূত কাব্যখানি একটি বিশুদ্ধ সৌন্দর্যস্বর্গ বললেই হয়। মেঘদূত রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কবিতায় বিভিন্ন রচনায় নানাভাবে নবরূপ লাভ করেছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় মেঘদূতের সাক্ষাৎ তেমন পাই না। অশ্লীলতার সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র মেঘদূতের একটি শ্লোকের ব্যাখ্যা করেছিলেন ঈশ্বর গুপ্তের জীবনচরিতে। মধ্যে শ্যামঃ স্তন ইব ভুবঃ শেষবিস্তারপাণ্ডুঃ (পূর্বমেঘ, ১৮)—এই বর্ণনাকে তিনি 'সন্তানের চক্ষে মাতৃস্তন' বলে এর অশ্লীলতা অস্বীকার করেছিলেন। বিশুদ্ধ কাব্যরসাস্বাদনের পক্ষে নীতি-দুর্নীতির প্রশ্ন অবান্তর। বঙ্কিমচন্দ্র শুধু কাব্যরসের জন্যই সংস্কৃত কাব্যের ব্যবহার করেন নি। সেইজন্যই মেঘদূতের উল্লেখ অপেক্ষাকৃত অল্প।[১] কিন্তু নিছক সৌন্দর্যচর্চা ছাড়াও জীবনবাণীও কালিদাসের ছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তার দ্বারা অনুপ্রেরিত ছিলেন। ভবভূতির উত্তরচরিতেরও গূঢ় প্রভাব তাঁর মধ্যে ছিল। কালিদাসের প্রেমের আদর্শ দুঃখ ও তপস্যার দ্বারা পরিশুদ্ধ; সে-প্রেম বিবাহিত প্রেম। শকুন্তলার প্রেমের পূর্ণতা এবং কুমারসম্ভবে উমার প্রেমের ইয়েষ কর্তুমবন্ধ্যরূপতাং যেমন, ভবভূতির উত্তরচরিতের দাম্পত্য প্রেমের গভীরতা তেমনি বঙ্কিমকে মুগ্ধ করেছিল।

কালিদাসের কল্পনার মতোই রূপমোহের ব্যর্থতাও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-কল্পনার একটি মৌলিক সূত্র। নগেন্দ্রনাথের রূপমোহের অনর্থকতা দিয়ে সূর্যমুখীর গভীর পতিপ্রাণতা সার্থকতা অর্জন করেছে। উত্তরচরিতের সমালোচনা এবং বিষবৃক্ষ উপন্যাস রচনা প্রায় একই সময়ের। রামচন্দ্র-সীতার সংসার নানা অবস্থাবিপর্যয়ে বিপর্যস্ত হয়েছে সত্য, কিন্তু উভয়ের ভালোবাসা উত্তরোত্তর সীমাহীন অনুযোগহীন গভীরতায় স্তব্ধ হয়ে গেছে। সমগ্র উত্তরচরিত নাটকখানাই দাম্পত্য প্রেমের একটি অম্লান আদর্শের চিত্র। ভবভূতির নাটকের আলেখ্যদর্শনে এই প্রেম অভিব্যঞ্জিত। এই কল্পনার সূত্র ছিল কালিদাসের রঘুবংশের একটি শ্লোকে—

তয়োর্যথা প্রার্থিতমিন্দ্রিয়ার্থানাসেদুষোঃ সদ্মসু চিত্রবৎসু।
প্রাপ্তানি দুঃখান্যপি দণ্ডকেষু সঞ্চিন্ত্যমানানি সুখান্যভূবন ॥

—১৪।২৫

১ সীতারাম উপন্যাসে উড়িষ্যার শিল্পকলায় নারীমূর্তি দেখে বঙ্কিমের মনে এসেছে মেঘদূতের যক্ষবধূর বর্ণনা। কপালকুণ্ডলায় পরিচ্ছেদশীর্ষে উদ্‌ধৃতির কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

বিষবৃক্ষ উপন্যাসের চৌত্রিশতম অধ্যায়ে কয়েকটি দাম্পত্য প্রেমের চিত্র আছে।[১] সূর্যমুখী গৃহ ত্যাগ করে গিয়েছে। শয়নকক্ষের দেয়ালে দেশীয় চিত্রকরের আঁকা চিত্রগুলি নগেন্দ্রনাথের মনে নিয়ে আসছে তাদের দাম্পত্য জীবনের করুণ মধুর, আনন্দেকৌতুকে মেশানো দিনগুলি। 'কয়খানি চিত্র কক্ষপ্রাচীর হইতে বিলম্বিত ছিল। চিত্রগুলি বিলাতী নহে।' এই ছবিগুলি সংস্কৃত সাহিত্যের বিবাহিত প্রেমের অমর কাহিনী অবলম্বনে আঁকা। কুমারসম্ভবের শরত্যাগোদ্যত মদন, প্রণামরতা উমা, ধ্যানমগ্ন মহাদেব, রঘুবংশের লঙ্কা থেকে প্রত্যাবর্তনকালে বিমান-পথে রামচন্দ্র-সীতা, মহাভারতের সুভদ্রাহরণ, রত্নাবলী নাটকের সাগরিকাবেশী রত্নাবলী, দুষ্মন্তের প্রতি প্রেমমুগ্ধা শকুন্তলা, উত্তরার নিকট অভিমন্যুর বিদায়গ্রহণ, সত্যভামার তুলাব্রত—সংস্কৃত সাহিত্য থেকে গৃহীত এই বিষয়গুলি সেই প্রেমেরই মহিমা প্রকাশ করছে যে-প্রেম বিবাহে কল্যাণসমাপ্তি লাভ করে।

কপালকুণ্ডলা এবং মৃণালিনীর পশুপতি-মনোরমার কাহিনী পর্যন্ত দম্পতি-জীবনের সার্থকতা অচরিতার্থ। কিন্তু বিষবৃক্ষের রচনাকাল থেকেই গার্হস্থ্য জীবনের দাম্পত্য-প্রেমের আদর্শ নানাভাবেই বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রভাবিত করেছে। যে-প্রেম দুঃখের দ্বারা পরীক্ষিত নয়, কেবল রূপমোহের দ্বারাই জাগরিত সে-প্রেমের দৃঢ়ভিত্তিও অনিশ্চিত। কালিদাসের প্রেমের আদর্শও পরীক্ষিত দাম্পত্য প্রেমেরই আদর্শ; মোহ সেখানে ধিক্কৃত। মোহবুদ্ধি থেকে জেগে উঠেই প্রেম আপনাকে অনুভব করে। শকুন্তলা কুমারসম্ভবে এটাই কালিদাসের বক্তব্য। হয়তো বিষবৃক্ষে নগেন্দ্রনাথের মোহাবসানে সূর্যমুখীকে নতুন করে ফিরে পাওয়াতে সেই বক্তব্যই নতুন রূপ লাভ করেছে; যদিও নিষ্পাপ কুন্দের আত্মবলিদান একটি শাশ্বত কল্পনার অমর সৃষ্টি হয়ে রইল। চন্দ্রশেখর উপন্যাসটি সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের শকুন্তলা-প্রসঙ্গে প্রযুক্ত একটি উক্তিকে ব্যবহার করা যায়—

'শকুন্তলার শেষ অঙ্ক, নাটকের কাব্যরীতি অনুসারে নহে, তদপেক্ষা গভীরতর নিয়মের প্রবর্তনায় উদ্ভূত হইয়াছে।'

রবীন্দ্রনাথ-প্রদর্শিত কালিদাসের শকুন্তলা-নাট্যগঠনরীতির মতোই চন্দ্রশেখর

১ বিষবৃক্ষের এই পরিচ্ছেদের নাম 'স্তিমিত প্রদীপে'। রঘুবংশের ষোড়শ সর্গের চতুর্থ শ্লোক থেকে এই নামকরণ হয়ে থাকতে পারে—

অথার্ধরাত্রে স্তিমিতপ্রদীপে শয্যাগৃহে সুপ্তজনে প্রবুদ্ধঃ।
কুশঃ প্রবাসস্থকলত্রবেষামদৃষ্টপূর্বাং বনিতামপশ্যৎ॥

স্মরণ করা যেতে পারে নগেন্দ্রনাথও স্তিমিত প্রদীপে অর্ধরাত্রেই সূর্যমুখীকে দেখেছিল।

উপন্যাসের গঠনও বিশিষ্ট। প্রায়শ্চিত্ত-দৃশ্যের থেকেই উপন্যাসের শেষাংশ 'গভীরতর নিয়মের প্রবর্তনায় উদ্ভূত'। শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত শকুন্তলার দুঃখব্রতেরই অনুরূপ। বস্তুত প্রতাপের সঙ্গে সাক্ষাতের পর শৈবলিনীর চরম ব্যর্থতা এবং অপরিসীম শূন্যতা চন্দ্রশেখরের সঙ্গে কল্যাণ-মিলনেই সমাপ্ত হল। চন্দ্রশেখরের উদাসীনতা এবং শৈবলিনীর বাল্যপ্রেমরোমন্থন—এই দুই দিক দিয়েই তাদের দাম্পত্য জীবনের সার্থকতায় বাধা ঘটেছিল। দুঃখের মধ্য দিয়ে সে-বাধা অপসারিত হল। চন্দ্রশেখরের শেষাংশটুকু নিয়ে পাঠকের সংশয় ঘোচে না। তার কারণ একদিকে আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যের সহযোগে জীবনের বাস্তবতা এবং ট্রাজেডিতে গভীর অনুরাগ, আবার অন্যদিকে কালিদাস-ভবভূতির দাম্পত্য প্রেমাদর্শের অন্তিম কল্যাণবোধে তার বিশ্বাস। সীতারাম উপন্যাসেও রূপমোহের নিদারুণ পরিণাম দাম্পত্য প্রেমকেও কলুষিত করেছে দেখি, আবার নন্দা ও রমার পতিপ্রাণতায় দেখি তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় আমরা সংস্কৃত সাহিত্যের বিবিধ ছায়া দেখেছি। এদের মধ্যে একটি কাব্যের প্রসঙ্গ আমরা এখনও বিশেষ আনি নি। গীতগোবিন্দ-রচয়িতা জয়দেব কান্ত পদাবলীর বাঙালী কবি বলেই বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে বিশিষ্ট আসন পেয়েছেন। তা না হলে কালিদাস ভবভূতির সঙ্গে জয়দেবকে তিনি সমশ্রেণীতে গণ্য করেন নি। বুদ্ধির বিচারে জয়দেবকে তিনি প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করতে পারেন নি। বঙ্গদর্শন প্রকাশের আগেই ইংরেজি প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন[১]—

From the beginning to the end it [গীতগোবিন্দ] does not contain a single expression of manly feeling—of *womanly* feeling there is a great deal—or a single elevated sentiment. The poet has not a single new truth to teach.

গীতগোবিন্দ যে-দেশের এবং যে-কালের রচনা তার সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য—

'এই উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, নিশ্চেষ্ট, গৃহসুখপরায়ণ চরিত্রের অনুকরণে এক বিচিত্র গীতিকাব্য সৃষ্ট হইল। সেই গীতিকাব্যও উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, ভোগাসক্ত, গৃহসুখপরায়ণ। সে কাব্যপ্রণালী অতিশয় কোমলতাপূর্ণ, অতি সুমধুর দম্পতী প্রণয়ের শেষ পরিচয়।'

জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্য হিসাবে অত্যন্ত মধুর। কিন্তু সে-কাব্য 'রাধাকৃষ্ণের বিলাসপূর্ণ'। বঙ্কিমচন্দ্র জয়দেবকে দেখছেন ভিন্নতর পরিপ্রেক্ষিকায়। এই জন্য

১ A Popular Literature of Bengal, 1870

মধুর হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কাব্য জাতীয় স্বাস্থ্যের পরিচায়ক নয়। মৃণালিনী (১৮৬৯) রচনাকাল থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশের ইতিহাস এবং বাঙালী জাতির অতীত চিন্তা করে আসছিলেন। তাঁর চিন্তায় দেশপ্রেম ছিল কিন্তু দেশগৌরববোধ তখনও দেখা দেয় নি। সপ্তদশ অশ্বারোহী গৌড় জয় করেছে, এই কাহিনী দীর্ঘকাল তাঁকে পীড়া দিয়ে এসেছে। বাঙালী চরিত্রের বলিষ্ঠতার অভাবই এর কারণ। 'বাঙ্গালীর বাহুবল' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর বলিষ্ঠতার অভাবের জন্য দায়ী করেছেন এদেশের ভৌগোলিক প্রকৃতিকে। 'মৃণালিনী' উপন্যাসের রাজা লক্ষ্মণসেনকে দেখা গেল নিরুদ্যম এবং গৃহসুখপরায়ণ। পারিষদবর্গও তদনুরূপ। সভায় সভাপণ্ডিত দামোদর শত্রু আক্রমণের সম্ভাবনা শুনে বললেন, তুরকীয়েরা যে গৌড় জয় করবে, এটা শাস্ত্রেই আছে। তবে যুদ্ধোদ্যমের প্রয়োজন কি? মাধবাচার্য স্বচক্ষে শাস্ত্রবচন দেখতে চাইলে দামোদর একটি শ্লোক শোনাতে উদ্যত হলেন। মাধবাচার্য বললেন—

'গৌড়েশ্বরের সভাপণ্ডিত যে অনুষ্টুপ ছন্দে একটি কবিতা রচনা করিয়া থাকিবেন, ইহা কিছুই অসম্ভব নহে।'

এই শ্লোক-রচনায় পারদর্শী সভাপণ্ডিতের চরিত্র আঁকবার সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র যদি জয়দেবকেই স্মরণ করে থাকেন, তবে বিস্ময়ের কিছু নেই।

কিন্তু জয়দেবের মধুর কোমলকান্ত পদাবলীতে বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্ত যে ছিল ভরা, তার বহু চিহ্ন ছড়িয়ে আছে তাঁর বিভিন্ন রচনায়। কপালকুণ্ডলা-রচনাকালে গীতগোবিন্দের মধুর বাক্যখণ্ড ব্যবহৃত হয়েছিল পরিচ্ছেদের নামকরণে কিন্তু শ্লোকপংক্তি তিনি ব্যবহার করলেন বিষবৃক্ষে অসফল প্রেমের নায়িকা উন্মাদিনী হীরার মুখে—

স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারং।

বঙ্গদর্শনে 'বিষবৃক্ষ' প্রকাশের সময়ে তিনি 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধে জয়দেবের কাব্য আলোচনা করেন। তাতে জয়দেবকে তিনি দেখালেন ইন্দ্রিয়পরতা দোষের উদাহরণ হিসাবে।[১] 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধে তিনি জয়দেব-সৃষ্ট কৃষ্ণচরিত্র নিয়ে বিস্তৃততর আলোচনা করে বললেন —

'গীতগোবিন্দের শ্রীকৃষ্ণ' কেবল বিলাসরসে রসিক কিশোর নায়ক। সেই কিশোর নায়কের মূর্তি অপূর্ব মোহন মূর্তি, শব্দভাণ্ডারে যত সুকুমার কুসুম আছে, সকলগুলি

১ জয়দেবের কাব্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য তুলনীয়—'জয়দেবের' 'ললিতলবঙ্গলতা' ভালো বটে, কিন্তু বেশিক্ষণ নহে। ইন্দ্রিয় তাহাকে মন-মহারাজের কাছে নিবেদন করে, মন তাহাকে একবার স্পর্শ করিয়াই রাখিয়া দেয়, তখন তাই ইন্দ্রিয়ের ভোগেই শেষ হইয়া যায়।—কেকাধ্বনি, বিচিত্রপ্রবন্ধ

বাছিয়া বাছিয়া, চতুর গোস্বামী এই কিশোর কিশোরী রচিয়াছেন; আদিরসের ভাণ্ডারে যতগুলি স্নিগ্ধোজ্জ্বল রত্ন আছে, সকলগুলিতে ইহা সাজাইয়াছেন।'

'মানসবিকাশের' সমালোচনাতেও বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন[১]—

'জয়দেবাদির কবিতায়, সতত মাধবী যামিনী, মলয়সমীর, ললিতলতা কুবলয়দল শ্রেণী, স্ফুটিত কুসুম, শরৎচন্দ্র, মধুকরবৃন্দ, কোকিলকূজিতকুঞ্জ, নবজলধর এবং তৎসঙ্গে কামিনীর মুখমণ্ডল, ভ্রূবল্লী, বাহুলতা বিম্বোষ্ঠ, সরসীরুহলোচন, অলসনিমেষ, এই সকলের চিত্র, বাতোন্মথিত তটিনীতরঙ্গবৎ সতত চাকচিক্য সম্পাদন করিতেছে।'

জয়দেবের সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমতের পরিবর্তন খুব বেশি না হলেও সোজাসুজি বিরূপ কথাগুলি পরে বাদ দিয়েছেন।

কমলাকান্তের দপ্তরে 'একটি গীত' রচনাটিতে বৃদ্ধ কমলাকান্ত বাংলার প্রাচীন গৌরব স্মরণ করে আত্মহারা। গৌরবের চিহ্নগুলির অন্যতম ছিলেন জয়দেব। জাতীয় জীবনে তাঁর প্রভাব যাই হক, অথবা জাতীয় প্রকৃতিকে তিনি যেভাবেই প্রতিনিধিত্ব করে থাকুন জয়দেবের কাব্যের মাধুর্য বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাকে নানা ভাবেই প্রভাবিত করেছে। সেই সুমিষ্ট ভাষা, কোমল পদবিন্যাস, ছন্দের তরঙ্গ, তরল অনুপ্রাস-ঝঙ্কার বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পিমনকে যে আবিষ্ট করেছিল তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। তার চমৎকার প্রমাণ বিখ্যাত 'বন্দে মাতরম্' গানটি। এই গানটির রচনারীতি গীতগোবিন্দের রচনারীতিরই অনুরূপ।

পণ্ডিতেরা বলে থাকেন এবং রসিকেরাও স্বীকার করে থাকেন যে, গীতগোবিন্দের সংস্কৃত ভাষায় প্রাকৃত দেশীভাষার প্রভাব আছে। এর ছন্দবিন্যাস এবং শব্দসমাবেশ থেকে সেকথা অনুমান করা যায়। বিশেষত এই কাব্যের পংক্তিমিল এবং পর্বভাগ নিঃসন্দেহে প্রাকৃত প্রভাবজাত। এই প্রাকৃত-প্রভাবিত সংস্কৃত ভাষাতেই বন্দে মাতরম্ গানটি রচিত। এতে সংস্কৃত ভাষা এমনই শিথিলভাবে ভাবটিতে লগ্ন যে কয়েকটি পংক্তি পরেই রচনা পুরোপুরি বাংলাই হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের—

সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।

এবং

১ 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধটি অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে'র সমালোচনা উপলক্ষে লিখিত এবং 'বিবিধ সমালোচন' (১৮৭৬) গ্রন্থে সংকলিত। পরে এই প্রবন্ধটি 'বিবিধ প্রবন্ধে' বর্জিত। মানসবিকাশও তিনি গ্রন্থে সংকলিত করেন নি।

শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিতযামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্

—এই পংক্তিগুলির ধ্বনি কানে বাজিয়ে তোলে গীতগোবিন্দের—

ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে

দুয়েতেই অযুক্ত তরল ব্যঞ্জনধ্বনির অনুপ্রাস এবং সেই সঙ্গে চার মাত্রার পর্ববিন্যাস এই ধ্বনিসাদৃশ্য সৃষ্টি করে। বন্দে মাতরম্-এর পংক্তি কয়েকটি চারমাত্রার পর্বে বিভক্ত। তেমনি গীতগোবিন্দের পংক্তি—

ললিত ল / -বঙ্গল / -তাপরি / -শীলন / কোমল / মলয় স / -মীরে

জয়দেব-প্রবর্তিত চার মাত্রার ছন্দই পদাবলী সাহিত্যে চলে এসেছে। পদাবলীতে দীর্ঘস্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ সর্বত্র বজায় থাকে না ; কেবল মাত্রাগতসমতা অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টায় গড়ে উঠেছে ভাঙা জয়দেবী ছন্দ। বন্দে মাতরম্ এই ভাঙা জয়দেবীতেই রচিত।

শুধু বন্দে মাতরম্ গান রচনায় নয়, আনন্দমঠে গীতগোবিন্দের কাব্যপংক্তি অনেক বারই অনেকভাবে এসেছে। জয়দেবের ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী আনন্দমঠে সন্তানের মুখে সঙ্কেতের ভাষায় পরিণত—ধীরসমীরে তটিনীতীরে বসতি বনে বরনারী। জয়দেবের দশাবতার স্তোত্র সন্তানদের মুখে মুখে ফিরেছে ; শান্তি সারেঙ্গে সুর দিয়ে গেয়েছে জয়দেবেরই গান—

তব চরণপ্রণতা বয়মিতি ভাবয় কুরু কুশল প্রণতেষু।[১]

শান্তির প্রতি যখন জীবানন্দ মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়েছে তখন—

'অপ্সরোগণের ভ্রূবিলাসযুক্ত কটাক্ষের জ্যোতি লইয়া অতি যত্নে নির্মিত যে সম্মোহন শর, পুষ্পধন্বা তাহা পরিণীত দম্পতির প্রতি অপব্যয় করেন না।...'

—এই উক্তিও জয়দেবের আদিরসের ভাণ্ডার থেকেই নেওয়া—

ভ্রূপল্লবং ধনুরপাঙ্গতরঙ্গিতানি
বাণা গুণঃ শ্রবণপালিরিতি স্মরেণ।
তস্যামনঙ্গ-জয়-জঙ্গম-দেবতায়া-
মস্ত্রাণি নির্জিত জগন্তি কিমর্পিতানি॥

—৩। ১৩

আনন্দমঠ-রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র যেভাবে জয়দেবকে ব্যবহার করেছেন, আর কোন উপন্যাসে বঙ্কিম ঠিক সেই পরিমাণে অন্য কোনো সংস্কৃত কবিকে কাজে লাগান নি। যে-জয়দেব

১ আনন্দমঠ ৩য় খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ। গীতগোবিন্দ ১ সর্গ, ২৪ শ্লোক

সম্বন্ধে তিনি একদা প্রতিকূল মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন, সেই জয়দেবই বঙ্কিমকে এমনি করেই অধিকার করলেন। এ-কথাও অবশ্য মনে রাখতে হবে, সমগ্র আনন্দমঠের ঘটনার পটভূমি আসলে বীরভূম, অজয়তীর, এবং কেন্দুলি মেলা। সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের ইতিহাসের রঙ তিনি পরের সংস্করণে লাগিয়েছেন। সে-রঙও ভালো করে লাগে নি।

বঙ্কিমচন্দ্র কী এতই বদলে গেলেন? আনন্দমঠেরই একস্থলে সত্যানন্দের মুখে তিনি বলিয়েছেন—

'চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম নহেন—উহা অর্ধেক ধর্ম মাত্র। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু প্রেমময়—কিন্তু ভগবান কেবল প্রেমময় নহেন—তিনি অনন্তশক্তিময়। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু শুধু প্রেমময়—সন্তানের বিষ্ণু শুধু শক্তিময়। আমরা উভয়েই বৈষ্ণব—কিন্তু উভয়েই অর্ধেক বৈষ্ণব।'

তাই সন্তানরা জয়দেবের দশাবতার স্তোত্রের ঐশ্বর্যবান বিষ্ণুরই উপাসক, আবার যেখানে উজ্জ্বলরস সেখানেও ঘুরে ঘুরে এসেছে জয়দেবেরই মধুর কোমল কান্তপদ।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচিন্তা

> There is for each time, for each artist a kind of alloy required to make the metal workable into art, and each generation prefers its own alloy to any other.
>
> —T. S. Eliot.

সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে বাংলা সাহিত্যে গভীর আলোচনা বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম করেছিলেন একথা বললে অত্যুক্তি করা হবে না। এর একটা সাধারণ কারণ নির্দেশ করা যায় এই বলে যে সত্যকার সাহিত্যের সৃষ্টি হলে তবেই তার বিচার-পদ্ধতি এবং আস্বাদন-রীতির আদর্শ গড়ে উঠতে পারে। উৎকৃষ্ট সাহিত্য আস্বাদন থেকেই সাহিত্যের সৃষ্টিরহস্য জানবার ইচ্ছা জেগে ওঠে। যেখানে সাহিত্যের মহৎ নিদর্শন নেই, সাহিত্যের সমালোচনাও সেখানে নেই। সৃষ্টিতে বৈচিত্র্য না থাকলে সমালোচনাতেও গভীরতা ও বৈচিত্র্য আসে না। অ্যারিস্টটল যখন তাঁর বিখ্যাত সাহিত্য-শাস্ত্র রচনা করেছিলেন তখন তাঁর সম্মুখে আদর্শ ছিল মহাকাব্য এবং কয়েকটি নাটক। এদের উপর ভিত্তি করে অ্যারিস্টটল তাঁর সাহিত্যিক নীতি স্থির করেছিলেন। সাহিত্যিক আদর্শ উচ্চাঙ্গের বলেই অ্যারিস্টটলের সাহিত্যচিন্তায় গভীর অন্তর্দৃষ্টি আসা সম্ভব হয়েছিল। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্টত সাহিত্য-জিজ্ঞাসার সূত্রপাত করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর সম্মুখে সাহিত্যের কোন্ মহৎ দৃষ্টান্ত তিনি পেয়েছিলেন? সেকালের সাহিত্যের মধ্যে মধুসূদনের কাব্য ও নাটক, দীনবন্ধুর নাটক, রঙ্গলাল, ঈশ্বর গুপ্ত এবং হেমচন্দ্রের কবিতা—মোটামুটি এই ছিল তখনকার আধুনিক বাংলা সাহিত্য। ঈশ্বর গুপ্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র এবং দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী রচনা করতে গিয়ে তাঁদের সাহিত্যের বিস্তৃত আলোচনা বঙ্কিমচন্দ্র করেছিলেন সত্য; কিন্তু নির্বিশেষ সাহিত্য-সমালোচনা-মূলক প্রবন্ধে তিনি সেকালের বাংলা সাহিত্য থেকে বিষয় বা দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করেন নি। শেক্সপীয়রের নাটক, মিলটনের কাব্য, মহাভারত, কালিদাস ভবভূতির কাব্য নাটক—এক কথায় যাদের ক্ল্যাসিক বলে, বঙ্কিমচন্দ্র তাকেই একমাত্র সাহিত্যের নিকষ-পাষাণরূপে ব্যবহার করেছিলেন। মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যকেও তিনি এরকম আলোচনার মধ্যে আনেন নি। এর থেকেই বুঝতে পারা যাবে আমাদের মঙ্গলকাব্য, পাঁচালী কবিগানের ঐতিহ্যে লালিত বাঙালীর কাছে সাহিত্যের কোন মূল্যমান তিনি

নির্দেশ করতে চেয়েছিলেন। আমাদের কাছে তিনি সাহিত্যের উৎকৃষ্ট আদর্শকেই ধরে দিতে চেয়েছেন। যে যুগে বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠছে, সেই যুগেই প্রয়োজন সর্বোচ্চ আদর্শের।

আমাদের দীর্ঘ মধ্যযুগের সাহিত্যে বৈষ্ণব রচনা ছাড়া আর কোথাও রস-সমালোচনা বলে কিছু পাওয়া যায় না। বৈষ্ণব সাহিত্যেও রচনাপ্রক্রিয়া সম্বন্ধে স্পষ্টত কিছু নেই। কিন্তু রসোদ্রেকের পদ্ধতি নিয়ে তাঁদের আলাদা একটি রসশাস্ত্র গড়ে উঠেছিল। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য থেকে বৈষ্ণব সাহিত্য বিষয়বস্তু, রচনা-পদ্ধতি এবং লক্ষ্য—এসব দিক দিয়েই আলাদা হয়ে গেল। বৈষ্ণব সাহিত্য সাধারণ পাঠ্য সাহিত্য হিসাবে রচিত হয় নি। সুতরাং সাধারণ সাহিত্য-বিচার পদ্ধতি এতে প্রযুক্ত হয় নি। প্রাচীন অলঙ্কার শাস্ত্র থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করা হলেও বৈষ্ণব সাহিত্যের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। ধর্মভাবুকতা থেকে এই সাহিত্যের জন্ম। ধর্মের সীমা এবং লক্ষ্য থেকে এই সাহিত্য কখনও বিভিন্ন হয়ে যায় নি। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত নাটকই হক, ব্রজবুলি বা বাংলায় লেখা পদাবলীই হক—এই সাহিত্যের চরম লক্ষ্য হচ্ছে ভক্তিভাবের উদ্রেক। বৈষ্ণব ধর্মের অভিনবত্ব যেখানে, এই সাহিত্যের অভিনবত্বও সেখানে। গভীর অধ্যাত্মচিন্তা থেকে উৎপন্ন হলেও জীবনের কতকগুলি সুন্দর মধুর হৃদয়গ্রাহী বৃত্তিকেই সাধনার অঙ্গরূপে গ্রহণ করা হয়েছিল। এজন্য ঐহিকতার সঙ্গে অনৈহিক উপলব্ধির মিলন দিয়েই বৈষ্ণবের সাধনা এবং সাহিত্য। ঐহিক জীবনানুভূতি যতটুকু আছে, সাহিত্যের লক্ষ্য ততখানিই চরিতার্থ হয়েছে। সাহিত্য যখন রূপাতীতের চিন্তায় মগ্ন হয়, তখন বোধ হয় সাহিত্য তার লক্ষ্যকে অতিক্রম করে যায়। বৈষ্ণব সাহিত্যের বিষয় বৈষ্ণব ধর্মেরই বিষয়। মানব-হৃদয়ের কতকগুলি ভাবকে রসে পরিণত করবার প্রয়াসে বৈষ্ণব সাহিত্যের জন্ম হলেও এইসব বৃত্তির ঐহিক পূর্ণতা বৈষ্ণব ধর্মের অভিপ্রেত ছিল না। এই বৃত্তিগুলির সার্থক পরিণাম ছিল রসস্বরূপ কৃষ্ণের প্রতি গভীর ভক্তিভাবের উদ্রেক অর্থাৎ এই সাহিত্য ধর্মসাধনারই অঙ্গ। কীর্তন না হলে বৈষ্ণবের সাধনা পূর্ণ হয় না। ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃত সাহিত্যের ভাব এবং রসের শ্রেণীভাগকে বৈষ্ণবেরা গ্রহণ করলেন না। তাঁদের মতে রস পাঁচটি—শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য এবং মধুর। এই পাঁচটি রস নিয়ে পদাবলীর কাব্যোৎকর্ষ। ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃত সাহিত্যে স্বীকৃত হয়েছিল নয়টি রস এবং সঞ্চারী সহযোগে আরো কিছু গৌণ বৈচিত্র্য। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের পশ্চাৎপটে সমগ্রভাবে ভারতীয় মনোভাবের পরিচয় অব্যাহত থাকলেও বিশেষ কোনো ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণতা এতে নেই। কাব্যের লক্ষ্য মুখ্যত কখনও নির্বাণ বা মুক্তি ছিল না কিংবা বিশেষ কোনো ধর্মভাবের উদ্বোধনও ছিল না।

বাৎসায়নের গ্রন্থে কবি এবং রসিকের যে লক্ষণ বর্ণনা করা আছে, বলা বাহুল্য, কোনো ধর্মনিষ্ঠ বৈরাগ্যপ্রবণ চরিত্রের বর্ণনা সেটা নয়।

অবশ্য প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য সম্বন্ধে অধ্যাপক সুশীলকুমার দে যে কথা বলেছেন[১]—

It fosters in him a stoical resignation, an epicurean indifference and a mystic hope and faith which paralyse personal energy, suppress the growth of external life and replace originality by submission. On the other hand, this is exactly the atmosphere which is conducive to idealised creation and serenity of purely artistic accomplishment in which Sanskrit poetry excels,

সে কথাও সম্পূর্ণ অস্বীকার করবার উপায় নেই। এই সাহিত্যের বিচারপদ্ধতিও বৈদান্তিক বিচার-প্রণালীর অনুসরণে শেষ পর্যন্ত অলৌকিক রসাস্বাদনেই পাঠককে নিয়ে যায়। কাব্যরসের আস্বাদনকে ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর বলা হয়েছে—এ বর্ণনা নানা দিক দিয়েই ভেবে দেখবার মতো। বেদান্তে যাঁকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে, বৈষ্ণব দর্শনে তিনি রসস্বরূপ। এদিক দিয়ে বৈষ্ণব সাহিত্যশাস্ত্র এবং প্রাচীন কাব্যশাস্ত্র একই নীতিতে বদ্ধ এবং এসব দিক দিয়েই মৌলিক ভারতীয় দৃষ্টির বৈশিষ্ট্য সর্বত্রই সমুজ্জ্বল। রবীন্দ্রনাথ 'প্রাচীন সাহিত্য' বইটিতে পাশ্চাত্য এবং ভারতীয় কবির দৃষ্টির তুলনা করেছেন। ভারতীয় সাহিত্যে ট্র্যাজেডি ছিল না, তার কারণ বিশ্বের বৃহত্তর কল্যাণ-বোধে ভারতীয় কবির বিশ্বাস ছিল ধ্রুব। এই কল্যাণবোধকে জাগানো ছিল এদেশের সাহিত্যের লক্ষ্য। য়ুরোপীয় কবি সুদূর কল্যাণের চিন্তা না করে প্রত্যক্ষ বাস্তব জীবনের প্রতি নিবিড় মমতাকেই জাগাতে চেয়েছেন। অ্যারিস্টটল বহু প্রাচীন কালে অনুকরণের কথা বলে গিয়েছিলেন। অ্যারিস্টটল-এর সমালোচনার আদর্শ অনেক দিক দিয়ে পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হলেও এই সূত্রটিকে সাহিত্য সমালোচকেরা কখনোই বর্জন করেন নি। প্রকৃতির অনুকরণে সাহিত্য সৃষ্টি করতে গিয়েই খণ্ডিত জীবনের দুঃখ-চেতনা হয়েছে এমন মর্মান্তঃসঞ্চারী।

বৈষ্ণব সাহিত্য ছাড়া মধ্যযুগে আমাদের আর যে সাহিত্য ছিল, তার মধ্যে মঙ্গল-কাব্যের সার্থক কবি স্বভাবতই প্রাচীন অলংকারকেই প্রামাণ্য বলে মেনে নিয়েছেন। ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তাতে কাব্য নাটক এবং অলংকার অধ্যয়নের উল্লেখ আছে। মঙ্গলকাব্যের ঐশ্বর্যের যুগ অষ্টাদশ শতাব্দী। এ ঐশ্বর্য প্রাণের নয়, দেহের। ঈশ্বর গুপ্ত ভারতচন্দ্রের কাব্য সমালোচনা করতে গিয়ে

১ De and Dasgupta, *History of Sanskrit Literature*, 1947, p. 37.

বলেছিলেন,[১] 'পদ্যের দ্বারা ইঁহার পাণ্ডিত্য, বিদ্যা, পরিশ্রম এবং যত্নের ব্যাপার যত প্রকাশ পাইয়াছে, দৈবশক্তির পরিচয় তত প্রকাশ পায় নাই'। অষ্টাদশ শতাব্দীতে 'দৈবশক্তি' নয়, পাণ্ডিত্য, বিদ্যা, পরিশ্রম এবং যত্নই বড় হয়ে উঠল। সমালোচনা-শাস্ত্র আরম্ভ হয়েছিল অলংকার দিয়ে ; শেষ পর্যন্ত অলংকার ছাড়িয়ে কাব্যরসের মহত্তর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কিন্তু নামটা থেকেই গেল। ভারতচন্দ্রের যুগে কাব্যে আবার সেই অলংকারটাই বড় হল। এই রসহীন অলংকরণের আদর্শ মধুসূদনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে চলে এসেছে।

কিন্তু ভারতচন্দ্রই আবার বলে গিয়েছেন, 'যে হোক সে হোক ভাষা কাব্যরস লয়ে'। অর্থাৎ কাব্যরস সৃষ্টির জন্য ভাষার বাঁধাধরা রীতিকেও অতিক্রম করে যেতে তাঁর দ্বিধা নেই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতচন্দ্র এইটুকুই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। রঙ্গলাল 'পদ্মিনী উপাখ্যানে'র ভূমিকায় এই কাব্যরস নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। এই আলোচনায় রঙ্গলাল কাব্যের একটি মহৎ উদ্দেশ্য নির্দেশ করে দিলেন। মূলত তিনি এতে প্রাচীন আলংকারিকদের বক্তব্যকেই গ্রহণ করেছেন। অবশ্য এই আলোচনাতে তিনি একটি কথা স্বীকার করলেন, ঐতিহাসিক দিক থেকে যাকে অভিনব বলা যায়—

'ইংলণ্ডীয় বিশুদ্ধ প্রণালীতে যত বঙ্গীয় কাব্য বিরচিত হইবে, ততই ব্রীড়াশূন্য কদর্য কবিতাকলাপ অন্তর্ধান করিতে থাকিবে এবং তত্তাবতের প্রেমিক দলেরও সংখ্যা হ্রাস হইয়া আসিবে।'

রঙ্গলালের এই উক্তি অভিনব একাধিক কারণেই। ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে বীটন সোসাইটিতে পঠিত 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধে' তিনি দেশীয় কাব্যের প্রতি গভীর অনুরাগ প্রকাশ করেছিলেন। রঙ্গলালের কাব্যে আধুনিক বিষয়বস্তু এবং রুচির চিহ্ন ছড়িয়ে আছে, কারণ তিনি নিজে ইংরেজি-কাব্যরসিক ছিলেন ; কিন্তু আধুনিক নতুনতর মূল্যবোধ তিনি সৃষ্টি করতে পারেন নি। কাব্যের ছন্দে, অন্যান্য বহিরঙ্গ শিল্পকলায় এবং ভাবের দিক দিয়েও রক্ষণশীল মনোভাবের ফলে রঙ্গলাল কাব্যবিচারে কোনো নবীন চেতনার সঞ্চার করতে পারেন নি। সেই চেতনার সৃষ্টি করেছিলেন মধুসূদন।

মধুসূদন কবি ছিলেন, ভাবুক ছিলেন না। কাব্যের বিচার তিনি কখনই করতে যান নি। তাঁর নিজের রুচির কথাই অনেক চিঠিতে তিনি বলে গিয়েছেন। সেগুলি সাহিত্য-সমালোচনা নয়, তবু বাঙালী কবির দিক্‌পরিবর্তন এবং নতুন মূল্যবোধের দৃষ্টান্ত হিসাবে মধুসূদনের এই সাহিত্যিক উক্তিগুলি অবশ্যই বিচার্য—

As for the old school nothing is poetry to them which is not

১ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী, ১৯৫৮, পৃ ৪৪

an echo of Sanskrit—they have no notion of originality ; as for the new school, the poor devils don't know Bengali enough to understand what they read.

অন্য একটি চিঠিতে তিলোত্তমাসম্ভবের প্রসঙ্গে মধুসূদন লিখেছেন—

Some other Pundits, literary stars of equal magnitude, say—'হাঁ উত্তম উত্তম অলঙ্কার আছে। মন্দ হয় নি।'

মধুসূদন কাব্যের বহিরঙ্গ রূপরীতির উপরে কাব্যসৃষ্টির একটা নূতন রহস্যকে সে-কালের পাঠকের কাছে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন, এইসব উক্তিতে তার প্রমাণ আছে। প্রাচীন কাব্যসমালোচনা-পদ্ধতি দিয়ে যে নতুন যুগের কাব্যকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনা যাবে না, নতুন যুগের স্রষ্টা মধুসূদন সেটা বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু সাহিত্য-তত্ত্ব নিয়ে মধুসূদন কিছুমাত্র ব্যস্ততা প্রকাশ করেন নি। কারণ কোন রকম তত্ত্বই তিনি সহ্য করতে পারতেন না। মধুসূদন যা সৃষ্টি করেছিলেন কাব্যে, যার আভাস দিয়েছিলেন বিভিন্ন পত্রে, বঙ্কিমচন্দ্র শিল্পসৃষ্টিতে তাকেই অনুসরণ করেছিলেন, আর বিভিন্ন ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাত করলেন তাকেই।

অবশ্য একথা বলতেই হবে রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'বিবিধার্থসংগ্রহে' বাংলা গ্রন্থসমালো-চনার এক নতুন রীতির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ক্যালকাটা রিভিউতে নব্যবঙ্গের কেউ কেউ সাহিত্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মনীষী। কিন্তু তিনি মূলত ছিলেন ঐতিহাসিক। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে সাহিত্য ও দর্শনের প্রতি গভীর অনুরাগ সঞ্চারিত হলেও ইতিহাসচেতনাও তাঁদের মধ্যে খুবই প্রবল ছিল। 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'য় নব্যবঙ্গেরা বরং সাহিত্যের আলোচনাই কম করেছেন। সম-সাময়িক সমাজ এবং প্রাচীন ইতিহাসের আলোচনাই তাঁরা বেশি করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের মনীষীরা সকলেই নব্যবঙ্গ-প্রচলিত ইংরেজি শিক্ষাপদ্ধতি দ্বারা কোনো না কোনোভাবে প্রভাবিত ছিলেন। ভূদেব বা বঙ্কিম কেউ এর ব্যতিক্রম নন। ইতিহাসচর্চা আমাদের প্রথম দিক্‌কার শিক্ষার গোড়াপত্তনের যুগে চিন্তা এবং আলো-চনার যে ঋজুতা এবং বস্তু-নির্ভরতা এনে দিয়েছিল, পরবর্তী যুগে যাঁরা সাহিত্যের মতো কল্পনাসর্বস্ব বিষয়ের আলোচনা করেছেন তাঁরাও সেই ইতিহাসাশ্রিত বস্তুনির্ভর চিন্তা-পদ্ধতি থেকে মুক্তি পান নি। উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য, সাধারণভাবে বলতে গেলে, বস্তুগ্রাহ্য চিন্তাকল্পনারই সাহিত্য ; তার অন্যতম কারণ ছিল সেকালের স্পষ্ট এবং স্বচ্ছ চিন্তা করাবার শিক্ষাপদ্ধতি। রাজেন্দ্রলাল মিত্র স্বয়ং ঐতিহাসিক ছিলেন। সেইজন্য

'বিবিধার্থ সংগ্রহে'র সমালোচনাতে সর্বদাই ঐতিহাসিক পটভূমি এসে গিয়েছে। বেণী-সংহার নাটকের সমালোচনাতে[১] তিনি সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তি আলোচনা করেছিলেন। গ্রীক উদ্ভব তিনি অস্বীকার করেছেন। আবার 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকের সমালোচনাতে[২] রাজেন্দ্রলাল আলংকারিক পদ্ধতিই অবলম্বন করেছিলেন। তৎসত্ত্বেও এতেও ইতিহাসজ্ঞান এবং চরিত্র-বিচার গঠনকল্পনা-বিচার প্রভৃতি আধুনিক সমালোচনা পদ্ধতির চিহ্নও ছড়িয়ে আছে।

কিছুদিন বাংলা সাহিত্যে এই দ্বিধা চলেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এসে সেই দ্বিধা ঘুচিয়ে দিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র পুরোপুরি ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। রাজেন্দ্রলাল যেমন ছিলেন প্রধানত ঐতিহাসিক বঙ্কিমচন্দ্র তেমনি ছিলেন প্রধানত সাহিত্যিক। কিন্তু বঙ্কিমের সাহিত্য-ভাবনা সাহিত্যের দেশ-কালবিচ্ছিন্ন সৌন্দর্যের বিচার নয়। সাহিত্য-বিচারে ঐতিহাসিক পরিবেশের আলোচনা করে তিনি সাহিত্য-সমালোচনাকে স্পষ্ট করে তুলেছেন। এ দিক দিয়ে তিনি যথার্থই নব্যবঙ্গের অনুগমন করেছিলেন। কিন্তু নব্যবঙ্গেরা যা করেন নি বঙ্কিমচন্দ্র তাই করলেন—তিনি সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনায় অবতীর্ণ হলেন। অবশ্য একথা স্বীকার করতে হবে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনাও তেমন বিস্তীর্ণ ভাবে করেন নি। নিছক সাহিত্যের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ যেমন অন্তত পাঁচখানা গ্রন্থ রচনা করেছেন, সেই তুলনায় বঙ্কিমের দান খুবই কম। সাহিত্য বিষয়ে তাঁর রচনাগুলিকে এই কয়টি ভাগে ফেলা সম্ভব—১ জীবনী বর্ণনা-প্রসঙ্গে সাহিত্যালোচনা, ২. প্রাচীন সাহিত্যালোচনা, ৩. সমসাময়িক পুস্তক সমালোচনা, ৪. ধর্মতত্ত্বে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শিল্পসৃষ্টির রহস্য আলোচনা।

সাহিত্য-বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মতামত জানতে গেলে শুধু সাহিত্যিক প্রবন্ধগুলি পড়লেই চলবে না—বঙ্কিমচন্দ্রের মূল জীবনদর্শনের সঙ্গেও পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। জীবন ও সমাজ সম্পর্কে বঙ্কিমের যে দার্শনিক মতবাদ তাঁর ধর্মতত্ত্বে বা শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে প্রকাশ পেয়েছে, সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর চিন্তাও ছিল তারই একটা দিক। বঙ্কিম-মনীষার এই সুসংহত ঐককেন্দ্রিকতা সত্যই বিস্ময়কর। জীবনকে তিনি সমগ্র এবং অখণ্ডরূপেই দেখেছেন। তাঁর চিন্তা ও কর্ম, প্রবৃত্তি ও উদ্যোগ, সাধনা ও সাফল্য—যত বিচিত্রই হক, 'মানবতা' নামক একটি সুস্পষ্ট সত্তারই তারা প্রকাশ। সব কিছুর মধ্যে একটি চমৎকার সঙ্গতি বঙ্কিমচন্দ্র কল্পনা করেছিলেন। সাহিত্যকে তিনি মানুষের

১ বিবিধার্থ সংগ্রহ, ১৭৭৯ শক ভাদ্র, পৃ ১০০-১০৮

২ ঐ, ১৭৭৬ শক মাঘ, পৃ ২২৩-২৭১

অস্তিত্বের একটা অচ্ছেদ্য রূপবিকাশরূপে দেখেছেন। সাহিত্যরসকে অলৌকিক বলে লৌকিক জীবনের থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন নি; বৈষ্ণবের মতো নিগূঢ় ধর্মসাধনার সঙ্গে যুক্ত করে প্রাত্যহিক জীবনের থেকেও তিনি বিচ্ছিন্ন করে নেন নি। জীবনের অপূর্ণতার স্বপ্ন-পূরণ বলেও তিনি সাহিত্যকে বিলাস-গৌরব দেন নি। বস্তুত সাহিত্য মানুষের মনুষ্যধর্মেরই প্রকাশ। ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম সাহিত্যকে জীবনের অঙ্গীকৃত করলেন। সাহিত্য সামাজিক মানুষেরই সৃষ্টি। সমাজ-বিচ্ছিন্ন আত্মস্বাতন্ত্র্যের কল্পনাসর্বস্ব ভাবময় সৃষ্টি সাহিত্য নয়। এর দুটি দিকই বঙ্কিম বিভিন্ন স্থলে ব্যাখ্যা করেছেন। সমাজ এবং ব্যক্তি, কেউই অন্যনিরপেক্ষ নয়। সাহিত্য দুয়েরই মিলিত পরিণাম।

ধর্মতত্ত্বে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কল্পিত মানবধর্মের ব্যাখ্যা করেছেন। মানুষের সত্তাকে বঙ্কিমচন্দ্র তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন, জ্ঞানার্জনী, কার্যকারিণী এবং চিত্তরঞ্জিনী। এই তৃতীয়টি থেকেই যা কিছু সৌন্দর্য ও শিল্পসৃষ্টি। বঙ্কিম বলেছেন, বিশ্বব্যাপী চৈতন্যের যে মূল শক্তি বিশ্বে শৃঙ্খলা নিয়ে এসেছে, সেই শক্তি জড়বস্তুকে আশ্রয় করায় অনির্বচনীয় আনন্দের সঞ্চার হয়েছে। সহজ করে বলতে গেলে বেঁচে থাকার একটা অনির্দেশ্য আনন্দ আছে। এই আনন্দের কোনো কারণ নির্দেশ করা সহজ নয়। বর্ণ দেখে আমাদের আনন্দ হয়, মধুর গান শুনেও আনন্দ হয়। কবিরা তো এই আনন্দেরই চর্চা করেন। এই আনন্দময় অনুভূতিতেই তাঁরা কাব্য রচনা করেন। বলা প্রয়োজন, আনন্দ কথাটার একটা ব্যাপক অর্থ আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকেই যদি দৃষ্টান্তরূপে নেওয়া যায়, তবে অবশ্য দেখা যাবে কাহিনীর নিছক আনন্দময়তা কমই আছে। বিষবৃক্ষ বা কৃষ্ণকান্তের উইলের উপসংহার আমাদের প্রত্যাশা-পূরণের আনন্দ দেয় না। বঙ্কিমের অধিকাংশ উপন্যাসই বেদনা-মাধুর্যে আমাদের হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে। মধুসূদনের মেঘনাদবধই বা কী? কাব্যের উপসংহারে মহৎ বিচ্ছেদের মহৎ বিষণ্ণতায় পাঠকের অন্তর পূর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু এই বিচ্ছেদ-দুঃখ বা রাবণের পরাজয় কি বেঁচে থাকাকে কোনদিক দিয়ে অর্থহীন প্রতিপন্ন করে? তা যদি না হয় তবে এই দুঃখ সত্ত্বেও বেঁচে থাকার আনন্দ আছে। এই আনন্দকে স্পষ্ট করে বোঝানো কঠিন। কমলাকান্তের দপ্তরের 'পতঙ্গ' রচনাটির মধ্যে বঙ্কিম মৃত্যুর আনন্দের বর্ণনা দিয়েছেন। এ আনন্দ জীবনেরও বটে কারন মৃত্যুকে স্বীকার করেও আমাদের সত্তা জীবন-বিমুখ হয় না।

'এখন হইতে আমার বোধ হইতে লাগিল যে মনুষ্যমাত্রেই পতঙ্গ। সকলেরই এক একটি বহ্নি আছে—সকলেই সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে চাহে, সকলেই মনে করে সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে, তাহার অধিকার আছে।'

একটি কথা বলা দরকার। বঙ্কিম যাকে বিশ্বের শৃঙ্খলা বলেছেন সেটা কি? এ শৃঙ্খলা কিন্তু আদর্শ নৈতিক শৃঙ্খলা নয়। জীবনের যেটা প্রত্যক্ষ রূপ, সেটাকে নৈতিক বলা যায় না। জীবনে অন্ধ উন্মাদনা আছে আদর্শ নীতির দিক দিয়ে সেটা ঠিক নয়। সুতরাং আদর্শ শৃঙ্খলায় এর স্থান নেই। প্রাকৃতিক জগৎ যে নিজস্ব নিয়মে চলেছে, বঙ্কিম তাকেই বলেছেন শৃঙ্খলা। সব কিছুই নির্দিষ্ট কার্যকারণের শৃঙ্খলে বদ্ধ এবং সেই জন্যই পরিচ্ছন্ন এবং স্পষ্ট। এইভাবে জীবনকে দেখার মূলে য়ুরোপের অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রভাব আছে সন্দেহ নেই। বঙ্কিমের সাহিত্য-সমালোচনা রোমান্টিক-পূর্ব প্রত্যক্ষতার নীতি দ্বারা প্রভাবিত।

প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি বিশ্বাস দিয়ে গঠিত ছিল বঙ্কিমের মন। সাহিত্যের নীতিকেও এই নিয়মতত্ত্বই অনেকখানি অনুরঞ্জিত করেছিল। জগতের প্রত্যক্ষ রূপ—তার কার্য-কারণশৃঙ্খলা সাহিত্যের সৃষ্টির পটভূমি নির্মাণ করে। সেই জীবনকাহিনী, সেই আবেগ, সেই প্রেম, সেই দুঃখ, সেই মিলনই যেমন সাহিত্যের বিষয়, তেমনি তাদের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক প্রতিক্রিয়াও সাহিত্যের প্রদর্শনীয় অঙ্কনযোগ্য বিষয়। এদিক দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে বাস্তববাদী লেখক বলা যেতে পারত। কিন্তু বঙ্কিম যে আদর্শবাদী লেখক সে বিষয়ে তো সন্দেহ নেই। বঙ্কিমের উপন্যাসে আদর্শবাদিতার দুটি দিক। একদিকে বিশেষ ব্যক্তিচরিত্র বিশেষ ঘটনার সাহায্যেই নির্বিশেষ তাৎপর্য অর্জন করেছে। বঙ্কিমের নিজের সৃষ্টি একটি উপলক্ষে মাত্র সমগ্র পাঠকচেতনাকে লগ্ন করে রাখে না, সে-চেতনা ছড়িয়ে যায় মানব-ভাগ্য ও মানব চরিত্রের সামগ্রিক অনুভূতিতে। এই অর্থে নিশ্চয়ই তিনি আদর্শবাদী। আর একদিকে, বঙ্কিম জীবনজ্বালা থেকে উদ্ধারের জন্য মেলে দিয়েছেন এক অপ্রাপ্য নৈতিক সত্যের স্বপ্নকে। সে-স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নেয় নি, কিন্তু সে-স্বপ্ন দুঃখহত নায়ক ও বেদনাবিদ্ধ নায়িকাকে উতলা করে তুলে রসকে ঘনীভূত করে তোলে।

বঙ্কিমের নিজের রসশিল্পে এই বিচিত্র সৌন্দর্য সৃষ্টি হলেও তত্ত্বের আলোচনায় তিনি এর কোনো ব্যাখ্যা বা সাহিত্যনীতি নির্ধারিত করেন নি। সেক্ষেত্রে বরং তিনি প্রত্যক্ষতাবাদীদের মতোই সাহিত্যসৃষ্টিতে একটি সাধারণ নিয়মকেই স্বীকার ও ব্যাখ্যা করেছেন। সাহিত্য মাত্রেরই বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি অর্জনের মূলে থাকে যুগ জাতি এবং পরিপার্শ্বের প্রভাব। টেন তার সুবিখ্যাত ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে (১৮৬৪) সাহিত্যসৃষ্টির সূত্র নির্দেশ করেছিলেন, race, milieu এবং moment। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের ব্যাখ্যায় এই তত্ত্বকে স্বীকার করেছেন। দীনেশচরণ বসুর 'মানসবিকাশে'র সমালোচনায় (১৮৭৩) তিনি বলেছেন—

'সাহিত্য দেশের অবস্থা ও জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র। যে-সকল নিয়মানুসারে দেশভেদ, রাজবিপ্লবের প্রকারভেদ, সমাজবিপ্লবের প্রকারভেদ, ধর্মবিপ্লবের প্রকারভেদ ঘটে সাহিত্যের প্রকারভেদ সেই সকল কারণেই ঘটে। কোনো কোনো ইউরোপীয় গ্রন্থকার সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের আভ্যন্তরিক সম্বন্ধ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।'

একই তত্ত্ব তিনি একাধিক স্থানে উল্লেখ করেছেন। এই তত্ত্বের দৃষ্টান্তও তিনি দিয়েছেন বিভিন্ন রচনায়। যেমন 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধে (১২৮০) ভারতবর্ষীয় সাহিত্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে তিনি বলেছেন[১]—

'ভারতবর্ষীয়েরা শেষে আসিয়া একটি এমন প্রদেশ অধিকার করিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন যে তথাকার জলবায়ুর গুণে তাঁহাদিগের স্বাভাবিক তেজ লুপ্ত হইতে লাগিল। তথাকার তাপ অসহ্য, বায়ু জল বাষ্পপূর্ণ, ভূমি নিম্ন এবং উর্বরা, এবং তাহার উৎপাদ্য অসার, তেজোহানিকারক ধান্য। সেখানে আসিয়া আর্যতেজ অন্তর্হিত হইতে লাগিল, আর্যপ্রকৃতি কোমলতাময়ী আলস্যের বশবর্তিনী এবং গৃহসুখাভিলাষিণী হইতে লাগিল। সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে আমরা বাঙ্গালার পরিচয় দিতেছি।'

অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত বৈষ্ণবপদ সংগ্রহের সমালোচনাতেও বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণ-চরিত্রের রূপান্তর অবলম্বন করে সাহিত্যসৃষ্টির এই ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন।[২] বঙ্কিমচন্দ্রের এই ব্যাখ্যানীতির আর একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তাঁর 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে (১২৭৯)—

'বাস্তবিক সর্বত্রই রামায়ণের রামচন্দ্র হইতে ভবভূতির রামচন্দ্র অধিকতর কোমল-প্রকৃতি ইহার এক কারণ এই উভয় চরিত্র গ্রন্থরচনার সময়োপযোগী। রামায়ণ প্রাচীন গ্রন্থ কেহ কেহ বলেন যে উত্তরকাণ্ড বাল্মীকি-প্রণীত নহে। তখন আর্যজাতি বীরজাতি ছিলেন। আর্যরাজগণ বীরস্বভাবসম্পন্ন ছিলেন। রামায়ণের রাম মহাবীর, তাঁহার চরিত্র গাম্ভীর্য এবং ধৈর্যপরিপূর্ণ। ভবভূতি যৎকালে কবি—তখন ভারতবর্ষীয়েরা আর সে-চরিত্রের নহেন। ভোগাকাঙ্ক্ষা অলসাদির দ্বারা তাঁহাদের চরিত্র কোমল-প্রকৃত হইয়াছিল। ভবভূতির রামচরিত্র সেইরূপ। তাঁহার চরিত্রে বীরলক্ষণ কিছুই নাই। গাম্ভীর্য এবং ধৈর্যের বিশেষ অভাব।'

কয়েক বৎসর পরে বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কাব্যব্যাখ্যা করতে গিয়েও এই সূত্র দ্বারাই চালিত হয়েছিলেন, 'কবিকে বুঝিয়া লাভ আছে'—এই কবিব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের 'কবিরে পাবে না তার জীবন চরিতে'-র কবি নন। বঙ্কিমচন্দ্র যে কবিকে জানতে

১ এই প্রবন্ধেরই অংশবিশেষ মানসবিকাশের সমালোচনায় সংকলিত।

২ কৃষ্ণচরিত্র (১২৮২), বঙ্কিম গ্রন্থাবলী, বিবিধ।

বলেছেন সে-কবি সামাজিক—সমাজের দানেই কবিমনের রূপবৈশিষ্ট্য। ঈশ্বর গুপ্তের দোষগুণের জন্য তাঁর পরিপার্শ্বেরই দায়িত্ব। দীনবন্ধুর সমালোচনাও বঙ্কিমচন্দ্রের এই সাহিত্য-ব্যাখ্যার আভাস আছে।[১]

সাহিত্যসৃষ্টির ব্যাখ্যায় বঙ্কিম প্রত্যক্ষতাবাদীর (Positivists) চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু প্রত্যক্ষতাবাদীর ব্যাখ্যা সাহিত্যসৃষ্টির মর্মরহস্যে প্রবেশ করতে পারে না, এ রকম যান্ত্রিক ব্যাখ্যায় সেটা সম্ভব কিছুতেই নয়। কবির সৃষ্টি বিশিষ্ট, সার্থক কবিতা অনন্যপূর্ব। এই অপূর্বতা জড়জীবনের দান কিছুতেই নয়। কবিতে কবিতে সৃষ্টির ভেদ ঘটে, বিশ্বের রূপ কবির চিত্তে একটি অসামান্যতা অর্জন করে। বাইরের জড়জীবন কবির চেতনায় আবেগস্পন্দিত হয়ে কাব্যে প্রকাশিত হয়—এর ব্যাখ্যা কি শুধু ইতিহাসের ঘটনাসমাবেশেই সিদ্ধ?

বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যসৃষ্টির তত্ত্ববিশ্লেষণে বেশিদূর অগ্রসর হন নি সত্য, কিন্তু নিজে একজন শ্রেষ্ঠ কবিশিল্পী বলেই সাহিত্যের এই রহস্যে তিনি ছিলেন অবহিত। তার বহু আভাস তাঁর বিভিন্ন রচনায় পাওয়া যায়। এ বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন সংস্কৃত রসবাদিগণ। কিন্তু সে-আলোচনা মধুসূদন এবং বঙ্কিম দুজনের কাছেই অতৃপ্তিকর মনে হয়েছিল।[২] 'উত্তরচরিতে'র সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃত আলংকারিকদের নমস্কার করে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। কারণ উল্লেখ করে বলেছেন, তাঁরা মানুষের ভাবকে কয়েকটি শ্রেণীতে মাত্র ভাগ করেছেন, অথচ এতে মানবচরিত্রের অপরিমেয় বৈচিত্র্যকে ধরা যায় না।

বঙ্কিমচন্দ্র আজন্ম ইংরেজি সাহিত্যনীতিতেই শিক্ষিত। এই শিক্ষাতেই তাঁর সাহিত্যবোধ গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সে-যুগের তুলনাতেও বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনার আদর্শে যে বিশিষ্টতা ছিল, তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। প্রত্যক্ষতাবাদীদের দ্বারা

১ বঙ্কিমচন্দ্র কবিমনের সঙ্গে সমাজে যে যোগ নির্দেশ করেছেন সে-যোগের তত্ত্ব পরবর্তী সমালোচনাতে স্বীকৃত। রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্য-সৃষ্টি' (১৩১৪) প্রবন্ধে রামচরিত্র অবলম্বনে ভারতীয় সাহিত্যের রূপান্তরণ দেখিয়েছেন। বিশেষত দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে (১৮৯৬) সামাজিক প্রবণতার সঙ্গে সাহিত্যের প্রবণতার কার্যকারণ-যোগ দেখিয়েছেন।

২ অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের মতে সংস্কৃত সমালোচনার প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র এবং আধুনিকদের বিরূপতার কারণ বিশ্বনাথ কবিরাজের 'সাহিত্যদর্পণ'। বিশ্বনাথ রসতত্ত্বকে গৌণ করে কাব্যের আলংকারিক আলোচনাকে প্রধান করে তুলেছেন। আনন্দবর্ধন, অভিনবগুপ্তের রচনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ থাকলে আধুনিকদের এই বিরূপতা ঘটত না। দ্রষ্টব্য শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, 'বাংলা সমালোচনা-পরিচয়'

প্রভাবিত হয়েও বঙ্কিমচন্দ্র আরও অনেক দূর এগিয়েছিলেন। সংস্কৃত সমালোচনার আদর্শলোক থেকে বাঙালী সাহিত্যপাঠককে বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক সাহিত্যজগতের দ্বারদেশে পৌঁছে দিলেন। নিও-ক্লাসিকাল সমালোচনার অনুপযোগিতাও তিনি জানতেন যদিও তাঁর ছাত্রজীবন কেটে গিয়েছে এই সাহিত্যবিচারের পরিমণ্ডলের মধ্য দিয়েই। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'পদ্মিনী উপাখ্যানে'র ভূমিকায় সাহিত্যাদর্শ নিয়ে যে দীর্ঘ ভূমিকা লিখেছিলেন তাতে একজায়গায় তিনি বলছেন—

'উক্ত রচনা এতদ্দেশীয় শ্রীবর্ধনেচ্ছুক কোন ইউরোপীয় মহাশয়ের উক্তি অনুসারে লিখিত।'

এই 'ইউরোপীয় মহাশয়' হচ্ছেন হিন্দু কলেজের বিখ্যাত শিক্ষক ডি. এল. রিচার্ডসন। রিচার্ডসনের Poetry and Utilitarianism প্রবন্ধটির কিয়দংশ রঙ্গলাল অনুবাদ করে দেন। ১৮৭৫ পর্যন্ত রিচার্ডসনের আলোচিত সাহিত্যতত্ত্ব কলেজের ছাত্রদের সাহিত্যবিষয়ক মতামত গঠন করেছিল, দেখা যায়। রিচার্ডসন ছিলেন পোপ ড্রাইডেনের ভক্ত, অবশ্য শেক্‌সপীয়র-সাহিত্যের অবিস্মরণীয় ভক্ত-অধ্যাপক। তিনি সাহিত্যে যুক্তি, স্পষ্টতা, সরলতা প্রভৃতি ক্লাসিক সাহিত্যাদর্শের অনুরাগী। শেলি এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতার তিনি অকুণ্ঠ প্রশংসা করতে পারেন নি, তাঁদের ভাবালুতা এবং যুক্তিবোধের অভাবের জন্য।[১]

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সমালোচনাতেও ছিল যুক্তিবাদ; কিন্তু তার চেয়েও কিছু বেশি ছিল। কবির চোখে যে জগৎ ধরা দেয়, সে জগৎ বাস্তব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। এই জগৎ প্রাকৃতিক নীতি-নিয়মবদ্ধ। এই নিয়ম ভেঙে জগৎকে তো কবিরা গড়তে পারেন না। সংস্কৃত আলংকারিক যে 'নিয়তিকৃতনিয়মরহিত' কাব্যজগতের অস্তিত্ব ঘোষণা করেছিলেন, আধুনিক সাহিত্যিকের বাস্তবসচেতন মন তাতে আর বিশ্বাস করে না। বহির্জগতের এই অবিচল প্রতিষ্ঠার প্রতি অটল বিশ্বাসের সূত্র নিহিত ছিল য়ুরোপীয় কাব্যধারণায়, বহুপূর্বে প্লেটো-অ্যারিস্টটলের চিন্তাতেই। অ্যারিস্টটল প্লেটোর অভিমতকে সংশোধন করে শিল্পকলার মহত্ত্ব প্রচার করেছিলেন, কিন্তু জড়জগতের অটল সত্যতায় কোনো সন্দেহ কখনো প্রকাশ করেন নি। তাই তিনি স্বভাবের অনুকরণের কথা বলেছিলেন খানিকটা সীমাবদ্ধ অর্থে। মানবমনের অনুকরণকেই অ্যারিস্টটল্ সাহিত্যের সার্থকতার মান বলে অভিহিত করেছিলেন। সে-মানুষ দুঃখার্ত, সংগ্রামরত; 'চিত্তশুদ্ধিকর' (Katharsis) কাহিনীর নায়ক।

অ্যারিস্টটলের স্বভাবানুকরণ-তত্ত্বকে বঙ্কিম মেনে নিয়েছেন বলেই সাহিত্যে প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতিষ্ঠা করতে তাঁর কোনো বাধা ঘটে নি। অ্যারিস্টটলীয় আদর্শে প্রভাবিত হয়েই তিনি 'উত্তরচরিতে'র আধুনিক বিচার করেছিলেন। ঘটনা-পরম্পরা, চরিত্রগত সঙ্গতি—এই দুইই যেমন অ্যারিস্টটলের ছিল প্রধান বক্তব্য, উত্তরচরিতের কাহিনী-অনুসরণে বঙ্কিমের নাটক-বিশ্লেষণে তেমনি সেই সূত্রটিই রক্ষিত। অবশ্য গ্রীক নাটকের যেটা বিশিষ্ট ধর্ম অবশ্যই এখানে তা অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে দাঁড়ায় নি। সেটুকু বাদ দিয়ে অ্যারিস্টটল-প্রতিষ্ঠিত শিল্পবিচারের নির্বিশেষ লক্ষণগুলি বঙ্কিম এই প্রবন্ধের উপসংহারে আলোচনা করেছেন। এই অংশটি বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যতত্ত্ব বোঝবার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। তাতে তিনি বলেছেন—

'যাহা প্রকৃতির প্রতিকৃতি মাত্র, সে সৃষ্টিতে কবির তাদৃশ গৌরব নাই। তাহার কারণ, সে কেবল প্রতিকৃতি—অনুলিপি মাত্র—তাহাকে "সৃষ্টি" বলা যায় না।'

প্রাকৃতিক নিয়মকে রক্ষা করেও তাকে অতিক্রম করে 'সৃষ্টি' করতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র এই শব্দটি ব্যবহার করে সাহিত্যের একটি গূঢ় রহস্যের ইঙ্গিত দিলেন। এখানেই নতুন সমালোচনার যাত্রাপথ মুক্ত হল। পূর্ববর্তী যুগের সাহিত্যতত্ত্ব থেকে তিনি এগিয়ে এলেন। এই কেন্দ্রবিন্দু থেকেই বস্তুত দুটি লক্ষ্যপথ বেরিয়ে আসে, একটি নাটক-উপন্যাস-মহাকাব্য প্রভৃতি অবজেকটিভ সাহিত্য, আর-একটি গীতিকাব্য—সাবজেকটিভ সাহিত্য। দুটিতেই স্বভাবানুকরণ থেকেও স্বভাবাতিরিক্ততা বা 'সৃষ্টি'। স্বভাবাতিরিক্ত শব্দটির ব্যবহার করে বঙ্কিম প্রমাণ করলেন তিনি সাহিত্যসৃষ্টিতেও এমন একটা কিছু বলতে চান, যা স্পষ্ট ভাষায় সুনির্দিষ্ট করে বোঝানো যায় না। আলংকারিকেরা এ রকম ক্ষেত্রে উপমার আশ্রয় নিয়ে বলেছেন 'লাবণ্যমঙ্গনামিব'। বঙ্কিমচন্দ্র উপমা দিয়ে তত্ত্ব আলোচনা করেন না, ফলে স্বভাবাতিরিক্ত কথাটি আর ব্যাখ্যা করেন নি। কিন্তু নাটক-উপন্যাসের ক্ষেত্রে সৃষ্টি কী রকম?

'কবির সৃষ্টি—চরিত্র রূপ স্থান অবস্থা কার্যাদিতে পরিণত হয়। ইহার মধ্যে কোন একটির সৃষ্টি কবির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে। সকলের সংযোগে সৌন্দর্যের সৃষ্টিই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। চরিত্র রূপ স্থান অবস্থা কার্য এ সকলের সমবায়ে যাহা দাঁড়াইল, তাহা যদি সুন্দর হইল তবেই কবি সিদ্ধকাম হইলেন।'

অর্থাৎ অখণ্ডতা সৃষ্টিতেই সার্থক কাব্য। জীবনের এই অখণ্ড রূপকে দেখতে পারাই প্রতিভা। বঙ্কিমচন্দ্রের 'শকুন্তলা মিরন্দা এবং দেসদিমোনা' প্রবন্ধ পড়লেও দেখা যাবে কালিদাসের নাটকে এবং শেক্সপীয়রের নাটকে উভয়ত্রই বঙ্কিম সন্ধান করেছেন চরিত্র ও ঘটনাগত সংহতি ও সঙ্গতি। জীবন্ত মানবকে আমরা যে-চোখে দেখি এবং

যেভাবে তার আচরণের অর্থ এবং সঙ্গতি খুঁজি ঠিক তেমনি ভাবেই বঙ্কিম নাটকের নায়িকাদের সম্ভাব্যতা এবং সৃষ্টি ব্যাখ্যা করেছেন। শব্দ দিয়ে নাট্যকার করলেন এই সৃষ্টি। সাহিত্যের গুণগত বৈশিষ্ট্য যে কেবল বহিরঙ্গ রূপবন্ধে নির্ভর করে না—বঙ্কিমচন্দ্রের এ বিষয়ে জাগ্রত বোধ সত্যই বিস্ময়কর।—

'ভারতবর্ষে যাহাকে নাটক বলে, ইউরোপ ঠিক তাহাকেই নাটক বলে না। উভয় দেশীয় নাটক দৃশ্যকাব্য বটে, কিন্তু ইউরোপীয় সমালোচকেরা নাটকার্থে আর একটু অধিক বুঝেন। তাঁহারা বলেন যে, এমন অনেক কাব্য আছে—যাহা দৃশ্যকাব্যের আকারে প্রণীত, অথচ প্রকৃত নাটক নহে। নাটক নহে বলিয়া যে এ সকলকে নিকৃষ্ট কাব্য বলা যাইবে এমত নহে—তন্মধ্যে অনেকগুলি অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য, যথা গ্যেটে-প্রণীত ফষ্ট এবং বাইরণ প্রণীত মানফ্রড—কিন্তু উৎকৃষ্ট হউক, নিকৃষ্ট হউক—ঐ সকল কাব্য, নাটক নহে।'

এতে খাঁটি নাটকের যে-অবিসম্বাদিত বৈশিষ্ট্য নির্দিষ্ট হল, অবজেকটিভ সাহিত্যের সেটা নিঃসন্দিগ্ধ পরিচয়। বঙ্কিমচন্দ্রের এই সাহিত্যিক বোধ যে কত নিশ্চিত, তার প্রমাণ মাঝে-মাঝেই মেলে যেমন উত্তরচরিতে সীতার একটি উক্তির বর্ণনায়—

'দিট্‌ঠিয়া অপরিহীনরায়ধম্মো কৃখু সো রাআ—এইরূপ বাক্য কেবল সেক্ষপীয়রেই পাওয়া যায়। রাম আসিয়াছেন শুনিয়া সীতা আহ্লাদের কথা কিছুই বলিলেন না, কেবল বলিলেন, 'সৌভাগ্যক্রমে সে রাজার রাজধর্মপালনে ত্রুটি হইতেছে না।'

•

কবির রচনা স্বভাবকে অনুকরণ করেও স্বভাবাতিরিক্ত হয়ে যে সৃষ্টি হয়ে ওঠে তার আর একটি ক্ষেত্র হচ্ছে গীতিকাব্য। বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'তাঁহার সৃষ্টিই বড় নাই'। একথা তিনি দীনবন্ধু মিত্রের আলোচনা-প্রসঙ্গেও বলেছিলেন, 'কবির প্রধান গুণ সৃষ্টিকৌশল। ঈশ্বর গুপ্তের এ ক্ষমতা ছিল না।' গঙ্গাচরণ সরকারের 'ঋতুবর্ণন' আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র স্বভাবানুকরণ এবং কবির সৃষ্টির একটি চমৎকার ইঙ্গিত দিয়েছেন। সৌন্দর্যকে খুঁজতে হয় না, এ জগৎকে কবি যেমন দেখেন ঠিক তেমনি করেই যদি সুন্দর চিত্র সমাহৃত করে নিয়ে আসতে পারেন তবে কাব্য হয়—কিন্তু সে-কাব্য সাহিত্যকর্মের নিম্নতম পর্যায় বর্ণন-কাব্য। কালিদাসের ঋতুসংহার এবং টমসনের কাব্যে উৎকৃষ্ট বাহ্য প্রকৃতির বর্ণনা আছে। 'উভয় গ্রন্থই আদ্যোপান্ত সুমধুর প্রসাদ-গুণবিশিষ্ট এবং স্বভাবানুকারী'। কিন্তু এতে সৃষ্টিচাতুর্য নেই। সেই সৃষ্টি কী করে সম্ভব?

'সুন্দরেও যে সৌন্দর্য নাই, যে রস, যে রূপ, যে স্পর্শ, যে গন্ধ কেহ কখনও ইন্দ্রিয়-

গোচর করে নাই, "যে আলোক জলে স্থলে কোথাও নাই" সেই আত্মচিত্তপ্রসূত উজ্জ্বল হৈমকিরণে সকলকে পরিপ্লুত করিয়া, সুন্দরকে আরো সুন্দর করেন—সৌন্দর্যের অতি প্রকৃত চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি করেন। অতি প্রকৃত কিন্তু অপ্রকৃত নহে। তাঁহাদের সৃষ্টিতে অযথার্থ অভাবনীয়, সত্যের বিপরীত, প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীত কিছুই নাই, কিন্তু প্রকৃতিতে তাহার আদর্শ কোথাও দেখিবে না।'[১]

ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থের একটি সুপরিচিত পংক্তি the light that never was on sea or land দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র এই আত্মকেন্দ্রিক কল্পনা-প্রতিভার বর্ণনা করেছেন। রিচার্ড্‌সনের যুগে ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থের বিশিষ্টতা এতখানি স্বীকৃত ছিল না। নব্যক্লাসিক যুগের কাব্যতত্ত্বের থেকে বঙ্কিমচন্দ্র রোমান্টিক যুগে অগ্রসর হয়ে এলেন। অথচ 'প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীত কিছুই নাই'—এ যুক্তিবাদও বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তার মূলে দৃঢ় নিহিত। তাহলে একথাই বলতে হয় এ নিয়ম বহির্জগতের নয়, বস্তুবিশ্বের অভ্যন্তরে বৃহৎ সত্যের নিয়ম। ইন্দ্রিয়গোচর রূপ খণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন, অসংলগ্ন। কবির কল্পনা বিশ্বের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের নিজস্ব নিয়মটিকে রক্ষা করেই উৎকৃষ্ট কাব্যকে সম্ভব করে তোলে।

বহিঃসৌন্দর্যের কাব্যরূপায়ণ সম্বন্ধে এই কথা। আবার 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন হৃদয়-ভাবকে প্রকাশ করাতেই গীতিকাব্য-প্রণেতার সাফল্য।—

'যখন হৃদয়, কোন বিশেষ ভাবে আচ্ছন্ন হয়,—স্নেহ, কি শোক, কি ভয়, কি যাহাই হউক, তাহার সমুদায়াংশ কখন ব্যক্ত হয় না। কতকটা ব্যক্ত হয়, কতকটা ব্যক্ত হয় না। যাহা ব্যক্ত হয়, তাহা ক্রিয়ার দ্বারা বা কথা দ্বারা। সেই ক্রিয়া বা কথা নাটককারের সামগ্রী। যেটুকু অব্যক্ত থাকে, সেইটুকু গীতিকাব্য-প্রণেতার সামগ্রী।'

বঙ্কিমের এই অভিমত নিঃসন্দেহে মূল্যবান। অবজেকটিভ সাহিত্য বস্তুগত বর্ণনা দেয়, গীতিকাব্য দেয় নির্বস্তুক মানসিক ভাবের ব্যঞ্জনা। ভাবময়তাই গীতিকাব্যের প্রাণ। বহির্বস্তুর সৌন্দর্য এবং মানসিক অনুভূতি—দুইই 'আত্মচিত্তপ্রসূত নির্মল হৈম-কিরণে' উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্রের এই চিন্তাধারার সঙ্গে প্রত্যক্ষতাবাদীর প্রবণতাকে মেলানো যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যে এক অপ্রত্যক্ষ শক্তিকে স্বীকার্য করে তুলেছেন। ইংরেজি সাহিত্যে ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থের প্রচেষ্টা থেকে যে-যুগান্তর এসে গেল, কোলরিজ তার দার্শনিক মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কোলরিজের কল্পনা-তত্ত্ব স্মরণীয়। কাব্যসৃষ্টিতে এই তত্ত্বটাই একটি স্রষ্টামনের ভূমিকাকে নিঃসংশয় করে দিয়েছে।

১ বঙ্কিমগ্রন্থাবলী, বিবিধ খণ্ড, 'ঋতুবর্ণন'

বঙ্কিমচন্দ্র কোলরিজের বায়োগ্রাফিয়া লিটারারিয়া পড়েছিলেন কিনা জানি না। ধরা যাক তিনি পড়েন নি ; তাহলে তাঁর অভিনব সাহিত্যাদর্শকে তাঁর স্বোপার্জিত বলতে দোষ নেই। কিন্তু তিনি একটি শক্তিশালী সমর্থন পেয়েছিলেন তাঁর চিন্তাগুরু জন স্টুয়ার্ট মিলের থেকে। মিল ছিলেন উপযোগবাদী। উপযোগবাদ প্রত্যক্ষতাবাদেরই ফল। কিন্তু সাহিত্যবোধে মিল প্রত্যক্ষতাবাদীর থেকে আশ্চর্যভাবেই ছিলেন স্বতন্ত্র। মিলের Thoughts on Poetry and its Varieties ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধের অনেক মতের সঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্রের মতের মিল আছে, বিশেষত গীতিকাব্য বিষয়ে। মিল বলেছেন উপন্যাস এবং কবিতার পার্থক্য-প্রসঙ্গে—

The truth of poetry is to point the human soul truly ; the truth of fiction is to give a true picture of life ..[a novelist] has to describe outward things, not the inward man ; actions and events not feelings.

কবিতার ধর্ম কি সে সম্পর্কে—

The poetry is not in the object itself nor in the scientific truth itself, but in the state of mind in which the one and the other may be contemplated.

মিল ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর কবিতাকে বলেছেন চিন্তাপ্রধান। সেদিক থেকে শেলির কবিতা বিশুদ্ধতর।

In Wordsworth, the poetry is almost always the mere setting of a thought, ..It is for this reason, doubtless, that the genius of Wordsworth is essentially unlyrical.

বঙ্কিমচন্দ্র শেলির প্রসঙ্গ আনেন নি, কিন্তু ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতাকে বলেছেন আধ্যাত্মিকতাদোষদুষ্ট। অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতি কাব্যে পরস্পরে প্রতিবিম্বিত হয়। বহিঃপ্রকৃতির গুণে হৃদয়ের ভাবান্তর ঘটে। মনের বিশেষ অবস্থায় বাহ্য দৃশ্য কখনও রমণীয় আবার কখনও বিষণ্ণ। বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনা করতে গেলে মনের সেই ছায়াসম্পাতের বর্ণলেপন এসে যাওয়া স্বাভাবিক, আবার অন্তঃপ্রকৃতির বর্ণনাও বহিঃ-প্রকৃতির অনুরঞ্জনেই রঞ্জিত। ওয়ার্ডসওয়ার্থ বহিঃপ্রকৃতিকে বাদ দিয়ে অন্তরের ভাবনাগুলিই ছায়াশরীরী করে তুলেছেন।

একদিকে প্রাকৃতিক নিয়ম আর-একদিকে নিয়মাতিক্রান্ত ভাবকল্পনার আত্মকেন্দ্রিক

সৌন্দর্যরচনা—এই দুই বিপরীত আকর্ষণে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচিন্তাতে একটি দ্বিধার সৃষ্টি হয়েছে, যদিও তিনি দ্বিধাকে উত্তীর্ণ হয়ে মীমাংসায় পৌঁছেছেন বলেই মনে করেছিলেন। কাব্যের উদ্দেশ্য কি, এ সম্বন্ধে বঙ্কিম মানবকল্যাণ এবং সৌন্দর্যসৃষ্টি দুয়েরই উল্লেখ করেছেন। নিছক আনন্দলোক রচনার দ্বারা কাব্যকে যেন গুরুভারমুক্ত লঘু-লীলায় পর্যবসিত করে দেখা হয়, আবার নীতিকেই প্রধান লক্ষ্য ধরলে কাব্যের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। রবীন্দ্রনাথও একসময়ে সাহিত্য-লক্ষ্য সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন, পরিপূর্ণ কল্যাণেই সৌন্দর্য, এমনি একটি তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন।[১] তারপরে তিনি প্রয়োজনের অতীত হওয়াকেই বলেছেন সৌন্দর্য, আবার সামঞ্জস্য স্থাপন করে জগতের বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতাগুলিতে ভাবগত ঐক্য রচনা করাতেই সেই প্রয়োজনবিরহিত সৌন্দর্যসাধন, এমন অভিমতও তাঁর 'সাহিত্য' বইয়ের বিভিন্ন রচনায় ছড়িয়ে আছে।[২] বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে সমাজ-ভাবনামগ্ন বাঙালী মনীষা সাহিত্যশিল্পকে অন্যনিরপেক্ষরূপে দেখতে অভ্যস্ত হয় নি। এইজন্য সাহিত্যে কল্যাণ ও নীতির চিন্তা এসেই গিয়েছে। সেকালে বঙ্কিমচন্দ্রের অসামান্যতা নিশ্চয়ই সেখানেই বলব, যেখানে সৌন্দর্যসৃষ্টিকেই তিনি সাহিত্যের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য বলে নির্দেশ করেছিলেন। সৌন্দর্য কি, সৌন্দর্যের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক কতদূর অচ্ছেদ্য, এ নিয়ে বঙ্কিম সূক্ষ্ম আলোচনা কিছু করেন নি। তবে তাঁর উক্তি থেকে একটা অর্থ কল্পনা করে নেওয়া যায় বোধ হয়। জীবনকে সাহিত্যে রূপ দেওয়াই সৌন্দর্যসৃষ্টি—এই সৃষ্টিতেই চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির বিকাশ। বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্বাস, সত্যিই যদি জীবনকে সমগ্ররূপে ফুটিয়ে তোলা যায় তবে পাঠকের মনে সংকীর্ণ ক্ষুদ্রবুদ্ধির অবসান ঘটবেই। মনের এই প্রসারই সার্থক কাব্যপাঠের ফল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'চিত্তশুদ্ধি'-মতবাদের সঙ্গে অ্যারিস্টটলের 'ক্যাথারসিস'-মতবাদের সাদৃশ্য আছে কিনা ভেবে দেখা দরকার। কাব্য যদি পাঠককে রসানুভূতির উচ্চতম স্তরে নিয়ে না যায়, যেখানে প্রবৃত্তির উন্মাদনা শান্ত ও বিস্মৃত হয়ে আসে, তবে সে কাব্য সার্থকই নয়। এই চিত্তশুদ্ধির অবস্থায় না নিয়ে কাব্য যদি নিম্নতর চেতনার জন্যই ইন্ধন সংগ্রহ করে তবে স্বভাবতই সে কাব্য উদ্দেশ্যমূলক এবং ব্যর্থ। উনিশ শতকের সাহিত্যে তখনও শুদ্ধশিল্পবাদ আসে নি কিন্তু রোমানটিক সৌন্দর্যবাদের পূর্বাভাস দুর্লক্ষ্য ছিল না।

১ সাহিত্য

২ পঞ্চভূতের বিভিন্ন প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

কমলাকান্তের ভাবনা

আমার এই হারান মন খুঁজিয়া আনিয়া দিতে পারিবে ?

—বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত একটি অনন্যসাধারণ রসসৃষ্টিমূলক রচনা হিসাবেই আমাদের কাছে পরিচিত। স্থূল বক্তব্যের চেয়েও এর শিল্পরসটাই আমাদের সাহিত্যে অবিস্মরণীয়তা অর্জন করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রপ্রবন্ধ, ছিন্নপত্র, উপন্যাস, ছোটোগল্প প্রভৃতির মতোই আমরা কমলাকান্তের শিল্পরসই আস্বাদন করে থাকি। এ যেন আমাদের অনুভূতিলোকে সুকুমার কল্পনার ছায়াপটের সূত্রধার। কমলাকান্ত চক্রবর্তী একটি বিশিষ্ট চরিত্র। প্রসন্ন গোয়ালিনীর সঙ্গে কাদম্বরীর পত্রলেখার মতো তার একটি মধুর সুহৃদ্‌সম্পর্ক। তার নিপুণ পরিহাস, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ কখনও অশ্রুতে বিগলিত, কখনও বেদনায় আর্ত, কখনও আত্মমগ্নতায় প্রশান্ত, কখনও ভর্ৎসনায় অধীর। ধ্যানে জ্ঞানে স্বপ্নে ভাবনায় উপদেশে পরামর্শে কমলাকান্ত-চরিত্র বিচিত্র। তার নিরাসক্ত মানবপ্রেমে ভরা নিঃসঙ্গ স্পর্শকোমল হৃদয়ছবি আমাদের ভুলিয়ে দেয় যে এই অপরূপ সৃষ্টির পশ্চাতে আছে বঙ্কিমচন্দ্রের যুক্তিবদ্ধ জীবনচিন্তা যা তাঁর প্রবন্ধে এবং উপন্যাসে একটি কঠিন বাস্তবভিত্তি রচনা করেছে।

কমলাকান্তের এই চিন্তাবস্তুটির সুসম্বদ্ধ বিবরণ প্রস্তুত করার প্রয়োজন আছে। এতে অবশ্য তার শিল্পসৌন্দর্যকে কোনো দিক দিয়েই খর্ব করার দরকার নেই। সেদিক থেকে তার চূড়ান্ত সাফল্যকে মেনে নিয়েই অন্য দিক দিয়ে এর গভীরতার পরিমাপ করা যায়। বস্তুত বঙ্কিম-মনীষার এটাই অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে তাঁর রসসৃষ্টি তাঁর যুক্তি-বোধকে কোনো দিক দিয়ে প্রতিহত করে না বরং তাঁর কল্পনাকে একটি দৃঢ় বস্তুভিত্তি দেয়। এ রকম দৃষ্টান্ত যে বাংলা সাহিত্যে আর নেই তা নয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' বৈষ্ণবদর্শন এবং বৈষ্ণবভক্তিভাবকে একসঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' ও 'ঘরে-বাইরে'তে তত্ত্ব এবং রস সম্মিলিত হয়ে গিয়েছে। গোরার উপন্যাস-রস আস্বাদন করতে আগ্রহী কোনো পাঠক রবীন্দ্রনাথের ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে চিন্তাকেও এর থেকে আহরণ করতে চাইলে নিশ্চয়ই ঠকবেন না।

তবে এটাও হয়তো অস্বীকার করা যাবে না যে কমলাকান্তে বক্তব্যের দিকটা একটু বেশিই প্রাধান্য পেয়েছে। 'বিড়াল' 'আমার মন' 'একটি গীত' প্রভৃতি কয়েকটি রচনাতে লেখকের কয়েকটি সুস্পষ্ট বক্তব্য পাঠকের বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত সচেতন করে

সন্দেহ নেই। এটা খুব স্বাভাবিক। উনিশ শতকের সাহিত্যকর্মে প্রায় সর্বত্রই এই বক্তব্যপ্রাধান্য। রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হয়েই 'বিচিত্রপ্রবন্ধের' ভূমিকায় লিখেছিলেন—

'ইহার যদি কোনো মূল্য থাকে তাহা বিষয়বস্তুগৌরবে নয়, রচনারসসম্ভোগে।'

এ যেন বঙ্কিমী যুগের বিষয়বস্তুগৌরবান্বিত রচনারীতির প্রতিক্রিয়াতেই বলা। রবীন্দ্রনাথই বাংলা সাহিত্যে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যকেন্দ্রিক এবং বক্তব্যগৌণ সাহিত্যরূপের প্রবর্তন করলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই রসসাহিত্যসৃষ্টিতেও বক্তব্য বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে কালধর্মে, যদিও তাতে রসসৃষ্টি কোনো দিক থেকে ক্ষুণ্ণ হয় নি। এই জন্যই কমলাকান্তকে চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তার ফসল হিসাবে পাঠ করলেও ক্ষতি নেই।

'কমলাকান্ত' বইটি আমরা বর্তমানে যে রূপে পাই, প্রথম সংস্করণে এ বই সে রকম ছিল না। 'কমলাকান্তের দপ্তর' নামে বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে। তখন তাতে ছিল এগারোটি রচনা। এই রচনাগুলি সবই বঙ্কিম-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ১২৭৯ বাংলা সনের বৈশাখ মাস থেকে বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হতে থাকে ; ১২৮০-র ভাদ্র থেকে ১২৮১-র চৈত্র পর্যন্ত বঙ্কিমের নিজের লেখা রচনাগুলি ওই পত্রিকায় বেরোয়। অতঃপর ১২৮২তে (১৮৭৫ খ্রীঃ) কমলাকান্তের দপ্তর গ্রন্থাকারে আত্মপ্রকাশ করে। তখন এতে যেসব প্রবন্ধ ছিল বঙ্গদর্শনে প্রকাশকালসহ তার তালিকা এই—

একা (ভাদ্র ১২৮০), মনুষ্যফল (আশ্বিন ১২৮০), ইউটিলিটি বা দর্শনদ্বয় (কার্তিক ১২৮০, পরে 'ইউটিলিটি বা উদরদর্শন' নামে গ্রন্থভুক্ত), পতঙ্গ (অগ্রহায়ণ ১২৮০), আমার মন (মাঘ ১২৮০), বসন্তের কোকিল (চৈত্র ১২৮০), বিবাহ (আষাঢ় ১২৮১), বড়বাজার (আশ্বিন ১২৮১), আমার দুর্গোৎসব (কার্তিক ১২৮১), একটি গীত (ফাল্গুন ১২৮১), বিড়াল (চৈত্র ১২৮১)।

বলা বাহুল্য এই তালিকায় বর্তমানে প্রচলিত 'চন্দ্রালোকে' (ফাল্গুন ১২৮০) এবং 'স্ত্রীলোকের রূপ' (জ্যৈষ্ঠ ১২৮১) নেই। তার কারণ প্রথমটি অক্ষয়চন্দ্র সরকারের এবং দ্বিতীয়টি রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের রচনা। যে দেড় বৎসরের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধগুলি লিখেছিলেন সেই সময়টি ছিল তাঁর বঙ্গদর্শনে চিন্তাসমৃদ্ধ প্রবন্ধ-রচনার যুগ, সেগুলি 'বিবিধপ্রবন্ধ' নামে পরে পুস্তকাকারে নিবদ্ধ হয়েছে। ১২৮২ সালেই বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন বন্ধ হয়ে যায়।

১২৮৪ সালের বৈশাখ থেকে সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় বঙ্গদর্শন আবার প্রকাশিত হয়। সেই সংখ্যাতেই বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন 'বুড়াবয়সের কথা'—তাতে কমলাকান্ত চক্রবর্তী

নাম ব্যবহার করেন নি। ১২৮৪-র পৌষে লেখেন কমলাকান্তের পত্র—'কি লিখিব' এবং 'কমলাকান্তের বিদায়' নামাঙ্কিত হয়ে গ্রন্থভুক্ত। ১২৮৪-র ফাল্গুনে তিনি লিখলেন 'পলিটিকস', ১২৮৫-র শ্রাবণ মাসে লিখলেন 'বাঙ্গালির মনুষ্যত্ব'। তার পর ১২৮৮-র ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'কমলাকান্তের জোবানবন্দী'। তার পরেও ১২৮৯ সালের বৈশাখে 'ঢেঁকি' প্রকাশিত হয়।

১২৯২ সালে (১৮৮৫) কমলাকান্তের দপ্তরের রচনাগুলি সঞ্জীবচন্দ্র-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধগুলি সহ 'কমলাকান্ত' নামে গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়। এতে তিনটি অংশ, কমলাকান্তের দপ্তর, কমলাকান্তের পত্র ও কমলাকান্তের জোবানবন্দী। এই বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ হয় ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে। যদিও মূল কমলাকান্তের দপ্তরের অনেক পরে লেখা, তবু 'ঢেঁকি' কমলাকান্তের দ্বিতীয় সংস্করণে দপ্তর-অংশের অন্তর্গত হয়।

আমরা বর্তমানে সাধারণভাবে 'কমলাকান্ত' বইটি বোঝাতে 'কমলাকান্তের দপ্তর' নামটি ব্যবহার করে থাকি, যদিও এ-প্রয়োগ সুষ্ঠু নয়।

কমলাকান্তের বিভিন্ন রচনাগুলি বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যজীবনের দীর্ঘকাল জুড়ে আছে। বয়সের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা ও কল্পনারও পরিণতি এসেছে। তাঁর অন্যান্য সৃষ্টি উপন্যাস ও প্রবন্ধের সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় কমলাকান্তের লেখাগুলি চলে এসেছে। এর মধ্যে উভয়েরই ভাবপ্রতিফলন একটু নিবিষ্টভাবে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়।

(কমলাকান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করতে বসলে প্রথমেই যে প্রশ্নটা মনে হয় তা এই যে, এর কোনো পূর্বাভাস কোথাও আছে কি-না। শিল্প হিসাবে কমলাকান্ত যে অভিনব সে কথা সর্বজনস্বীকৃত। বাংলা সাহিত্যে তখন অনেক কিছুই অভিনব, মহাকাব্য নাটক উপন্যাস। কমলাকান্তও তেমনি একটি সম্পূর্ণ নতুন সৃষ্টি রূপেই পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। পরে কমলাকান্তের অনুকরণ অনেক হয়েছে কিন্তু কমলাকান্ত বাংলা সাহিত্যে কারো অনুকরণ করে নি। এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত আমাদের কিছু সূত্র ধরিয়ে দিয়েছেন।[১]

আমাদের নবসৃষ্ট বাংলা সাহিত্যের অনেক কিছুই আমরা ইংরেজি সাহিত্যের প্রচলিত আদর্শ থেকে পেয়েছি। নতুন যুগের যাঁরা সার্থক সাহিত্যিক তাঁরা সকলেই ইংরেজি সাহিত্যে সুশিক্ষিত। বাংলায় মঙ্গলকাব্য কবিওয়ালার গান এবং পাঁচালীর সকল সম্ভাবনাই তখন নিঃশেষিত। বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে তাঁরা ইংরেজি সাহিত্যের আদর্শকেই অনুসরণ করেছেন। সেকালের নব্যপন্থীরা 'স্পেকটেটর' নামের

১ 'বঙ্কিমচন্দ্র' দ্রষ্টব্য

অনুকরণে করেছিলেন 'বেঙ্গল স্পেকটেটর', হয়তো বঙ্কিমচন্দ্র তার থেকেই 'বঙ্গদর্শন' নামেরও ইঙ্গিত পেয়ে থাকবেন। বঙ্গদর্শনে মাসে মাসে 'লোকরহস্য' এবং কমলাকান্তের যে রচনাগুলি প্রকাশিত হয়ে বাঙালী সমাজ-জীবন এবং চরিত্রকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ পরিহাস-রসিকতায় অভিষিক্ত করেছে, তার পরিকল্পনা ট্যাটলার এবং স্পেকটেটরে অ্যাডিসন-স্টীলের বিচিত্র গদ্যরচনা থেকেই হয়তো এসে থাকবে। ইতিপূর্বে নানা বাংলা সাময়িক পত্রে সম্পাদকীয় নিবন্ধে বাঙালী সমাজ সম্বন্ধে প্রয়োজনানুরূপ মন্তব্য বেরিয়েছে, কিন্তু সাময়িক উপলক্ষ-বর্জিত লেখকের বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ এবং রচনাভঙ্গি-সমন্বিত স্বতন্ত্র রচনা—যা পরবর্তী প্রবন্ধ-সাহিত্যের অগ্রদূত—প্রকাশিত হয় নি। এ ধরণের রচনা প্রকাশের পরিকল্পনা বঙ্কিমচন্দ্র যদি ইংরেজি সাহিত্য থেকে পেয়ে থাকেন তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই, স্বীকার করতেও দ্বিধার কারণ নেই। সামাজিক বিষয়ের পর্যবেক্ষণের সূত্রেই অ্যাডিসনের রচনায় সার্ রোজার ডি কভার্লির মতো চরিত্র এসেছে। অন্য দিক দিয়ে তুলনা না করেও বলা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক রচনায় এবং কমলাকান্তের দপ্তরে এই সূত্রেই বহু কাল্পনিক চরিত্র ভিড় করে এসেছে। মুচিরাম গুড়, কমলাকান্ত চক্রবর্তী, নসীরাম, ভীষ্মদেব খোশনবিশ প্রভৃতিকে নানা-উদ্দেশ্য-সাধনে উদ্ভাবন করতে হয়েছে।

কমলাকান্তে বঙ্কিমচন্দ্র একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। নেশাগ্রস্ত কমলাকান্তের মুখ দিয়ে নানা মন্তব্য করানো ডি কুইন্সীর 'কন্‌ফেশনে'র অনুরূপ সন্দেহ নেই, যদিও ডি কুইন্সীর মন্তব্যগুলির সঙ্গে কমলাকান্তের গভীরচিন্তাদ্যোতক নৈর্ব্যক্তিক মন্তব্য ও সিদ্ধান্তগুলির তুলনা চলে না। ডি কুইন্সীর আফিমখোর তার নিজের ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনাধারা মাত্র বর্ণনা করে গিয়েছে। কমলাকান্তের বস্তুত কোনো ব্যক্তিগত জীবন নেই। সে নিরাসক্ত, আত্মীয়পরিজনহীন, সংসারবিমুখ। তার চিন্তা বস্তুতই নিজেকে নিয়ে নয়, সংসার ও জীবনের সাধারণ প্রকৃতি ও ধর্ম নিয়ে।

কমলাকান্তের মনে যখন যা আসত ছেঁড়া কাগজে সে সেগুলি লিখে রাখত। একদিন সে তার এই কাগজগুলি ভীষ্মদেব খোশনবিশকে দিয়ে চলে যায়। ভীষ্মদেব লেখেন—

'এ অমূল্য-রত্ন লইয়া আমি কি করিব। প্রথমে মনে করিলাম, অগ্নিদেবকে উপহার দিই। পরে লোকহিতৈষতা আমার চিত্তে বড় প্রবল হইল। মনে করিলাম যে, যে লোকের উপকার না করে, তাহার বৃথায় জন্ম। এই দপ্তরটিতে অনিদ্রার অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ আছে—যিনি পড়িবেন, তাঁহারই নিদ্রা আসিবে। যাঁহারা অনিদ্রা-রোগে পীড়িত, তাঁহাদিগের উপকারার্থে আমি কমলাকান্তের রচনাগুলি প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম!'

পরিত্যক্ত কাগজপত্র অন্যের কাছে গচ্ছিত রাখা এবং তার পর সেই পত্রগুলিকেই প্রকাশ করবার এই কল্পনা স্কটের *Tales of My Landlord* থেকে নেওয়া হতে পারে বলে কেউ অনুমান করেন।[১] ডিকেন্সের পিকউইক ক্লাবেও এই ধরণের ঘটনার উল্লেখ আছে।[২] A Madman's Manuscript নামে সেই অংশটির সূচনাতে আছে—

If it failed to interest him, it might send him to sleep. He took it from his coat-pocket, and drawing a small table towards his bedside, trimmed the light, put on his spectacles and composed himself to read. It was a strange handwriting and the paper was much soiled and blotted

(ডিকেন্সের থেকে কমলাকান্তের জোবানবন্দীর কল্পনাও এসেছিল[৩] সম্ভবত, কিন্তু তুলনা করলেই দেখা যায় বঙ্কিমচন্দ্র এই পদ্ধতি গ্রহণ করলেও সম্পূর্ণ নতুন উদ্দেশ্যে এবং নতুন সিদ্ধিতে পৌঁছেছেন। ডিকেন্সের পাগল উন্মাদরোগগ্রস্ত, তার উন্মত্ততা ব্যক্তিগত ঘটনার ফল, তার পাণ্ডুলিপিতেও নিজের সেই কাহিনী বর্ণনা করেছে। এদিক দিয়ে কমলাকান্তের সঙ্গে তার মিল নেই। জোবানবন্দীতেও কমলাকান্ত আপাতনির্বোধ উক্তি করেছে মাত্র কিন্তু স্যাম অশিক্ষিত গ্রাম্য এবং সরল। তার সরল উক্তিগুলি হাস্যরসের সৃষ্টি করে। ফলে স্যাম সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীর চরিত্রে পরিণত। তার সরল উক্তিতেই পিকউইকের নির্বোধিতা প্রমাণিত।—তাই তার ভূমিকা তত্ত্বভাবনাবর্জিত সহজ ঔপন্যাসিক চরিত্রের ভূমিকা।)

(কমলাকান্তের শিল্পরূপে বিদেশী প্রভাব অস্বীকার্য নয়। এই শিল্পরূপের কোন পূর্বাভাস আমাদের বাংলা সাহিত্যে ছিল না, সে কথাও বলা বাহুল্য। কিন্তু কমলাকান্ত যে ব্যঙ্গের এবং পরিহাসের ভঙ্গিতে সমাজ-সমালোচনা করেছে, তার কিছু পূর্বভূমিকা থাকা অসম্ভব নয়।) নবজাগরণের সূত্রপাতে অভিনব পরিবর্তনগুলি অনেকের কাছে ছিল কৌতুকের বিষয়, অনেকের কাছে ছিল ক্ষোভের বিষয়, অনেকের কাছে ছিল সুদূর তাৎপর্যের বিষয়। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে রক্ষণশীল সমাজের কাছে এই পরিবর্তন ছিল ক্ষোভের কারণ, নব্যবঙ্গের কাছে ছিল গভীর তাৎপর্যবহ। কবি ঈশ্বর গুপ্তের সামাজিক কবিতায় এটাই হয়ে দাঁড়াল কৌতুকের বিষয়। রঙ্গ ব্যঙ্গে পরিহাসে ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর সমকালীন সমাজকে দর্শনীয় করে তুললেন। বঙ্কিমচন্দ্র পরিণত রচনায় তাঁর

১ Priyaranjan Sen. *Western Influence in Bengali Literature* (1967) p. 223

২ The Pickwick Club, chap. XI

৩ The Pickwick Club, chap. XXXIV

বাল্যকালের সাহিত্যশিক্ষাগুরুর কাছ থেকে পাওয়া আদর্শ বিশেষ কিছুই রক্ষা করেন নি, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত-সুলভ হাস্যপরিহাসময় সমাজ-সমালোচনার ভঙ্গি লোকরহস্যে এবং কমলাকান্তের দপ্তরে রক্ষা করেছিলেন।[১] অবশ্য এইটুকুমাত্র বলে ক্ষান্ত থাকা ঈশ্বর গুপ্ত এবং বঙ্কিমচন্দ্র উভয়ের প্রতিই অবিচার। কারণ ঈশ্বর গুপ্ত স্বভাবধর্মবশত উদ্দেশ্য-হীন এবং বিদ্বেষহীন রসিকতা করেছেন কিংবা মজাই শুধু করেছেন ; বঙ্কিমচন্দ্র একটি সুদূর-গভীর জীবনমূল্যবোধ দ্বারা চালিত হয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন। তাঁর রসিকতার সঙ্গে ঘটেছিল মনীষার মিশ্রণ, তাঁর ব্যঙ্গে ছিল উদ্দেশ্য এবং কখনও কখনও বিদ্বেষ—অন্যায়ের প্রতি, পাপের প্রতি।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যায়।(কমলাকান্তের কোনো কোনো রচনায় স্পষ্টতই রূপকের লক্ষণ আছে। আবার কোনো কোনো রচনা ঠিক রূপক না হলেও উক্তিতে এবং মন্তব্যে তাতে রূপকের আভাস আছে। 'পতঙ্গ' বা 'বড়বাজার' রূপকধর্মী রচনা, আবার 'মনুষ্যফল' ও 'বিড়াল' রূপকের আভাস-সমন্বিত। 'পলিটিক্স'এ বৃষ ও কুকুরের অবতারণা পুরোপুরি না হলেও রূপকের আভাস নিয়ে এসেছে। এই বিশিষ্ট ভঙ্গি অবলম্বনে বক্তব্যকে পরিবেশন করা ইংরাজি থেকে এসেছে কি না সন্দেহ, বাংলায় যে এই ভঙ্গি প্রচলিত ছিল তাতে সন্দেহ নেই, বিশেষত রূপক-কবিতাতে।) আধুনিক কালে ঈশ্বর গুপ্ত থেকে রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' 'চিত্রা' পর্যন্ত রূপকের চর্চা হয়েছে। গদ্যের ক্ষেত্রে সম্ভবত অক্ষয়কুমার দত্তই এর প্রবর্তক। অক্ষয়কুমারের চারুপাঠে স্বপ্নদর্শন-বিষয়ক রচনাগুলি এর উদাহরণ।

(রসসৃষ্টি হিসাবে কমলাকান্ত একটি অনুপম সৃষ্টি হলেও এ কথা তো অস্বীকার করার নেই যে এই রচনাগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্র জীবন সম্বন্ধে কয়েকটি গভীর ও গুরু চিন্তাই পরিবেশন করেছেন। বস্তুত 'ফুলের বিবাহে'র মতো কল্পনামূলক লেখাটি ছাড়া অন্য সবগুলিতেই বঙ্কিমের এই উদ্দেশ্যটি বেশ স্পষ্ট। এই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হয় যে, বঙ্গদর্শনের পূর্বে কয়েকটি উপন্যাস প্রকাশ করলেও বঙ্গদর্শনের যুগটাই (১৮৭২-১৮৭৫) চিন্তানায়ক বঙ্কিমের মনীষার দীপ্ত আত্মপ্রকাশের যুগ।) 'বিবিধপ্রবন্ধে' সংকলিত বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধগুলি বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যা থেকেই প্রকাশিত হতে থাকে। 'বিবিধপ্রবন্ধে' বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তার বিভিন্ন বিষয় দেখা দিল। ভারতবর্ষ ও বাংলা দেশের ইতিহাস নিয়ে ভাবনা, আমাদের বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ, আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব, লোকজীবনচিন্তা, প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য-সমা-

১ শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় 'বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ে' এর উল্লেখ করেছেন।

লোচনা, ফাইন আর্টস বা সূক্ষ্মশিল্প বিশ্লেষণ—এইসব নতুন ধরণের চিন্তাবস্তু বঙ্কিমচন্দ্র সুসংহত রূপে ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধের আকারে বাঙালী পাঠকের চেতনাগোচর করলেন। বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধগুলিকে দুই দিক দিয়ে দেখা যায়। প্রথমত জীবন ও সমাজের বিবরণ ও বিশ্লেষণ, দ্বিতীয়ত নতুনতর মূল্যবোধ বা আদর্শচিন্তা। প্রথম রীতিটি ঐতিহাসিকের দ্বিতীয় রীতিটি তত্ত্বদর্শী দার্শনিকের। অবশ্য এই রীতিভাগ নেহাতই স্থূল, বিশেষত সাহিত্যের ক্ষেত্রে। কারণ সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনেক সময়েই দুইই মিশে থাকে, বিচার-বিশ্লেষণের সঙ্গে ভাবের অন্তর্দৃষ্টি যুক্ত না হলে কোনো রচনাই গভীরতা অর্জন করে না। বঙ্কিমের প্রবন্ধ-রচনার সাফল্য বস্তুতই এই দুয়েরই মিশ্রণের ফল। এ-কথা অনস্বীকার্য হলেও পরবর্তী বঙ্কিমকে মূলত আমরা দার্শনিক হিসাবেই পাই, বঙ্গদর্শনের বঙ্কিমকে পাই বিশ্লেষণপরায়ণ মনীষী হিসাবে। তাঁর এই চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটেছে কমলাকান্তের দপ্তরে, কিন্তু এ কথা সহজেই অনুমেয় যে কমলাকান্তের দপ্তরের অভিনব রসসৃষ্টির মূলে কেবল বিচারই নেই, থাকতেও পারে না, বরং কমলাকান্ত চক্রবর্তীর অধীর উন্মাদনার প্রেরণামূলে ছিল জীবন সম্বন্ধে ধ্রুব বিশ্বাস, প্রীতি, আদর্শ ও মূল্যবোধ। কমলাকান্তকে কেউ কেউ যে কবি ও দার্শনিক বলে অভিহিত করেছেন তার কারণ এই। 'বিবিধপ্রবন্ধ' যেমন মূলত ঐতিহাসিক বোধ ও বিচারের সৃষ্টি, 'কমলাকান্তের দপ্তর' তেমনি তত্ত্ব ও আদর্শবোধের সৃষ্টি।

এই তত্ত্ব এবং নবমূল্যবোধ অবশ্য বিবিধপ্রবন্ধেও ছিল। বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যাতেই 'ভারতকলঙ্ক' প্রকাশিত হয়েছে। ভারতকলঙ্ক শুধু ইতিহাস-বিশ্লেষণ নয়, গভীর জাতীয়তাবাদেরও অভিব্যক্তি। বঙ্কিমমানসে জাতীয়তাবাদের প্রথম উন্মেষ আমরা দেখি 'মৃণালিনী'তে। প্রবন্ধের ক্ষেত্রে তার পরে পাই ভারতকলঙ্ক। অতঃপর বিভিন্ন রচনার মধ্যেই জাতীয়তাবাদী প্রেরণা অন্তঃসঞ্চারী হয়ে আছে। তাঁর সমাজবিষয়ক লেখাগুলিতেও এই প্রেরণাই কাজ করেছে। এই প্রেরণার বশেই তিনি বাঙালী সমাজকে সমালোচনা করেছেন ধিক্কার দিয়েছেন, নিন্দা করেছেন, লোকরহস্যের 'হনুমদ্বাবুসংবাদ' লিখেছেন, 'বঙ্গদেশের কৃষক' লিখেছেন। পরবর্তী কালেও 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা' ও বাংলার ইতিহাস বিষয়ক অন্যান্য প্রবন্ধাবলীর মূলেও প্রেরণারূপে নিহিত ছিল গভীর দেশপ্রেম। আধুনিক বাংলার সমাজে ও চিন্তায় দেশপ্রেম বঙ্কিমচন্দ্রের একটি মহৎ দান। এই দেশানুরাগ ইতিহাসবোধজাত। ধর্মতত্ত্বে দেশপ্রেমের যে ব্যাখ্যা আছে, সে অবশ্য তত্ত্বের ব্যাখ্যা, সেখানে দেশপ্রেমকে যুক্তি দিয়ে তার অন্যনিরপেক্ষ মূল্যবত্তা সৃষ্টি করেছেন।

কমলাকান্তে বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রেম উন্মত্ত আবেগের মধ্য দিয়ে উদাত্ত ঝঙ্কারে

গীতিময় হয়েছে। বিশেষ করে 'আমার দুর্গোৎসব' এবং 'একটি গীত'-এ।| 'একটি গীত' রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা দেশের ইতিহাসকে অবলম্বন করে তাঁর অন্তঃনিরুদ্ধ আবেগকে দিগন্তব্যাপী হাহাকারে অবারিত করে দিয়েছেন—

'চাহিবার এক শ্মশানভূমি আছে—নবদ্বীপ। সেইখানে সপ্তদশ যবনে বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল। বঙ্গমাতাকে মনে পড়িলে, আমি সেই শ্মশানভূমির প্রতি চাই। যখন দেখি, সেই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম বেড়িয়া অদ্যাপি সেই কলধৌতবাহিনী গঙ্গা তর তর রব করিতেছেন, তখন গঙ্গাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি—তুমি আছ, সে রাজলক্ষ্মী কোথায় ? তুমি যাঁহার পা ধুয়াইতে, সেই মাতা কোথায় ? তুমি যাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতে, সেই আনন্দরূপিণী কোথায় ? তুমি যাঁহার জন্য সিংহল, বালী, আরব, সুমিত্রা হইতে বুকে করিয়া ধন বহন করিয়া আনিতে, সে ধনেশ্বরী কোথায় ?…মনে মনে দেখিতে পাই মার্জিত বর্ষাফলক উন্নত করিয়া, অশ্বপদশব্দমাত্রে নৈশ নীরব বিঘ্নিত করিয়া, যবনসেনা নবদ্বীপে আসিতেছে। কাল পূর্ণ দেখিয়া নবদ্বীপ হইতে বাঙ্গালার লক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইতেছেন।'

মুসলমানদের দ্বারা বাংলা বিজয়ের ঐতিহাসিক ঘটনাকে বঙ্কিম উপন্যাসে এবং প্রবন্ধে বিভিন্ন উপলক্ষে স্মরণ করেছেন। এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না এই ঘটনার স্মৃতি থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের দেশাত্মবোধক কাব্যোচ্ছ্বাসের সূত্রপাত হয়েছে। 'মৃণালিনী' এই বাংলা-জয়ের কাহিনী নিয়ে পরিকল্পিত। সপ্তদশ অশ্বারোহী বাংলা জয় করেছে, এই কিংবদন্তীর লজ্জা বঙ্কিমকে দীর্ঘকাল পীড়া দিয়েছে। কিন্তু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রথম শিক্ষা বাংলার ইতিহাস' (১৮৭৪) পড়েই খুব সম্ভবত এই কাহিনীর অলীকত্ব সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ হন। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ওই বইয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসামূলক সমালোচনা বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করেন 'বাঙ্গালার ইতিহাস' নাম দিয়ে (মাঘ ১২৮১)। তাতে তিনি বলেন—

'সপ্তদশ পাঠান কর্তৃক বঙ্গজয় হইয়াছিল, এ কলঙ্ক মিথ্যা। সপ্তদশ পাঠান কর্তৃক কেবল নবদ্বীপের রাজপুরী বিজিত হইয়াছিল।'

(কমলাকান্তের 'একটি গীত' বঙ্গদর্শনের ঠিক পরের সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয় (ফাল্গুন ১২৮১)। প্রবন্ধে যেটা তথ্য রূপে মাত্র সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল, 'একটি গীতে' সেটাই গভীর আবেগে ও বেদনায় আর্তকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে। ইতিহাস-আলোচনায় আবেগ ছিল নিরুদ্ধ, কমলাকান্তে সেই আবেগ হৃদয় বিদীর্ণ করে উৎসারিত। অতঃপর সঞ্জীবচন্দ্র-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে (অগ্রহায়ণ ১২৮৭) 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' প্রবন্ধটিতেও সেই একই ঐতিহাসিক ঘটনার বিচার-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বললেন—

'বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে, তাহা ইতিহাস নয়, তাহা কতক উপন্যাস, কতক বাঙ্গালার বিদেশী বিধর্মী অসার পরপীড়কদিগের জীবনচরিত মাত্র। বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নইলে বাঙ্গালীর ভরসা নাই। কে লিখিবে?

'তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী তাহাকেই লিখিতে হইবে। মা যদি মরিয়া যান, তবে মার গল্প করিতে কত আনন্দ। আর এই আমাদিগের সর্বসাধারণের মা জন্মভূমি বাঙ্গালাদেশ, ইহার গল্প করিতে কি আমাদিগের আনন্দ নাই?'

এই আবেগ এই বচনভঙ্গি এই মাতৃভাবনা কমলাকান্তের, এ কথা সহজেই অনুভব করা যায় 'আমার দুর্গোৎসব' রচনাটির সঙ্গে তুলনা করলে। বঙ্কিম-সাহিত্যে এই প্রবন্ধটির একটি বিশেষ স্মরণীয়তা আছে, কেননা আনন্দমঠের মাতৃরূপের পূর্বাভাস ছিল এখানেই। 'একটি গীতে'র তিন মাস পূর্বে এই রচনাটি প্রকাশিত হয় (কার্তিক ১২৮১)। এতে কিন্তু ইতিহাস-অনুষঙ্গ নেই, লক্ষ্মণসেন প্রভৃতির কোনো অবতারণা নেই। স্পষ্টতই বঙ্কিম এখানে দেশপ্রেমের সহজাত সংস্কারকে যুক্তি ও তথ্যের অবলম্বন থেকে মুক্ত করে অন্যনিরপেক্ষ নিজস্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দেশজননীকে তিনি হিন্দু বাঙালীর সহজ ধর্মীয় সংস্কারের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। কমলাকান্তের আর কোনো দেবী নেই দেশলক্ষ্মী ছাড়া, আর কোনো পূজা নেই দেশপূজা ছাড়া। বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের উত্তরার্ধে ধর্মতত্ত্বে মনুষ্যচরিত্রের নীতি স্থির করতে গিয়ে দেশভক্তিকেও তার চারিত্র্যনীতির অন্তর্গত করেছিলেন। তার সূচনা এখানে।

তা ছাড়া আনন্দমঠের কেন্দ্রীয় ভাবটির সূচনাও এখানে। সন্তানদের পূজ্যা দেশ-জননী দশভুজার পরিকল্পনাতেই পরিকল্পিত। আনন্দমঠের দেশজননী-মূর্তি বলিষ্ঠ ভাবের উদ্দীপক, ঐশ্বর্যময়ী। পতিত অবসন্ন জাতির হৃদয়ে শক্তি ও উৎসাহ সঞ্চার করে রজোগুণান্বিত করে তুলতে পারে এমনি ভাবেই সেই মূর্তি রচনা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। 'আমার দুর্গোৎসবে'র মাতৃমূর্তি-বর্ণনাতেও সেই ঐশ্বর্যভাবের স্বপ্নেই কমলাকান্ত মগ্ন—

'চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী-মৃত্তিকারূপিণী-অনন্তরত্নভূষিতা—একণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশভুজ—দশদিক—দশ দিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দিত, পদাশ্রিত বীরজন কেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত!')

আনন্দমঠের মূল ভাবটি 'বন্দে মাতরম্' গানটিতে সংহত হয়ে জাতীয় ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। যে দেশরূপের কল্পনা বঙ্কিম-মানসে উদ্ভাসিত হয়েছিল, তারই

যথার্থ মন্ত্ররূপ হচ্ছে এই সংগীত। বন্দে মাতরম্ আনন্দমঠে যথাযোগ্যভাবে সন্নিবিষ্ট হলেও, মনে রাখতে হবে, গানটি লেখা হয়েছিল কমলাকান্তের দপ্তরের সমকালে। এ বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য সংকলিত আছে বঙ্কিমপ্রসঙ্গে।[১] বঙ্কিমচন্দ্র যখন বঙ্গদর্শনের সম্পাদক তখনই গানটি রচিত হয়েছিল। এই ঘটনা অবশ্যই ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে। কারণ বঙ্কিমচন্দ্র তার পর আর সম্পাদক ছিলেন না। ঠিক কোন্ সময়ে এই গানটি রচিত হয়েছিল সে তারিখ নির্দিষ্ট ভাবে জানা না গেলেও 'আমার দুর্গোৎসব' লেখার সমসাময়িক কালেই যে গানটি রচিত তাতে সন্দেহ করা চলে না। দুর্গামূর্তির সঙ্গে দেশজননী কি করে অভিন্ন হয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিকে অধিকার করেছিল, সেই ইতিহাসও জানা যায়। একবার অষ্টমী পূজার দিন রাত্রিতে বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহে একজন কীর্তন-গায়ক বলরাম দাসের 'এসো এসো বঁধু'-পদটি গান করেন। গানের মাধুর্য বঙ্কিমচন্দ্র এবং তাঁর অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রকে অনেকক্ষণ অভিভূত করে রাখে। কীর্তন-গায়ক আরও অন্য গান করেন কিন্তু এই গানটি বারবার শুনেই সেই রাত্রি ভোর হল।[২] এই ঘটনার স্মৃতিতেই বঙ্কিম কমলাকান্তের দপ্তরে লিখেছিলেন—

'যখন এই গান প্রথম কর্ণ ভরিয়া শুনিয়াছিলাম, মনে হইয়াছিল নীলাকাশতলে ক্ষুদ্র পক্ষী হইয়া এই গীত গাই— মনে হইয়াছিল সেই বিচিত্র সৃষ্টিকুশলী কবির সৃষ্টি দৈববংশী হইয়া, মেঘের উপর যে বায়ুস্তর—শব্দশূন্য, দৃশাশূন্য, পৃথিবী যেখান হইতে দেখা যায় না, সেইখানে বসিয়া, সেই মুরলীতে একা এই গীত গাই[৩]— এই গীত কখনও ভুলিতে পারিলাম না।'

সেই দুর্গাপূজার উপলক্ষের সঙ্গে বৈষ্ণব কবির এই গানটি মিশে গেল। গানের বঁধু হলেন দেবী দুর্গা, বঙ্কিমের তীব্র দেশাকাঙ্ক্ষার প্রতিমায় তিনিই হলেন রূপান্তরিত।

আধুনিক বাঙালীর চিন্তার জগতে যেসব নতুন মূল্যবোধ তৈরি হয়েছে দেশাত্মবোধ তার অন্যতম। দেশের সম্বন্ধে ভাবনা অবশ্য বঙ্কিমেই প্রথম নয়, তাঁর পূর্বে যাঁরা এসেছিলেন, রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর পর্যন্ত, সকলেই নানা ভাবে জাতি দেশ এবং সমাজের চিন্তা করে গিয়েছেন। পূর্বে সমাজপতিরা নিজের সমাজের চিন্তাই করেছেন, সে-সমাজ আচারচিহ্নাঙ্কিত সাম্প্রদায়িক সমাজ। আধুনিক কালেই সেই সাম্প্রদায়িক সমাজের ঊর্ধ্বে দেশভাবনা নবশিক্ষিতদের মধ্যে স্থান করে নিল। এই নতুন ভাবের

১ 'বঙ্কিমপ্রসঙ্গে' পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা' এবং ললিতচন্দ্র মিত্রের 'বন্দে মাতরম্' প্রবন্ধ দুটি দ্রষ্টব্য।

২ বঙ্কিমপ্রসঙ্গ 'এস এস বঁধু এস', পৃ ৬১-৬৪

৩ তুলনীয় শেলির স্কাইলার্ক কবিতা— বর্তমান লেখক

প্রেরণা রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনেরই ফল, তারই সঙ্গে জড়িত আমাদের শিক্ষা এবং সংস্কৃতি। আমরা এই পরিবর্তনকে পরম আগ্রহেই বরণ করে নিয়েছিলাম। নবশিক্ষিত বাঙালী ভদ্রসমাজ এই পরিবর্তনেরই সৃষ্টি। কিন্তু নতুন শিক্ষা দেশের চিত্তকে কতখানি আঁলোকিত করেছে, এই প্রশ্ন বঙ্কিমচন্দ্রই তুলেছিলেন। এই প্রশ্ন বস্তুত জাতির জীবন-মরণের প্রশ্ন। আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতির কাম্যতা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন ছিলেন নিঃসংশয় তেমনি অভ্রান্ত দূরদর্শী চিন্তাশীলরূপে এই শিক্ষার প্রসার ও প্রকৃতি সম্পর্কেও তিনি ছিলেন উদ্বিগ্ন। সভ্যতার একটি প্রধান লক্ষণ হচ্ছে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি, কল-কারখানা, জীবিকা-অর্জনের নানা নতুন নতুন উপায়। বঙ্কিমচন্দ্র চোখের উপরেই রেলওয়ে টেলিগ্রাফ সংবাদপত্র প্রভৃতির বিস্তার দেখেছেন। বাঙালী ধনশালী ব্যক্তিরা ব্যবসায়-বাণিজ্যের দিকে ঝুঁকেছেন, ফলে দেশে অর্থনৈতিক অবস্থারও পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু এই বাহ্যসম্পদের বিস্তার আমাদের চিত্তকেও সম্পদশালী করল কি? বোধ হয় আধুনিক সভ্যতার প্রকৃতিতেই এই স্ববিরোধ। রক্তকরবীর রাজভাণ্ডারের মতো সমাজের সম্পদ পুঞ্জীভূত হয় কিন্তু রাজা যেমন হৃদয়ের ধনে রিক্ত, বর্তমান সভ্যতাও তেমনি হৃদয়ের সম্পদে রিক্ত। সমাজের নাগরিকশ্রেণীর মধ্যে সম্পদের বিস্তার ঘটেছে কিন্তু সেজন্য বৃহত্তর লোকসমাজের জন্য কারো ভাবনা নেই। আধুনিক সভ্যতা মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক করে তুলেছে মাত্র। কমলাকান্তের দপ্তরে 'আমার মন' রচনাটি বর্তমান সভ্যতার শূন্যতাকে আশ্চর্যভাবে উদ্‌ঘাটিত করেছে—

'ইংরেজ জাতি বাহ্যসম্পদ বড় ভালবাসেন— ইংরেজি সভ্যতার এইটিই প্রধান চিহ্ন— তাঁহারা আসিয়া এদেশের বাহ্যসম্পদ সাধনেই নিযুক্ত—আমরা তাহাই ভাল-বাসিয়া আর সকল বিস্মৃত হইয়াছি। ভারতবর্ষের অন্যান্য দেবমূর্তিসকল মন্দিরচ্যুত হইয়াছে—সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত কেবল বাহ্যসম্পদের পূজা আরম্ভ হইয়াছে। দেখ, কত বাণিজ্য বাড়িতেছে—দেখ, কেমন রেলওয়েতে হিন্দুভূমি জালনিবদ্ধ হইয়া উঠিল—দেখিতেছ, টেলিগ্রাফ কেমন বস্তু। দেখিতেছি, কিন্তু কমলাকান্তের জিজ্ঞাসা এই যে তোমার রেলওয়ে টেলিগ্রাফে আমার কতটুকু মনের সুখ বাড়িবে? আমার এই হারোনো মন খুঁজিয়া আনিয়া দিতে পারিবে?'

এই সম্পদের বিস্তারের কথা দিয়েই বঙ্কিমচন্দ্র শুরু করেছেন তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'বঙ্গদেশের কৃষক'। এই প্রবন্ধে তিনি উজ্জ্বল রঙে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ছবি এঁকেছেন। 'বঙ্গদেশের কৃষকে'র আরম্ভেই বঙ্কিম অধীর চিত্তে উপস্থাপিত করেছেন দেশের বৃহৎ জনসাধারণের বঞ্চনার দৃশ্য। সমাজ এগিয়ে যাচ্ছে এই জন-সাধারণকে বুভুক্ষু বঞ্চিত রেখেই। এ জন্য কারো কোনো বেদনা নেই। এই হৃদয়হীনতাই

আধুনিক সভ্যতাকে করেছে শূন্যগর্ভ। এই বেদনা কমলাকান্তেরও। তবে কমলাকান্তের বেদনাবোধ আরও সর্বব্যাপী গভীর হয়ে উঠেছে। এই বেদনা সাময়িকতাকে অতিক্রম করে সেই চিরন্তন প্রশ্নেই যেন পৌছেছে—যেনাহং নামৃতা স্যাম্ তেনাহং কিং কুর্যাম্। এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছিলেন বুদ্ধদেব—

'সার্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্বে শাক্যসিংহ এই কথা কত প্রকারে বলিয়া গিয়াছেন। তাহার পর শত সহস্র লোকশিক্ষক শত সহস্র বার এই শিক্ষা শিখাইয়াছেন। কিন্তু কিছুতেই লোক শিখে না—কিছুতেই আত্মাদরের ইন্দ্রজাল কাটাইয়া উঠিতে পারে না। আবার আমাদের দেশ ইংরেজি মুলুক হইয়া এ বিষয়ে বড় গণ্ডগোল বাধিয়া উঠিয়াছে। ইংরেজি শাসন, ইংরেজি সভ্যতা ও ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মেটেরিয়াল প্রস্পেরিটির উপর অনুরাগ আসিয়া দেশ উৎসন্ন দিতে আরম্ভ করিয়াছে।'

এই জীবনজিজ্ঞাসা কমলাকান্তকে করেছে দার্শনিক, ধর্মতত্ত্বে বঙ্কিমচন্দ্র যার একটা সুসংহত উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন। সেই চিরন্তন প্রাচীন জিজ্ঞাসাই বঙ্কিমের চিন্তায় আধুনিক যুগের উপযোগী হয়ে দেখা দিল। বাহ্যসম্পদের অনাবশ্যকতা কিংবা মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার অর্থহীনতা প্রতিপন্ন করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়, সে-রকমের সন্ন্যাসবাদ বঙ্কিমচন্দ্রের মতবাদের অনুকূল ছিল না। বাহ্যসম্পদের ভোগ সম্বন্ধে বঙ্কিম বলেছেন[১] —

'গীতোক্ত এই ধর্ম Ascetic-Philosophy নহে— প্রকৃত পুণ্যময় ও সুখময় ধর্ম। বিষয়ের উপভোগ ইহাতে নিষিদ্ধ হইতেছে না, তবে ইহার পরিমাণ ও উপযুক্ত বিধি কথিত হইয়াছে।'

কর্মসাধন সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন[২]—

'ইংরেজরা যাহাকে Asceticism বলেন বৈরাগ্য শব্দে তাহা বুঝায় না। এই পরম পবিত্র ধর্মে সেই পাপের মূলোচ্ছেদ হইতেছে। ইহাতে সর্বত্রই সেই পবিত্র বৈরাগ্য, সকর্ম বৈরাগ্য; অথচ Asceticism কোথাও নাই।'

কমলাকান্ত বলেছে সংসার ও জীবনের প্রতি উদাসীন না হয়ে সম্পদকে লোককল্যাণে লাগানোই পূর্ণতা ও সার্থকতা; তা না হলে সভ্যতাবৃদ্ধির বস্তুতই কোনো সার্থকতা নেই। সংসার-উদাসীনতা যেমন অর্থহীন লোককল্যাণহীন স্বার্থসাধন তেমনি মনুষ্যস্বভাবের দীনতাকেই প্রকাশ করে। কমলাকান্ত পরিহাস করে যে কথা বলেছে, সেটা বস্তুত ধর্মতত্ত্ব-প্রণেতা বঙ্কিমচন্দ্রেরই কথা।—

'সুখে আমার অধিকার নাই, কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিও না যে তোমরা বিবাহ

১ বঙ্কিমচন্দ্র-ব্যাখ্যাত শ্রীমদ্ভগবদগীতা ২য় অধ্যায়

২ ধর্মতত্ত্ব, ষোড়শ অধ্যায়

করিয়াছ বলিয়া সুখী হইয়াছ। যদি পারিবারিক স্নেহের গুণে তোমাদের আত্মপ্রিয়তা লুপ্ত না হইয়া থাকে, যদি আত্মপরিবারকে ভালবাসিয়া তাবৎ মনুষ্যজাতিকে ভালবাসিতে না শিখিয়া থাক, তবে মিথ্যা বিবাহ করিয়াছ; কেবল ভূতের বোঝা বহিতেছ।'

আত্মপরায়ণতাকে বিশ্বপরায়ণতায় রূপান্তরিত করা সম্ভব যে উপায়ে তার নাম প্রীতি-বৃত্তি। কমলাকান্তের উক্তিতে সেই কথাই প্রকাশিত। ধর্মতত্ত্বে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন 'মনুষ্যে প্রীতি ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি নাই'।[১] এ তত্ত্ব নিশ্চয়ই নতুন। সনাতন ঈশ্বরপ্রীতি স্বতন্ত্র এবং স্বয়ংপূর্ণ অন্যনিরপেক্ষ বস্তু। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের কথায় মনে হয় মানুষকে যথার্থত ভালোবাসতে পারলে ঈশ্বরপ্রীতির জন্য ভিন্নতর সাধনার আর প্রয়োজন নেই। এই প্রীতিতত্ত্ব বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তায় একটি প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। ধর্মতত্ত্বে যে জীবন-সমস্যার আলোচনা ছিল তার শেষ সমাধান ছিল প্রীতি-তত্ত্বে।

কমলাকান্ত এই প্রীতি-তত্ত্বের সুস্পষ্ট অনুপ্রেরণাতেই অনুপ্রেরিত। কমলাকান্তের ব্যঙ্গবিদ্রূপ পরিহাস বস্তুতই গভীর মানবপ্রীতির রূপান্তরিত প্রকাশ। 'কমলাকান্তের বিদায়ে' কমলাকান্ত বলেছে—

'একার এত বন্ধন কেন? সে পাখিটি পুষিয়াছিলাম—কবে মরিয়া গিয়াছে—তাহার জন্য আজিও কাঁদি; যে ফুলটি ফুটাইয়াছিলাম—কবে শুকাইয়াছে— তাহার জন্য আজিও কাঁদি; যে জলবিম্ব একবার জলস্রোতে সূর্যরশ্মি সম্প্রভাত দেখিয়াছিলাম—তাহার জন্য আজিও কাঁদি। কমলাকান্ত অন্তরে অন্তরে সন্ন্যাসী— তাহার এত বন্ধন কেন?'

(কমলাকন্তের দপ্তরের প্রথম রচনা 'একা'। এই রচনাটি কমালাকান্তের দপ্তর পর্যায়ে প্রথম লিখিত। এতে বস্তুত কমলাকান্তের স্বাভাবিক এবং সুপরিচিত ঢঙটি তেমন নেই। আফিং প্রসন্ন গোয়ালিনী প্রভৃতির প্রসঙ্গ এতে নেই; পরিহাসচতুর বচনভঙ্গিও নেই। নীচে 'শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী' এই নামটি মাত্র আছে; তা না হলে রচনাটি একটি নাতিদীর্ঘ আত্মভাবমূলক আবেগপূর্ণ রচনা। ভঙ্গিতে কোথাও লঘুতা নেই। এই চমৎকার রচনাটিতে কমলাকান্ত বঙ্কিমচন্দ্রের সেই প্রীতি-তত্ত্বটিকেই বড়ো মধুর করেই উচ্চারিত করেছে।—

'কেহ একা থাকিও না। যদি অন্য কেহ কেহ তোমার প্রণয়ভাগী না হইল, তবে তোমার মনুষ্যজন্ম বৃথা।

১ ধর্মতত্ত্ব, ২১ অধ্যায়

ধর্মতত্ত্বের উপরে উদ্‌ধৃত উক্তিটির প্রতিধ্বনি পাই এই রচনার শেষাংশে—

'প্রীতি সংসারে সর্বব্যাপিনী—ঈশ্বরই প্রীতি। প্রীতিই আমার কর্ণে এক্ষণকার সংসারসংগীত। অনন্তকাল সেই মহাসংগীত সহিত মনুষ্যহৃদয়তন্ত্রী বাজিতে থাকুক। মনুষ্যজাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাই না।')

কপালকুণ্ডলায় নবকুমারের পরোপকারবৃত্তিতে এই মনুষ্যপ্রীতি-ভাবনার সূত্রপাত বলা যেতে পারে। চন্দ্রশেখরে রামানন্দ স্বামীর সঙ্গে চন্দ্রশেখরের কথোপকথনেও তার বিস্তার। প্রায় সমসাময়িক রচনা রজনী উপন্যাসেও ব্যর্থ উদাসীন অমরনাথের মধ্যেও 'একা' রচনাটির মূল ভাবটির ছায়া আছে মনে হয়। 'একা'র নিঃসঙ্গ বিষণ্ণতার ভাবটি রজনীর অমরনাথের আত্মকাহিনীতে পরিব্যাপ্ত। কমলাকান্তের মতো অমরনাথও নিঃসঙ্গ সংসার-উদাসীন অথচ মহাপ্রাণ। অবশ্য অমরনাথের উদাসীনতার মূলে যে-ঘটনা আছে, সেটাই অমরনাথকে উপন্যাসের উপযোগী বিশিষ্ট নায়কে পরিণত করেছে। কমলাকান্তের সংসার-উদাসীনতার কোনো কারণ আমরা জানি না। কিন্তু 'একা'তে কমলাকান্তকে দেখি যৌবনধর্ম-বিষয়ে মোহমুক্ত কিন্তু প্রীতির ধর্মে দীক্ষিত, অমরনাথও 'ভবের হাটের দোকানপাট' তুলতে ব্যস্ত কিন্তু পরোপকারসাধনে প্রীতির দ্বারাই অনুপ্রাণিত।

(কমলাকান্তের দপ্তরের এই রচনাটির আর-একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার মতো। বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মভাবমূলক রচনা নেই ; গদ্যের এই রীতি সেকালে প্রায় অপ্রবর্তিত ছিল বলা যায়। 'আত্মচরিতরচনা'র কথা বলছি না, নিজের মনের ভাব মিশিয়ে শিল্প-রচনায় গদ্যের যে বিশিষ্ট রীতি তৈরি হয় যার সর্বোত্তম উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের বহু রচনা— উনিশ শতকে সেই রীতি সুলভ ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিষয়প্রধান রচনাতে এই রীতির স্পর্শ সহজেই অনুভব করা যায়। বঙ্কিমের রচনাভঙ্গি যুক্তিমূলক, সেদিক থেকে 'একা' রবীন্দ্রনাথের পূর্বে একক এবং অভিনব। ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'বিবিধ প্রসঙ্গ' বইতে আত্মভাব-মূলক রচনাধারার সূত্রপাত হয়। তার পর 'বিচিত্র প্রবন্ধে' 'ছিন্নপত্রে' এই রচনারীতি বাংলা সাহিত্যে একটি স্থায়ী অনুপম শিল্পরূপ সৃষ্টি করে তুলেছে। এই রচনাগুলি ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতি সাধারণ ভাবেই আত্মভাবময় বলে বর্ণনা করলে অন্যায় হয় না। উপরন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যরীতিতে যুক্তি তথ্য প্রমাণ ইত্যাদি বহিরঙ্গ বক্তব্যবন্ধনই বড়ো। বোধ হয় একমাত্র কমলাকান্তের 'একা' রচনাটিতেই তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। এখানে কমলাকান্ত শুধুই নিজের মনের পলাতক আলোছায়া নিয়েই মালা গেঁথেছে।)

(কমলাকান্তের দপ্তরে প্রথম প্রবন্ধ রূপে 'একা' সন্নিবিষ্ট। যদিও রচনারীতিতে এই

প্রবন্ধটি বিশিষ্ট, তথাপি এই বইয়ের মুখবন্ধরূপে এর সন্নিবেশ বিশেষ অর্থপূর্ণ। যৌবনের স্বপ্নদ্রষ্টা সৌন্দর্যপ্রেমিক প্রাণচঞ্চল কমলাকান্ত জীবনের অভিজ্ঞতার দীর্ঘ পথপরিক্রমা করে এখন দেখছে এই জগৎটাকে আপাতদৃষ্টিতে যেমন দেখায় বস্তুত তা নয়। প্রথম বয়সের মুগ্ধতা রূপান্তরিত হয় প্রৌঢ় বয়সের সংশয়-দ্বিধায়, সৌন্দর্যকে মনে হয় মোহিনী, বাস্তব হয়ে যায় স্বপ্ন। কমলাকান্তের যে লেখাগুলিকে ভীষ্মদেব খোশনবিশ প্রলাপোক্তি মনে করেছে, সেগুলি আসলে প্রৌঢ় কমলাকান্তের মোহভঙ্গের করুণ কাহিনী। কঠিন অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে কমলাকান্ত জেনেছে, জীবনের সব-কিছুই ঠিক আছে ভেবে আত্মতৃপ্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই। এই জন্যই কঠিন আঘাত দিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে কমলাকান্ত বাঙালী জাতিকে সচেতন করতে চেয়েছে। উনিশ শতকের বাঙালী জাতি নবশিক্ষার অভিমানে আত্মতৃপ্ত, অহংকৃত। কিন্তু মনুষ্যপ্রীতির শিক্ষাই সবচেয়ে বড়ো শিক্ষা, এই শিক্ষাই মানুষকে আত্মস্থ করে, যৌবনে ও বার্ধক্যে অচলপ্রতিষ্ঠ করে। সেই শিক্ষা সে পেয়েছে কি ?

যে কাজ কমলাকান্ত ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ দিয়ে করতে চেয়েছে, সেই কাজই বঙ্কিমচন্দ্র যুক্তিপরম্পরা এবং তথ্যসহযোগে তাঁর বিবিধপ্রবন্ধে এবং অন্যত্র করতে চেয়েছেন অর্থাৎ জীবনের সত্যমূল্য নির্ধারণ করতে। যেমন সুপরিচিত 'বিড়াল' প্রবন্ধটিতে ধনী-দরিদ্রের যে ধনবৈষম্যের তীব্র বিদ্রূপ করা হয়েছে, এক বৎসর আগে বঙ্গদর্শনের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় (১২৮০) 'সাম্য' প্রবন্ধটিতে তার বিস্তারিত যুক্তিপূর্ণ আলোচনা বঙ্কিম করে-ছিলেন। পরবর্তীকালে বঙ্কিম 'সাম্য' আর ফিরে ছাপেন নি, কিন্তু 'বিড়াল' আজ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাপ্রবৃত্তির অগ্রগামিতার প্রমাণ স্বরূপ বিরাজমান।

কমলাকান্ত যদি অভিনিবেশ-সহকারে পড়া যায় তবে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধসাহিত্যে নিবদ্ধ বঙ্কিমী চিন্তার বহু ভাববীজ এতে পাওয়া যাবে, শুধু তা-ই নয়, বঙ্কিমের উপন্যাসের ভাববস্তুর চিহ্নও এতে পাওয়া যাবে। তাঁর উপন্যাসের মূল বিষয়ই ছিল নরনারীর প্রেম। এই প্রেমের যে পরিণাম তিনি এঁকেছেন অথবা তাকে যে রূপ দিয়েছেন সেটা উপন্যাসশিল্পের বিচার্য বিষয়। কিন্তু নরনারীর পারস্পরিক আকর্ষণের অনিবার্যতাকে বঙ্কিমচন্দ্র কখনোই অস্বীকার করেন নি। এর সত্য প্রকৃতিরই সত্য, দিনরাত্রি আলো-অন্ধকার ঝড়বৃষ্টির মতোই বাস্তব। এরই ভিতর দিয়ে বরং তিনি এমন একটি অন্ধ শক্তির লীলাকে দেখেছিলেন যার ভয়ংকরতা এবং সৌন্দর্য দুয়েই তিনি ছিলেন অভিভূত। বঙ্কিমচন্দ্রের সব উপন্যাসই এই বিষয়টিকে নিয়েই আবর্তিত। কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ, রজনী, চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্তের উইল, সীতারাম,

আনন্দমঠ ও রাজসিংহ— প্রায় সবগুলি উপন্যাসই নারীরূপের বহ্নিশিখায় পুরুষের আত্মবিসর্জনেরই কাহিনী। অবশ্য বহ্নির নানা রূপ আছে। কমলাকান্ত বলেছে—

'রূপবহ্নি, ধনবহ্নি, মানবহ্নিতে নিত্য নিত্য সহস্র পতঙ্গ পুড়িয়া মরিতেছে—আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি। এই বহ্নির দাহ যাহাতে বর্ণিত হয়, তাহাকে কাব্য বলি। মহাভারতকার মানবহ্নি সৃজন করিয়া দুর্যোধন-পতঙ্গকে পোড়াইলেন ;—জগতে অতুল্য কাব্যগ্রন্থের সৃষ্টি হইল। জ্ঞানবহ্নিজাত দাহের গীত Paradise Lost। ধর্মবহ্নির অদ্বিতীয় কবি সেণ্ট পল। ভোগবহ্নির পতঙ্গ আণ্টনি ক্লিওপেট্রা, রূপবহ্নির রোমিও ও জুলিয়েত, ঈর্ষাবহ্নির ওথেলো। গীতগোবিন্দ ও বিদ্যাসুন্দরে ইন্দ্রিয়বহ্নি জলিতেছে। স্নেহবহ্নিতে সীতা-পতঙ্গের দাহ জন্য রামায়ণের সৃষ্টি।'

বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাসে পতঙ্গের কাহিনী বর্ণিত আছে, যদিও বহ্নির বিভিন্ন বৈচিত্র্য তিনি দেখান নি। কিন্তু তাঁর উপন্যাসের কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে লেখক বঙ্কিমের মন্তব্যগুলি পতঙ্গ-কাহিনীর সূত্ররূপে কাজ করছে। দুর্গেশনন্দিনী থেকেই যদিও এই বিষয়ের সূত্রপাত, বিষবৃক্ষ উপন্যাসেই এই সূত্রের উল্লেখ স্পষ্ট হয়েছে। মৃণালিনীতে এর আভাস ছিল সত্য, বিষবৃক্ষেই লেখকের মন্তব্যরূপে এই অসংশয়িত মানব-স্বভাবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেখা দিয়েছে। বিষবৃক্ষ নামেই এর পরিচয়। হরদেব ঘোষালের পত্রেও এর ব্যাখ্যা। এই সূত্র আছে রজনীতে[১] অমরনাথের নিজের উক্তিতে, চন্দ্রশেখর উপন্যাসে লেখকের বর্ণনায় এবং চন্দ্রশেখরের আত্মহারা প্রণয়-পিপাসায়।[২] কৃষ্ণকান্তের উইলে গোবিন্দলালের প্রসঙ্গে লেখকের নিজস্ব মন্তব্যটি পতঙ্গ রচনাটিরই প্রতিধ্বনি—

'রূপে মুগ্ধ? কে কার নয়? আমি এই হরিত নীল চিত্রিত প্রজাপতিটির রূপে মুগ্ধ। তুমি কুসুমিত কামিনীশাখার রূপে মুগ্ধ। তাতে দোষ কি? রূপ তো মোহের জন্যই হইয়াছিল।'

আনন্দমঠে রাজসিংহেও রূপমোহজনিত এই আকর্ষণকে বঙ্কিমচন্দ্র বড়ো তীব্র করেই দেখিয়েছেন। এটাই যেন জীবজগতের স্বাভাবিক প্রকৃতি, এটাই বাস্তব। সৃষ্টির মূলে আছে এই পতঙ্গবৃত্তি। একজন পণ্ডিত-সমালোচক বলেন—

১ 'আমি মনে করিয়াছিলাম, লবঙ্গলতার পর আর কখন কাহাকে ভালবাসিব না। মনুষ্যের সকলই অনর্থক দম্ভ! অন্য দূরে থাক, সহজেই এই অন্ধপুষ্পনারী কর্তৃক মোহিত হইলাম।'—রজনী ৫ খণ্ড, ১ পরিচ্ছেদ।

২. চন্দ্রশেখরে 'শৈবলিনীকে দেখিয়া সংযমীর ব্রতভঙ্গ হইল। ভাবিয়া, চিন্তিয়া কিছু ইতস্তত করিয়া অবশেষে চন্দ্রশেখর আপনি ঘটক হইয়া শৈবলিনীকে বিবাহ করিলেন। সৌন্দর্যের মোহে কে না মুগ্ধ হয়।'— উপক্রমণিকা, ৩ পরিচ্ছেদ।

'প্রেম হইতেই সংসারের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ; জড়তার ক্ষেত্রে প্রকট হইলেই প্রেমের নাম হয় আকর্ষণ ; উহাই শক্তিরূপে, আকর্ষণ ও বিকর্ষণের নিত্যযুগল ভাবে প্রকট হইয়া এই বিশ্বসৃষ্টি প্রকট করিতেছে।'[১]

পারস্পরিক আকর্ষণের এই বিশ্বলীলা মানুষের জগতে একটি অপূর্ব মূর্তি পরিগ্রহ করে। এখানে একদিকে যেমন আছে ইন্দ্রিয়বহ্নি তেমনি আছে প্রেমবহ্নি। কেউ অন্ধভাবে রূপের আগুনে প্রাণ বিসর্জন দেয়, কেউ প্রেমাস্পদের কল্যাণে প্রাণ বিসর্জন দেয়, কেউ বহ্নির আকর্ষণে ব্যক্তিসুখ উপভোগ করতে চায়, কেউ তারই আকর্ষণে নিজেকে তুচ্ছ করে দিয়ে প্রতিবেশীর জন্য জীবন উৎসর্গ করে। বঙ্কিমের উপন্যাসে গোবিন্দলাল আছে, চন্দ্রশেখর আছে, গঙ্গারাম আছে ; আবার প্রতাপ আছে, সীতারাম আছে, অমরনাথও আছে। কেউ ভোগী, কেউ ত্যাগী, কেউ স্বার্থপর, কেউ অনুশোচনায় ম্রিয়মাণ। পুরুষচরিত্রের বিচিত্রতাকে বঙ্কিম দেখালেও নারী-চরিত্রের রহস্যেই বস্তুত তিনি ছিলেন মগ্ন। বঙ্কিমের উপন্যাসে নারীচরিত্রের বিচিত্রতা ও শক্তিশালিতাও অসাধারণ। এখানেও নারীচরিত্রকে দুটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়— একভাগে হীরা মতিবিবি জেবউন্নিসা রোহিণী শৈবলিনী— পুরুষচিত্তকে যারা আকর্ষণ করে, দিগ্‌ভ্রষ্ট করে আর একভাগে সূর্যমুখী কুন্দ ভ্রমর দলনী—যারা আত্মত্যাগের দ্বারাই পুরুষব্যক্তিকে উদ্ধার করে এবং আত্মপ্রতিষ্ঠ করে। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে কোনো শ্রেণীর নায়িকাকেই বঙ্কিম নিছক কামনারূপিণী করে দেখেন নি। যারা পুরুষের চিত্তকে রূপের মায়ায় উদ্‌ভ্রান্ত করে তারা নারীর স্বাভাবিক প্রেমের ক্ষুধাতেই আমাদের পূর্ণ সহানুভূতি টেনে আনে। পুরুষের ক্ষেত্রে যেমন গঙ্গারাম বা হীরালাল, নারীর ক্ষেত্রে তাদের তুল্য কেউ নেই। নারীজাতির প্রতি বঙ্কিমের এই শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব অপূর্ব। বিবিধপ্রবন্ধের 'দ্রৌপদী' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র সীতা এবং দ্রৌপদী এই দুই নারীর প্রতিই অঞ্জলি দিয়েছেন। নারী-প্রকৃতির প্রতি এই বিস্ময়বোধ বঙ্কিমমানসকে আগাগোড়াই ভরে রেখেছে।

কমলাকান্তের একটি প্রবন্ধে নারীজাতির এই রহস্য-বিস্ময় ব্যক্ত হয়েছে কৌতুকের ভাষায়। প্রবন্ধটির নাম 'ঢেঁকি'।—

'আমার দিব্য জ্ঞানের উদয় হইল— কার্যকারণসম্বন্ধপরম্পরা আমার চক্ষে প্রখর সূর্যকিরণে প্রভাসিত হইল। ঐ ত ঢেঁকির বল !—ঐ ত ঢেঁকির মাহাত্ম্যের মূল কারণ !—

১ শশাঙ্কমোহন সেন, বাণীমন্দির, 'সাহিত্যের প্রকৃতি', পৃ ৪১৭। শোপেনহাউয়ারের দার্শনিক মত আলোচনাপ্রসঙ্গে উইল ডুরাণ্ট বলেছেন—The force which draws the lover and the force which draws the planet are one.

ঐ রমণীপাদপদ্ম! ধপাধপ পাদপদ্ম পিঠে পড়িতেছে, আর ঢেঁকি ধান ভানিয়া চাল করিতেছে।···হায় ঢেঁকি! ও পায়ের কি এত গুণ! পিঠে পাইয়া তুমি এই সাত কোটি বাঙ্গালিকে অন্ন দিতেছ— তার উপর আবার দেবতার ভোগ দিতেছে!')

('মনুষ্যফল' নামে লেখাটি এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে অর্থপূর্ণ। স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে কমলাকান্তের চিন্তা কৌতুকপূর্ণ শ্রদ্ধায় বিশেষ উপভোগ্য। বাইরের জগতে পুরুষের ভূমিকা বিচিত্র, নানা কর্মক্ষেত্রে প্রসারিত। বঙ্কিম 'মনুষ্যফলে' পুরুষের বিচিত্র ভূমিকা নিয়ে নানা হাস্যকৌতুক করেছেন আলাদা আলাদা ভাবে। কিন্তু আমাদের সংসারে নারীর ভূমিকা তখনও পর্যন্ত অন্তঃপুরচারিণীর; সেইজন্য নারী-ব্যক্তিত্বের স্নিগ্ধ বর্ণনাই এতে আছে। তাতে চিরকুমার নিঃসঙ্গ কমলাকান্তের গভীর স্নেহ ও শ্রদ্ধা উচ্ছ্বলিত—

'নারিকেলের জলের সঙ্গে স্ত্রীলোকের স্নেহের আমি সাদৃশ্য দেখি, উভয়ই বড় স্নিগ্ধকর। যখন তুমি সংসারের রৌদ্রে দগ্ধ হইয়া, হাঁপাইতে হাঁপাইতে, গৃহের ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম কামনা কর, তখন এই শীতল জল পান করিও— সকল যন্ত্রণা ভুলিবে। তোমার দারিদ্র্য-চৈত্রে বা বন্ধুবিয়োগ-বৈশাখে—তোমার যৌবন-মধ্যাহ্নে বা রোগতপ্ত বৈকালে, আর কিসে তোমার হৃদয় শীতল হইবে? মাতার আদর, স্ত্রীর প্রেম, কন্যার ভক্তি, ইহার অপেক্ষা জীবনের সন্তাপে আর কি সুখের আছে?')

'মনুষ্যফল' প্রবন্ধটির মধ্যে পুরুষজাতির অকৃতার্থতার পাশে নারীজাতির সৌন্দর্য এবং স্নিগ্ধতাকে যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, তার তুলনা রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূতে'র অন্তর্গত 'নরনারী' রচনাটি—

'আমরা অকর্মণ্য নিষ্ফল নিশ্চল বালুকারাশি স্তূপাকার হইয়া পড়িয়া আছি, প্রত্যেক সমীরশ্বাসে হুহু করিয়া উড়িয়া যাইতেছি এবং যে কোনো কীর্তিস্তম্ভ নির্মাণ করিবার চেষ্টা করিতেছি তাহাই দুইদিনে ধসিয়া ধসিয়া পড়িয়া যাইতেছে। আর আমাদের বাম পার্শ্বে আমাদের রমণীগণ নিম্নপথ দিয়া বিনম্র সেবিকার মতো আপনাকে সংকুচিত করিয়া স্বচ্ছ সুধাস্রোতে প্রবাহিত হইয়া চলিতেছে। তাহাদের এক মুহূর্ত বিরাম নাই। তাহাদের গতি, তাহাদের প্রীতি, তাহাদের সমস্ত জীবন এক ধ্রুব লক্ষ্য ধরিয়া অগ্রসর হইতেছে। আমরা লক্ষ্যহীন ঐক্যহীন সহস্রপদতলে দলিত হইয়াও মিলিত হইতে অক্ষম। যে দিকে জলস্রোত, যে দিকে আমাদের নারীগণ, কেবল সেই দিকে সমস্ত শোভা এবং ছায়া এবং সফলতা; এবং যে দিকে আমরা সে দিকে কেবল মরুচাকচিক্য বিপুল শূন্যতা এবং দগ্ধ দাস্যবৃত্তি।'

(কমলাকান্তের দপ্তর বঙ্কিমমানসের সমগ্র রূপের সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি বলেই ঔপন্যাসিক কল্পনা এবং প্রবন্ধচিন্তার একটি সমন্বয়রূপে বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। পরবর্তী কালে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ নামে অভিহিত বিশেষ এক শ্রেণীর সাহিত্য-রূপের বিস্তার ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র প্রবন্ধ এবং বীরবলী রচনার সময় থেকেই এটি বাংলার সাহিত্যে স্থান পেয়ে এসেছে। কখনও কখনও আমরা তার জের টানি কমলাকান্ত থেকে। কিন্তু কমলাকান্তের সঙ্গে সাদৃশ্যের আভাস পাওয়া গেলেও কমলাকান্ত এদের থেকে আলাদাই। তার প্রধান কারণ, ব্যক্তিগত প্রবন্ধে লেখকের মন চলে কল্পনার পথে, সেজন্য চিন্তার গ্রন্থিগুলি তেমন শক্ত নয়, এখানে ভাবগুলি চলে অনুষঙ্গ অবলম্বন করে। কমলাকান্তে লেখকের ব্যক্তিমন বিষয়বস্তুর উপরে উদ্ধত প্রাধান্য পায় নি। যুক্তির শৃঙ্খলা লেখকমননিরপেক্ষ রূপেই ঋজু স্পষ্ট ও উজ্জ্বল। তা ছাড়া, এই বইতে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তার বীজগুলি ছড়িয়ে গিয়ে একে দিয়েছে এক ভিন্ন ধরণের গুরুত্ব। আমরা পরবর্তী ব্যক্তিগত প্রবন্ধ থেকে কোনো গুরু যুক্তিবদ্ধ চিন্তার সন্ধান করি না। রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধ' লঘুভঙ্গিতে লেখা না হলেও সমাজ ধর্ম রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁর চিন্তার উপাদানও আমরা এতে খুঁজি না। 'বিচিত্রপ্রবন্ধ' কল্পনাভাবমূলক রচনা। এতে রবীন্দ্রনাথের জীবন সম্বন্ধে কতকগুলি ভাবময় উপলব্ধি অপূর্ব কাব্যময় ভাবনায় পরিলক্ষিত। তাঁর সেই ভাবনা একক মুহূর্তের প্রকাশ বলেই ধরা সংগত। কমলাকান্তের মতো বঙ্কিমের সমগ্র রচনার সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দেখা সব সময় যায় না।)

হয়তো এ কথা সম্পূর্ণ সত্যও নয়। রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার দার্শনিক ভাবনার সঙ্গে মিলিয়ে যদি দেখা না-ও যায় তাঁর কবিতার ভাবসত্যগুলির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা সম্ভব। 'শ্রাবণসন্ধ্যা' 'রুদ্ধগৃহ' 'কেকাধ্বনি' 'আষাঢ়' প্রভৃতি লেখাগুলিতে রবীন্দ্রনাথ উচ্চারণ করেছেন জীবনের কয়েকটি ভাবসত্য। বস্তুর অন্তর্নিহিত ভাবরূপ তুলে ধরাই 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র বৈশিষ্ট্য। 'কমলাকান্তে'র কল্পনায় এই ভূমিকা নেই। কমলাকান্তের ভূমিকা যুক্তির। রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন সৌন্দর্যকে, বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন মানবপ্রীতিকে।

সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা সন্ন্যাসী কমলাকান্তেরও কম নয়। স্থূল জীবনটিকে অনেক সময়েই আদর্শের স্বর্গে পরিবর্তিত করতে তার বাসনার সীমা নেই। জীবনের স্থূলতা অনেক সময়েই পীড়া দেয়, তাই অন্যবিধ সৌন্দর্য আকর্ষণে তার আগ্রহ। কমলাকান্তের যেগুলি বিশুদ্ধ ব্যক্তিমূলক রচনা সেগুলিতেই তাঁর রসপিপাসু হৃদয়ের নিভৃত ব্যাকুলতা প্রকাশিত। কমলাকান্তের একাধিক রচনায় সংগীতের প্রসঙ্গ আছে। রসরূপে জীবনকে উপভোগ করতে গিয়ে সংগীতের সুর যেন আপনা থেকেই বেজে ওঠে;

কমলাকান্ত চক্রবর্তী তাই 'সংসারসংগীতে'র মাধুর্যের ভিখারী'।[১] তাই সে বলে 'গতিই সংসারের সুখ— চাঞ্চল্যই সংসারের সৌন্দর্য'।[২] সংসারের এই সংগীত কবি রবীন্দ্রনাথও শুনেছেন, তিনি বলেন 'পৃথিবীতে যাহা আসে তাহাই যায়। এই প্রবাহেই জগতের স্বাস্থ্যরক্ষা হয়'।[৩]

বৈষ্ণব পদাবলীর গানে কমলাকান্তের অন্তর পূর্ণ। নতুন অর্থে নতুন করে সেই সংগীত তার অন্তরকে বাজিয়ে তোলে। রঘুবংশের অজবিলাপে কুমারসম্ভবে রতির কান্নায় কমলাকান্ত মগ্ন হয়ে যায়। রসের সন্ধানে কমলাকান্ত ঘুরে বেড়ায়। এ জগৎ প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের ভাবনায় বড়ো পীড়িত। প্রয়োজনের বন্ধনকে কি ছাড়িয়ে যাওয়া যায় না বিশুদ্ধ রসের আলোক-উৎসবে? একদিন বসন্তের 'কোকিলে'র কাছে তিনি দীক্ষা নিতে চেয়েছিলেন—আত্মহারা আনন্দের দীক্ষা, 'বুড়া বয়সের কথা'য় কি সে পাথেয় ক্ষয় হয়ে গেল?

১ একা

২ একটি গীত

৩ রুদ্ধগৃহ। রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাঠকেরা জানেন এই ভাবটি রবীন্দ্রজীবন-দর্শনের একটি মূল ভাব। তার পূর্বাভাস কমলাকান্তে।

বঙ্কিমচন্দ্রের দেশধ্যান

তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।

—বঙ্কিমচন্দ্র

স্বদেশচেতনা বঙ্কিম-সাহিত্যেই প্রথম দেখা দিয়েছে একথা সর্বতোভাবে স্বীকার্য না হলেও বঙ্কিমচন্দ্রই যে স্বদেশচেতনাকে একাধারে যুক্তি এবং আবেগের বস্তুতে রূপান্তরিত করেছিলেন একথা না মেনে উপায় নেই। বস্তুত স্বদেশচেতনা আধুনিক মনোভাবেরই একটি দিক। তার প্রমাণ, অধুনাপূর্ব যুগের সাহিত্যে স্বদেশচেতনার দৃষ্টান্ত সে-রকম দেখা যায় নি। এ-কথা বঙ্কিমচন্দ্রই 'ভারত-কলঙ্ক' প্রবন্ধে ভালো করে বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'যে-সকল অমূল্য বস্তু আমরা ইংরাজের চিত্ত-ভাণ্ডার হইতে লাভ করিতেছি, তাহার মধ্যে দুইটি আমরা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম —স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং জাতি প্রতিষ্ঠা। ইহা কাহাকে বলে হিন্দু জানিত না।' বঙ্কিমচন্দ্র এখানে 'দেশচেতনা' 'দেশপ্রীতি' বা 'দেশবাৎসল্য' শব্দ ব্যবহার করেন নি। কিন্তু স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং জাতি প্রতিষ্ঠার সমন্বিত অর্থ থেকে দেশচেতনাকেই বোঝায়। এই চেতনা যে প্রাচীন সাহিত্যে নেই, সে-কথা ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। বিষ্ণুপুরাণে ভারতভূমির চমৎকার বর্ণনা আছে—

উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।
বর্ষং তদ্ ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ ॥

কালিদাসের রঘুবংশ, মেঘদূতেও ভারতপরিক্রমণ আছে, কিন্তু আধুনিক কালে দেশচেতনা বলতে যা বুঝি, সে-সব কাব্যে তা নেই। প্রাচীন সাহিত্যে ভারতবর্ষ দেবভূমি। এর মধ্যে 'স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা ও জাতিপ্রতিষ্ঠা'র আভাস নেই। এর ভৌগোলিক এবং আধ্যাত্মিক রূপ কবির কল্পনাকে সমৃদ্ধ করেছে মাত্র।

এই দেশচেতনার নতুনতর রূপান্তর ঘটল আধুনিক কালে ইংরেজ-সান্নিধ্যে এসে। এর প্রথম আলাপ শোনা গিয়েছিল নিধুবাবুর (১৭৪১-১৮৩৯) গানে—

নানান দেশের নানান ভাষা
বিনা স্বদেশীয় ভাষা পুরে কি আশা!
কত নদী সরোবর, কিবা ফল চাতকীর
ধারাজল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা ॥

—এ-গান নিধুবাবু কখন রচনা করেছিলেন বলবার উপায় নেই। নিধুবাবু আমাদের দেশের প্রথম ইংরেজি-জানা কবি। তাঁর এই মাতৃভাষাপ্রীতি সম্ভবত বিভিন্ন ভাষার সংসর্গজাত প্রতিক্রিয়া। ভিন্ন ভাষার পরিপ্রেক্ষিকাতেই নিজের ভাষার মাধুর্যকে তিনি এমন করে বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন। স্বদেশচেতনার এটাই আরম্ভ। দেশপ্রেম স্পষ্ট আকার গ্রহণ করে বিশ্বের সংযোগেই। এই যোগ না হওয়া পর্যন্ত এই চেতনা কূপ-মণ্ডুকতা ছাড়া আর কিছুই না। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে বাঙালীর দেশপ্রেম উপন্যাসে, নাটকে, কাব্যে, যে তীব্র উন্মাদনায় শত সুরে বেজে উঠেছিল তার একটি পূর্ব-ভূমিকা ছিল। এর ইতিহাস আমাদের আধুনিক চেতনার উদ্বোধনের সঙ্গে জড়িত। ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার, ইতিহাস-বোধ, সমাজ-চেতনা, এককথায় এক নতুনতর ঐহিক অনুভূতির পরিণামই ছিল প্রগাঢ় দেশপ্রেমে, বঙ্কিমচন্দ্রে এসে যা সুস্পষ্ট রূপ নিয়েছে।

প্রথমেই ঔৎসুক্য জাগে জানতে, দেশ বলতে কতোটুকু ভৌগোলিক সীমাকে ধরব। বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে একজাতীয়ত্বের অভাব সম্বন্ধে অবহিত করিয়ে দিয়েছেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে তিনি দেখালেন ইংরেজ আসবার আগে ভারতীয়রা একজাতি-গঠনে কখনোই উদ্যোগী হয় নি। অতীতে এ দেশে বহু রাজা এসেছেন, কিন্তু তাঁরা নিজের নিজের ধর্ম বা কুলের জন্যই সংগ্রাম করে গিয়েছেন। বাইরের কোনো আক্রমণেই ভাষাভেদ, বংশভেদ বা জাতিভেদ তাঁরা ভুলতে পারেন নি, তাই সম্মিলিতভাবে একজাতীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেন নি। ভারতবর্ষে কখনোই একটি মাত্র জাতির অভ্যুদয় হয় নি। ভারতবর্ষের ইতিহাসের দুটি মাত্র ব্যতিক্রম ছিল, শিবাজীর অধিনায়কত্বে মারাঠাজাতি এবং রঞ্জিত সিংহের অধিনায়কত্বে শিখজাতি। বঙ্কিম বলছেন[১]—

'যদি কদাচিৎ কোন প্রদেশখণ্ডে জাতি প্রতিষ্ঠার উদয়ে এতদূরে ঘটিয়াছিল, তবে সমুদয় ভারত একজাতীয় বন্ধনে বদ্ধ হইলে কিনা হইতে পারিত?'

এই মন্তব্যের তাৎপর্য পরিষ্কার। একজাতি হলে ভারতবর্ষ বৈদেশিক আক্রমণকে বাধা দিতে পারত। বৈদেশিক বলতে স্বভাবতই ইংরেজদেরও বোঝায়। কিন্তু ইংরেজ জাতির সান্নিধ্যে আমাদের মধ্যে নবচেতনার উদয় হচ্ছে, সেকথাও এই প্রসঙ্গে বুঝিয়ে দিয়েছেন—

'ইংরেজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী। ইংরেজ আমাদিগকে নূতন কথা শিখাইতেছে। যাহা আমরা কখনও জানিতাম না তাহা জানাইতেছে; যাহা কখনও

১ ভারত-কলঙ্ক

দেখি নাই, শুনি নাই, বুঝি নাই, তাহা দেখাইতেছে, শুনাইতেছে, বুঝাইতেছে; যে পথে কখন চলি নাই, সে পথে কেমন করিয়া চলিতে হয় তাহা দেখাইয়া দিতেছে।'

ইংরেজের কাছে এই ঋণ স্বীকারের দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র শুধু নয়, সেকালের সকল চিন্তাশীল ভাবুকদের মনোভাবই প্রতিফলিত হয়েছে। রামমোহন থেকে উনিশ শতকের শেষ দশক পর্যন্ত প্রায় সকলেই ইংরেজ রাজত্বের সম্বন্ধে এক ধরণের বিশ্বাস পোষণ করে এসেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মোগল রাজত্বের অবসানকালে রাজনৈতিক কারণে ভারতের ভাগ্য ভিন্ন দিকে মোড় ফিরল। বিভিন্ন রাজ্যগুলি একটি কেন্দ্রীয় শক্তির কাছে নতি স্বীকার করল, ফলে পরস্পরের সঙ্গে কলহেরও অবসান ঘটল। অরাজকতা এবং বিশৃঙ্খলার যুগ শেষ হল। একটি শাসননীতি প্রবর্তিত হল। রামমোহন রায় লিখলেন[১]—

…'for having unexpectedly delivered this country from the long continued tyranny of its former rulers and placed it under the Government of English, a nation who not only are blessed with the enjoyment of civil and political liberty, but also interest themselves in promoting liberty and religious subjects among those nations to which that influence extends.।

ইংরেজ রাজত্বের প্রতি এই কৃতজ্ঞতাবোধ নিয়েই শুরু হয়েছিল আধুনিক যুগ। ইংরেজ শাসনের ফলে ভারতবাসীর মনে দুরকমের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল। মুসলমানদের হস্তচ্যুত হয়ে যাওয়ায় ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে ইংরেজের বিরুদ্ধে অভিযোগ পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে, বহু হিন্দু রাজা জমিদারও নিজেদের মধ্যে যতই রেষারেষি করুক বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি দেশময় একটি সাধারণ মনোভাব গড়ে তুলেছিল। এর থেকেই সূচিত হয়েছিল ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের সিপাহীযুদ্ধ। আধুনিক অর্থে একে ঠিক স্বাধীনতাযুদ্ধ বলা যায় না, কারণ বিভিন্ন অঞ্চলের বিদ্রোহ দেশাত্মবোধক মনোভাব দ্বারা প্রণোদিত হয় নি। তৎসত্ত্বেও এ কথা স্বীকার করতে হবে ইংরেজের বিরুদ্ধে অসন্তোষের এটা ছিল সুস্পষ্ট উদাহরণ। আর কখনোই এ রকম একটি লক্ষ্য নিয়ে সর্বভারতীয় জাগরণ দেখা যায় নি। দেশাত্মবোধের আদর্শ মূলে না থাকলেও পরশাসনের লাঞ্ছনাবোধ এমন করে ইতিপূর্বে আর প্রকট হয় নি। ইংরেজ আধিপত্য-বিস্তারের

১ *Final Appeal to the Christian Public.* **The English Works of Raja Rammohan Ray, Part III, p 105.**

ফলেই এই ঐক্যবদ্ধ চেতনা দেখা দিয়েছিল। এমনি করেই ইংরেজ শাসনের ফলেই একজাতীয়তাবোধ জেগে উঠতে আরম্ভ করেছে।

ইংরেজ শাসন হিন্দু-শিক্ষিত সমাজে ভিন্নতর মনোভাবের সৃষ্টি করে তুলেছিল। ইংরেজ যে শুধু মুসলমান রাজত্বের কুশাসন থেকেই দেশকে মুক্ত করল তা নয়, উচ্চতর নৈতিক এবং জ্ঞানের আলো তারা বহন করে এনেছিল। ইংরেজি শিক্ষাতেই আমাদের মধ্যে বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে ঔৎসুক্য ও জিজ্ঞাসা, যুক্তিবদ্ধ বৈজ্ঞানিক চিন্তাপ্রাণালী, নবতর মানব-মূল্যবোধ দেখা দিল। বিদ্যালয়গুলিতে আধুনিক বিষয়ের প্রবর্তন হল, দেশ এবং সমাজকে নতুন করে সংস্কার করবার প্রয়াস দেখা দিল।

হিন্দু কলেজ (১৮১৭) থেকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে যারা বেরিয়ে এল, তারা ইংরেজ শাসনের সুফল বর্জন করতে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। সিপাহীযুদ্ধকে তারা সমর্থন করতে পারে নি, তাদের আশঙ্কা ছিল মধ্যযুগীয় শাসন ফিরে এলে ভারতবর্ষের সামাজিক এবং নৈতিক অগ্রগতি ব্যাহত হবে। সেদিনের শাসকও ভেবেছিল, এরাই হবে ইংরেজ রাজত্বকে স্থায়ী করবার সহায়ক দাসশ্রেণী। কিন্তু দেশাত্মবোধের বীজ এদেরই মধ্যে অঙ্কুরিত হল। নব্যবঙ্গের শিক্ষাগুরু নাস্তিক ডিরোজিও স্বদেশ-জননীর উদ্দেশ্যে যে সুন্দর সনেটটি লিখেছিলেন, সেটি শুধু ডিরোজিওর নয়, তাঁর আদর্শে এবং চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত যুবকদেরও মনের কথা। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবন চরিত-রচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন—

'দেশবাৎসল্য পরম ধর্ম, কিন্তু এ ধর্ম অনেকদিন হইতে বাঙ্গালা দেশে ছিল না। কখনও ছিল কি না বলিতে পারি না। এখন ইহা সাধারণ হইতেছে, দেখিয়া আনন্দ হয়, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময়ে, ইহা বড়ই বিরল ছিল। তখনকার লোকে আপন আপন সমাজ, আপন আপন জাতি, বা আপন আপন ধর্মকে ভালবাসিত, ইহা দেশবাৎসল্যের ন্যায় উদার নহে— অনেক নিকৃষ্ট। মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া রামগোপাল ঘোষ ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে[১] বাঙ্গালা দেশে দেশবাৎসল্যের প্রথম নেতা বলা যাইতে পারে।'

বঙ্কিমচন্দ্র দেশাত্মবোধের লক্ষণ সুনিশ্চিতভাবেই নির্দেশ করেছেন। এই নতুন দেশাত্মবোধ নব্যবঙ্গের মধ্যেই দেখা দিল। ১৮৩৮-এ গঠিত সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা

১ রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫-১৮৬৮) হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর ছাত্র ছিলেন এবং তাঁর আদর্শে বিশেষভাবেই অনুপ্রাণিত ছিলেন। তাঁর জীবনী দ্রষ্টব্য কালীময় ঘটক, চরিতাষ্টক ২য় এবং রামগোপাল সান্যাল, *General Biograghy of Bengal Celebrities. Vol. 1,* 1989। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮২৪-১৮৬১) ডিরোজিওর ছাত্র ছিলেন না।

সভাতে দেশাত্মবোধক আলোচনার সূত্রপাত দেখতে পাই। ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে হিন্দু কলেজে অনুষ্ঠিত এই সভার এক অধিবেশনে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পুলিশী ব্যবস্থা সম্বন্ধে ইংরেজিতে একটি প্রবন্ধ পড়েন। এই প্রবন্ধ শুনে অধ্যক্ষ রিচার্ডসন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'I cannot convert the college into a den of treason'. এই ঘটনা প্রমাণ করে হিন্দু কলেজে শিক্ষিত ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ তো হচ্ছেই, সে-চিন্তা শাসকশ্রেণীকে সমালোচনা করে স্বদেশকে বড়ো করে তুলতে দ্বিধা করছে না। তাদের চিন্তাধারার পথনির্দেশের প্রয়োজন ছিল। ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দে দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাতের উদারনৈতিক নেতা জর্জ টমসনকে এদেশে নিয়ে এলেন। ইংরেজ রাজত্বে পরিপূর্ণ আস্থা রেখে দেশের কল্যাণমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করতে টমসন তাঁদের উপদেশ দিলেন। ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতার মনোভাব এখান থেকেই দৃঢ় হয়ে উঠল।

বঙ্কিমযুগে স্বদেশচেতনার লক্ষণগুলি পরীক্ষা করলে বঙ্কিমপূর্ব যুগে আরও কতকগুলি শুভসূচনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে একটি প্রধান বিষয় ছিল অতীত-সন্ধান। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হলে ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃতির আলোচনা আরম্ভ হয়ে যায়। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে রামমোহনের উদ্যোগে ধর্মসংস্কার শুরু হয়ে গেলে প্রাচীন শাস্ত্রগুলির বিস্মৃতপ্রায় সম্পদ নতুন করে আমাদের কাছে দেখা দিল। উপনিষদের মধ্যে এমন ভাববস্তু আছে যা খ্রীস্ট-ধর্ম বা মুসলমানধর্মের চেয়ে হীন নয়, এই নতুন উপলব্ধি আধুনিক জগতে হিন্দু ধর্মের গৌরব জাগিয়ে দেশাত্মবোধ সৃষ্টি করে তুলল। তত্ত্ববোধিনী সভার দান এ দিক দিয়ে অপরিসীম। প্রাচীন ধর্ম এবং ইতিহাস আলোচনায় তত্ত্ববোধিনী সভা পরিপূর্ণ ভাবেই নিযুক্ত হয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথের অভিভাবকত্বে ঠাকুরবাড়িতে এমন করেই স্বদেশাভিমানের প্রদীপ জ্বলে উঠেছিল।[১] বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে নিজের ধর্ম সম্বন্ধে যে-গৌরববোধ ছিল, সে এই দেশ-চেতনারই ফল। কেননা এই ধর্মবোধকে তিনি উদারতর বিশ্ব-বোধের সঙ্গে সমন্বিত করে নিয়েই দেশভাবনায় অচলপ্রতিষ্ঠ হয়েছিলেন।

প্রাচীন ইতিহাস-চর্চার ফল আমরা প্রায় সারা উনিশ শতকেই দেখি। ইতিহাস অবলম্বনে উপন্যাস নাটক কবিতার বান ডেকে গেল। কর্ণেল টড-এর Annals and Antiquities of Rajasthan সেকালের বাংলা সাহিত্যের বিষয়সন্ধানের একটি প্রধান উৎস। রঙ্গলাল তাঁর দেশাত্মবোধক রচনার উপাদান এখানে থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সরোজিনী' (১৮৭৫) এবং 'অশ্রুমতী'

১ জীবনস্মৃতি, 'স্বাদেশিকতা'

(১৮৭৯) রাজপুত-কাহিনী নিয়ে লেখা। এই শ্রেণীর নাটকের মধ্যে 'পুরুবিক্রম' (১৮৭৪) তাঁর প্রথম রচনা। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' উপন্যাসের কাহিনীও মূলত টড থেকেই সংগৃহীত। এঁদের মধ্যে অনেকগুলিরই লক্ষ্য ছিল দেশপ্রীতির উদ্বোধন। বিদেশী শত্রু দেশকে আক্রমণ করলে কী করে জাতি এবং দেশকে রক্ষা করতে হয়, সেই অনুপ্রেরণা সঞ্চারই ছিল এঁদের লক্ষ্য।

এই ভাবচেতনার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশের স্বার্থরক্ষামূলক কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনাও স্মরণীয়। ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে দ্বারকানাথ ল্যাণ্ডহোলডার্স এসোসিয়েশন স্থাপন করেছিলেন ; এর উদ্দেশ্য ছিল জমিদারের স্বার্থরক্ষা। ১৮৪১ খ্রীস্টাব্দে দেশীয় সংবাদ-পত্রের সম্পাদকদের দ্বারা স্থাপিত হয়েছিল Society for the Amelioration of India। এই সভার একটি অধিবেশনে হিন্দু ইনটেলিজেন্সারের সম্পাদক কাশীপ্রসাদ ঘোষ সুস্পষ্টভাবে বলেছিলেন তৎকালীন শাসকদের নীতি হচ্ছে জনসাধারণের রাজনৈতিক অধিকার হরণ।[১] চল্লিশের দশকে কলকাতায় দুটি প্রধান সংগঠন ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করেছে ; বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি ছিল শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের সংস্থা, ল্যাণ্ডহোলডারস এসোসিয়েশন ছিল জমিদারদের প্রতিনিধিসভা। ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে এই দুটি সংস্থা ব্রিটিশ ইনডিয়ান এসোসিয়েশন নামে একটি সংস্থায় পরিণত হয়। জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হবার পূর্বে এই প্রতিষ্ঠানটি দেশীয় জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে শাসক-কর্তৃপক্ষের কাছে নিবেদন করত। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইনডিয়ান সিভিল সারভিস থেকে বহিষ্কৃত হয়ে এই সংস্থার পক্ষ থেকেই সারা ভারতে রাজনৈতিক চেতনাসঞ্চারের উদ্দেশ্যে ঘুরে বেরিয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রীতির ভূমিকার আরও দুটি ঘটনা ছিল। নীলকরদের অত্যাচারে দেশীয় ব্যক্তিদের অসহায়তা ফুটে উঠতে থাকে। পীড়িত প্রজাদের অধিকার রক্ষা করতে সেদিন ইংরেজের আদালত ছাড়া অন্য গতি ছিল না। তখনও ইংরেজ-প্রবর্তিত ন্যায়বিধিতে আস্থা ছিল, কিন্তু দরিদ্র প্রজাদের পক্ষে আদালত-সমুদ্র অতিক্রম করে আসাই ছিল কঠিন ও ব্যয়সাধ্য। ইংরেজের প্রবর্তিত আইনবিধির এই নির্মম পরিহাসের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রই অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন 'বঙ্গদেশের কৃষক' এবং 'বাঙ্গালা শাসনের কল' প্রবন্ধ দুটিতে।

দ্বিতীয় ঘটনা হিন্দুমেলা। হিন্দুমেলা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো মন্তব্য কোথাও দেখি নি। কিন্তু ১৮৬৭ থেকে ১৮৬৯ পর্যন্ত হিন্দুমেলার অধিবেশনগুলিতে জাতীয়সঙ্গীত রচনা, জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতাপাঠ, উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান

১ *The Friend of India*, October 14, 1841

হয়েছে, বঙ্কিমচন্দ্র সেগুলি লক্ষ্য করেন নি, এ কথা একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। পরমুখাপেক্ষী না থেকে প্রদর্শনী ও পুরস্কার বিতরণের দ্বারা উৎসাহ সঞ্চার করে আত্মোন্নতি-বিধানের আদর্শ হিন্দুমেলাই দেখিয়েছিল।[১] এরই একটি অধিবেশনে (১৬৬৮) কবি মনোমোহন বসু স্বাধীনতার স্বপ্ন প্রথম দেখেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' (১৮৬৯) তে দেশভাবনার যে আভাস পাওয়া যায় হিন্দুমেলার আন্দোলন তার প্রেরণা ছিল না, এটা বলা কঠিন।

আমাদের দেশচেতনা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে দুটি পথ অনুসরণ করেছে, একটি রাজনীতির পথ, আরেকটি দেশাত্মবোধক আবেগের পথ। রাজনীতি গ্যারিবলডি ম্যাৎসিনির জ্বলন্ত উদ্দীপনায় অনুপ্রেরণা পেয়েছে, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মপদ্ধতি সেই পথে অগ্রসর হয়েছে। চরমপন্থী এবং উদারপন্থী নামে দুটি দলের সৃষ্টি রাজনৈতিক আন্দোলনের ফল। শ্রীঅরবিন্দ এবং বালগঙ্গাধর তিলক চরমপন্থীদের নেতারূপে দেখা দিলেন এই শতাব্দীর শেষে। সুরেন্দ্রনাথ এবং গোখেল হলেন উদারপন্থীদের প্রবক্তা। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' চরমপন্থীদের প্রেরণা দিয়েছিল বলে শোনা যায়, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সত্য সত্যই রাজনৈতিক কর্মনীতি নির্দেশ করে যান নি। কমলাকান্তের দপ্তরে 'পলিটিকস' রচনাটিতে বৃষজাতীয় রাজনীতির প্রতি তাঁর আকর্ষণটি মাত্র অনুমান করা যায়। আসলে তিনি ছিলেন দেশাত্মবোধক আবেগের কবি ও দার্শনিক। তিনি আমাদের মধ্যে বিশুদ্ধ দেশপ্রেমের জাগরণই ঘটাতে চেয়েছেন। সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা উচ্চতম মূল্যবোধ এবং গভীর একটি অনুভূতি দিয়ে বাঙালীর চিত্তকে তিনি পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন। রাজনৈতিক কর্মপন্থা পরে, আগে কর্মের সেই প্রেরণাশক্তি, দেবীরূপে যাকে তিনি আবাহন করলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রেম কিন্তু প্রথম থেকেই পূর্ণায়ত ছিল না, যদিও স্বদেশ সম্বন্ধে তাঁর গভীর অনুসন্ধিৎসা প্রথম থেকেই ছিল। তিনি শিক্ষার্থী-জীবনে ছিলেন ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য। ঈশ্বর গুপ্তের দেশপ্রেম তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে থাকবে। কিন্তু তাঁর দেশ-ভাবনা নির্বিচার ছিল না। সেকালের উচ্চ ইংরেজি শিক্ষিত স্বাধীন চিন্তাশীল ব্যক্তি-রূপে ইতিহাস অনুসন্ধান করে নানা জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে স্বদেশের ধারণা গড়ে তুলতে চেয়েছেন। দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫) থেকে কমলাকান্তের দপ্তর (১৮৭৫) রচনার পূর্ব পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস এবং প্রবন্ধ পড়লে তাঁর মনোভাব পাঠককে কিছু বিস্মিত করবে। কমলাকান্তে দেশানুরাগ যেমন উদাত্ত আবেগে পূর্ণ, তাঁর পূর্ববর্তী

রচনায় ঠিক সে-রকম পাওয়া যায় না।[১] কমলাকান্তের 'আমার দুর্গোৎসব' কিংবা 'একটি গীত' রচনা দুটিতে বঙ্কিমচন্দ্র যেন বহুদিনের একটি রুদ্ধ আবেগকে মুক্ত করে দিয়েছেন। দ্বিতীয় রচনাটিতে বঙ্গভূমির অতীত গৌরবের জন্য হাহাকার, প্রথম রচনাটিতে সেই গৌরবকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবার জন্য ব্যাকুলতা। বাংলাদেশের অতীত গৌরবের চিত্রটি তাঁর মনে সুস্পষ্ট। দর্শনে, কাব্যে, ন্যায়ে এবং অন্যান্য কীর্তিতে বাংলা দেশের প্রাচীন ইতিহাস সমুজ্জ্বল। দূর অতীতের সেই স্বপ্ন বঙ্কিমের মনকে স্মৃতিভারাতুর করে তুলেছে। এই উচ্ছ্বাস এবং গর্বের সাক্ষাৎ বঙ্কিম সাহিত্যের পূর্ববর্তী স্তরে মেলে না।

বাংলা দেশের ইতিহাস নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনী থেকেই উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। এ বইতে তিনি গল্পই বলেছেন, তাতে কোনো অভিপ্রায় যুক্ত হয় নি। কপালকুণ্ডলায় বাংলা ও আগ্রার জাহাঙ্গীর-সমকালীন ঐতিহাসিক পটভূমি অবলম্বিত; অন্য অভিপ্রায় থাকলেও দেশাত্মবোধক কোনো উদ্দেশ্য এতে নেই। 'মৃণালিনী'তেই দেখি ইতিহাস-সন্ধানী মন জেগে উঠেছে। সপ্তদশ অশ্বারোহী দ্বারা বঙ্গবিজয়ের কাহিনী সম্বন্ধে তাঁর সংশয় ছিল, বিশ্বাসও করতে পারছেন না আবার সম্পূর্ণ অবিশ্বাসও করতে পারছেন না। ঝোঁকটা অবশ্য অবিশ্বাস করার দিকেই। তাছাড়া 'যবনেরা নবদ্বীপ অধিকার করিয়াছে বটে, কিন্তু নবদ্বীপ তো গৌড় নহে'।[২] এই বিশ্বাস অবলম্বন করেও বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালীর লাঞ্ছনার ভার লঘু করতে চেয়েছেন।

এই উপন্যাসে আমরা তিনটি প্রধান পুরুষ চরিত্র পাই, যেগুলিতে বঙ্কিমের সচেতন ধারণা যুক্ত হয়েছে বলে মনে হয়। সে তিন জন লক্ষ্মণসেন, পশুপতি এবং মাধবাচার্য। লক্ষ্মণসেন বৃদ্ধ নিরুদ্যম রাজকর্তব্যে উদাসীন। তাঁর সভাসদেরাও রাজাকে সন্তুষ্ট করবার স্বার্থে রাজ্যরক্ষাকেও তুচ্ছ করেছে। পশুপতি প্রধান ধর্মাধিকার, রাজ্যের সবচেয়ে শক্তিমান অমাত্য, লক্ষ্মণসেনের দক্ষিণহস্ত। কিন্তু তার এত বড়ো শক্তি দেশরক্ষার মহৎ কার্যে প্রযুক্ত না হয়ে হীন ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধিতে, চরম ক্ষমতালাভের জন্য বিদেশী শত্রুর সহায়তায় নিযুক্ত। যে বিরাট কীর্তি সে স্থাপন করতে পারত গৌড়কে রক্ষা করে, তার সকল সম্ভাবনা সে নিজেই চূর্ণ করেছে। বঙ্কিম যেন দেখালেন

১ অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গচিন্তার দুই স্তরের উল্লেখ ও আলোচনা করেছেন একটি প্রবন্ধে। দ্রষ্টব্য 'ইতিহাসতপস্বী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়', দেশ সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭৩, পৃ ১৬০-১৬১। বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারার এই দিকটি আর কেউ উদ্ঘাটিত করেন নি। এই সূত্রটির জন্য বর্তমান লেখক ওই প্রবন্ধটির নিকট ঋণী।

২ 'মৃণালিনী', ৪ খণ্ড ৪ পরিচ্ছেদ

বাঙালী কোনো বড়ো কিছু তৈরী করে তুলতে পারে না তার চরিত্রের অন্তর্নিহিত ত্রুটির জন্য। কিন্তু তৃতীয় চরিত্র মাধবাচার্য, এই উপন্যাসের মধ্যে ব্যক্তিগত কোনো উদ্দেশ্য না রেখে তুরকি আক্রমণের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হবার জন্য পূর্বাঞ্চলের রাজাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছে। প্রায় একক চেষ্টায় সে উদাসীন রাজাদের মধ্যে শত্রুর আসন্ন আক্রমণের সম্ভাবনার কথা জানিয়ে দেশরক্ষায় উৎসাহ সঞ্চার করেছে। মাধবাচার্যের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র উদ্যম অভিলাষ আদর্শবাদ ও জাতীয়তাবাদী মনোভাবের এক প্রতীক রচনা করেছেন।

মৃণালিনীর লেখক-মানসকে বিশ্লেষণ করলে দুটি চিন্তা পাই। একটিতে বঙ্কিম দেখিয়েছেন বাঙালীর আলস্য কর্তব্যসাধনে ঔদাসীন্য, অভিলাষ-শূন্যতা, গৃহসুখ-পরায়ণতা, আর-একটিতে আকাঙ্ক্ষিত উদ্যম ত্যাগ বুদ্ধিবল ও আদর্শবাদ। বঙ্কিমের এ-সময়ের লেখা অন্যান্য রচনাতে এই দুটি বক্তব্যই ফুটে উঠেছে। বাঙালী চরিত্রের সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের গৌরববোধ নেই। তারা সংঘবদ্ধ নয়। তারা আত্মসুখপরায়ণ উদ্যমহীন। বঙ্কিমচন্দ্রের বাঙালীচরিত্র-বিশ্লেষণ তাঁর অন্যান্য কয়েকটি রচনাতেও একই আকার গ্রহণ করেছে। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হওয়ার আগে বঙ্কিমের দুটি ইংরেজি প্রবন্ধ পাওয়া যায়। একটিতে তিনি বলেছেন[১]—

. And thus the national character and the production of the national intellect acted and reacted on each other. Indolent habits and a feeble moral organisation gave birth to an effeminate poetical literature and then for ages the country fed and nourished itself on that effeminate literature.

বাঙালী চরিত্র এবং তাদের কীর্তি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ গর্ব বোধ করতে পারছেন না। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব'[২] প্রবন্ধেও বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালী চরিত্র সম্বন্ধে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন—

'ভারতবর্ষীয়েরা শেষে আসিয়া একটি এমন প্রদেশ অধিকার করিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন যে, তথাকার জলবায়ুর গুণে তাঁহাদিগের স্বাভাবিক তেজ লুপ্ত হইতে লাগিল। তথাকার তাপ অসহ্য, জলবায়ু বাষ্পপূর্ণ, ভূমি নিম্ন এবং উর্বরা এবং তাহার উৎপাদ্য অসার, তেজোহানিকারক ধান্য। সেক্ষণে আসিয়া আর্যতেজ অন্তর্হিত হইতে লাগিল। আর্য প্রকৃতি কোমলতাময়ী আলস্যের বশবর্তিনী এবং গৃহসুখাভি-

১ *Journals of the Bengal Social Science Association* Vol. IV 1870.

২ বঙ্গদর্শন, পৌষ ১২৮০

লাষিণী হইতে লাগিল। সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, আমরা বাঙ্গালার পরিচয় দিতেছি। এই উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, নিশ্চেষ্ট গৃহসুখপরায়ণ চরিত্রের অনুকরণে এক বিচিত্র গীতিকাব্য সৃষ্ট হইল।'

বাংলা দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসন্ধিৎসা এবং কৌতূহল পূর্ব থেকেই ছিল। দুর্গেশনন্দিনীতে রাজনৈতিক ইতিহাস-জ্ঞানের পরিচয় যেমন পাওয়া যায়, মৃণালিনীতে লক্ষ্মণসেনের সভার বর্ণনায় তেমনি সাংস্কৃতিক ইতিহাস-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বাঙালীজাতির সম্বন্ধে বঙ্কিমের মনোভাবে তখন দেশ-প্রেমের তীব্রতা কিছুই ফোটে নি, বরং নবশিক্ষিত তরুণ বঙ্কিম তখন ঐতিহাসিক বাকল-এর ইতিহাস-তত্ত্বের মতবাদেই বিশ্বাসী—জলবায়ুর গুণে জাতির চরিত্র নির্ধারিত হয়। কিন্তু বঙ্কিমের স্বদেশভাবনা কেবল পুঁথিগত ছিল না, তার সঙ্গে ছিল গঠনাত্মক আদর্শ। বাঙালীকে দুর্বল, ভীরু, নিরুদ্যম বলেই তিনি ক্ষান্ত রইলেন না। প্রাকৃতিক নিয়মে মানবচরিত্র গঠিত হলে তার কি আর পরিবর্তন সম্ভব নয়? বাঙালী কি চিরকালই উচ্চাভিলাষশূন্য এবং দুর্বল থাকবে? 'বাঙ্গালীর বাহুবল'[১] প্রবন্ধটি 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধের ছয় মাস পরে লেখা হয়েছিল। তাতে তিনি বললেন—

'উদ্যম, ঐক্য, সাহস এবং অধ্যবসায় এই চারিটি একত্রিত করিয়া শারীরিক বল ব্যবহার করার যে ফল তাহাই বাহুবল। সে জাতির উদ্যম, ঐক্য, সাহস এবং অধ্যবসায় আছে। তাহাদের শারীরিক বল যেমন হউক না কেন তাহাদের বাহুবল আছে। এই চারিটি বাঙ্গালির কোন কালে নাই, এ জন্য বাঙ্গালির বাহুবল নাই।

কিন্তু সামাজিক জাতির বলে এ চারিটি বাঙ্গালি চরিত্রে সমবেত হওয়ার অসম্ভাবনা কিছুই নাই।'

মৃণালিনীর মাধবাচার্য-চরিত্রে বঙ্কিমচন্দ্র উদ্যম, ঐক্য, সাহস এবং অধ্যবসায়ের বাণী-মূর্তি রচনা করেছেন। এই তত্ত্বই আলোচিত হয়েছে 'বাঙ্গালির বাহুবল" প্রবন্ধে। মৃণালিনী (১৮৬৯) উপন্যাসটিতে এই অর্থে বঙ্কিমের একালের চিন্তা বিধৃত।

অতঃপর বঙ্কিমের দেশপ্রেম সংশয় সমালোচনার কণ্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করে নতুনতর পথে পদার্পণ করল। 'বাঙ্গালির বাহুবল' লেখার কয়েকমাস পরেই তিনি রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাসে'র স্মরণীয় সমালোচনা প্রকাশ করলেন 'বাঙ্গালার ইতিহাস'[২] নামে। বইটিকে তিনি অভিহিত করলেন 'সুবর্ণের মুষ্টি'

১ বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১২৮১

২ বঙ্গদর্শন, মাঘ ১২৮১

বলে। এই বইটি পড়ে যে-বাংলাদেশ সম্বন্ধে মৃণালিনীর যুগে তিনি নিঃসংশয় ছিলেন না, এবার সে-বাংলাজয় কাহিনীর অলীকতা সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ রইল না।[১] পাঠান-যুগে বাংলাদেশ স্বাধীন ও কীর্তিগৌরবে সমৃদ্ধ।[২] মোগল-যুগেই বরং বাংলাদেশ ছিল পরাধীন। বাংলাদেশকে নিয়ে বঙ্কিমের আর কোনো অগৌরব-বোধই থাকল না।—

'বাস্তবিক বাঙ্গালীরা কি চিরকাল দুর্বল, অসার, গৌরবশূন্য? তাহা হইলে গণেশের রাজ্যাধিকার; চৈতন্যের ধর্ম; রঘুনাথ, গদাধর, জগদীশের ন্যায়; জয়দেব বিদ্যাপতি মুকুন্দদেবের কাব্য কোথা হইতে আসিল? দুর্বল অসার গৌরবশূন্য আরও তো জাতি পৃথিবীতে অনেক আছে, কোন দুর্বল অসার গৌরবশূন্য জাতি কথিতরূপ অবিনশ্বর কীর্তি জগতে স্থাপন করিয়াছে।'[৩]

স্বদেশের ইতিহাস বঙ্কিমের কল্পনায় মহোজ্জ্বল দেশপ্রেমে রঞ্জিত হয়ে নতুন করে অনুসন্ধিৎসার বিষয় হয়ে উঠেছে। রাজকৃষ্ণের বই পড়েই বাংলার অতীত সম্বন্ধে বঙ্কিমের সকল সংশয় তিরোহিত হয়, তাঁর দেশপ্রেম বাঁধভাঙা বন্যার জলের মতো কল্লোলিত হল। অতঃপর রচিত হল কমলাকান্তের দপ্তরের 'আমার দুর্গোৎসব' (কার্তিক ১২৮১) এবং 'একটি গীত' (ফাল্গুন ১২৮১)। 'আমার দুর্গোৎসবে' তিনি দেশকে মাতৃমূর্তিতে কল্পনা করেছেন। জননীর প্রতি সন্তানের আকর্ষণের কোনো যুক্তি নেই, আছে কেবল অপ্রতিরোধ্য মুগ্ধতা এবং অতল স্নেহপিপাসা। 'আমার দুর্গোৎসবে'র দেবীকল্পনাতেও সেই প্রেমই রূপায়িত হয়েছে। তেমনি 'একটি গীতে' একটি বৈষ্ণব পদকীর্তনের দ্বারা কমলাকান্তের স্মৃতি-সমুদ্র মথিত হয়েছে, অতীত বঙ্গভূমির গৌরব-রঙ্গমঞ্চের আলো একে একে জ্বলে উঠে আবার নিভে গেল। সকরুণ আর্তনাদে কমলাকান্ত বলল—

'আর বঙ্গভূমি! তুমিই বা কেন মণি মাণিক্য হইলে না, তোমায় কেন হার করিয়া কণ্ঠে পরিতে পারিলাম না।'

দেশভাবনার এই রূপান্তর বস্তুতই সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু নয়। হৃতগৌরব বাঙালীকে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করবার বাসনা উদ্যম-ঐক্য-সাহস-অধ্যবসায়ের সম্মিলিত

১ 'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাসে' ছাড়াও বঙ্গদর্শনে (১২৮১ ভাদ্র) প্রকাশিত 'ঐতিহাসিক ভ্রম' প্রবন্ধে রাজকৃষ্ণ এই কাহিনীর অলীকত্ব প্রমাণ করেন।

২ বঙ্কিম বলেছেন 'রাজা ভিন্নজাতীয় হইলেই রাজ্যকে পরাধীন বলিতে পারা যায় না'— বাঙ্গালার ইতিহাস। 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা' প্রবন্ধের বক্তব্যের সঙ্গে তুলনীয়।

৩ 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' (১২৮৭, অগ্রহায়ণ)

প্রয়াসেরই সংকলিত ফলস্বরূপ। বঙ্গভূমির গৌরব অস্তমিত, কিন্তু সে-সূর্যকে ফিরিয়ে আনতে হবে। 'আমার দুর্গোৎসবে' সেই ব্যাকুলতাই ধ্বনিত। বঙ্কিমের দেশভাবনার রূপান্তরের একটি ইতিহাস আছে। রাজকৃষ্ণের বই পড়ে বঙ্কিমের মনে যে সাড়া জেগেছিল, তাতে ভিন্ন আর একটি ঘটনার স্মৃতিও জড়িয়ে গিয়েছিল। দুর্গাপূজার এক রাত্রিতে বঙ্কিম এক কীর্তনীয়ার মুখে 'এসো এসো বঁধু' গানটি শুনে মগ্ন হয়ে যান। তখন কে ভেবেছিল বঙ্কিমচন্দ্রের মনে রাধিকার ব্যাকুলতাই নতুন অর্থে অনুরণিত হচ্ছিল।[১] বৈষ্ণব কবির এই গানকে 'একটি গীতে' ব্যাখ্যা করতে করতে কমলাকান্ত পৌঁছে গিয়েছে নতুনতর অর্থে যেখানে কৃষ্ণপরিত্যক্ত বৃন্দাবনে রূপান্তরিত হল এই অস্তমিত-গৌরব বঙ্গভূমি। অন্তর্হিত স্বাধীনতার জন্য কমলাকান্তের বেদনা মথুরাগত কৃষ্ণের জন্য বিরহিণী রাধিকার আকুতিতে গেল মিশে। মহাষ্টমীর রাত্রির দশভুজা দেবী ও বৈষ্ণব-পদকর্তার গান দুয়ে যেন ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িয়ে গেল। মহাষ্টমীর দেবী দুর্গাই হলেন বঙ্গভূমির রূপক।

দুই

এই সময়েই খুব সম্ভবত এই ঘটনার প্রভাবেই লেখা হয়েছিল বন্দে মাতরম্ গানটি।[২] ললিতকুমার মিত্রকে বলেন তৎকালীন বঙ্গদর্শন-প্রেসের কার্যাধ্যক্ষ রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—তিনিই গানটি রচিত হতে দেখেছিলেন।[৩] বঙ্কিম তখন বঙ্গদর্শনের সম্পাদক অর্থাৎ ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও আলাদাভাবেই এই ঘটনার উল্লেখ করেন।[৪] বঙ্কিমচন্দ্র তখনই এই গানটি প্রকাশ করতে দিতে চান নি। পরে ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে আনন্দমঠে এটি সন্নিবিষ্ট হয়। বস্তুত একথা অনায়াসেই বলা চলে বন্দে মাতরমের শত্রুবিমর্দিনী বরাভয়দাত্রী মাতৃমূর্তির কল্পনাই অন্তরে দীর্ঘকাল লালিত হয়ে উপযুক্ত পূর্ণাঙ্গ কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। এই গানটি সম্বন্ধে আর

১ বঙ্কিমপ্রসঙ্গ, কমলাকান্তের 'এস এস বঁধু এস!'

২ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পুষ্পাঞ্জলিতে দেবীমূর্তির কল্পনা আছে নবম অধ্যায়ে। সে-দেবী সিংহবাহিনী সঞ্জীবনী দেবী। তাঁর আর কিছু বর্ণনা নেই। আনন্দমঠের ভাববীজ এখানেই নিহিত ছিল বলে কেউ কেউ অনুমান করেন। কিন্তু পুষ্পাঞ্জলি বেরিয়েছে কমলাকান্ত প্রকাশিত হওয়ার পরে।

৩ বঙ্কিমপ্রসঙ্গ, 'বন্দে মাতরম্'

৪ বঙ্কিমপ্রসঙ্গ, 'বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা'

একটি বিশেষ স্মরণীয় সংবাদ, এই গানের প্রথম সুরকার এবং গায়ক ছিলেন সুবিখ্যাত যদুভট্ট। তখন সুরের নির্দেশ ছিল 'রাগমল্লার—কাওয়ালি তাল'।

১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে গ্রন্থাকারে আনন্দমঠ প্রকাশিত হওয়ার পরেই বন্দে মাতরম্ বিখ্যাত হয়ে পড়ে। সম্ভবত বইতে সন্নিবিষ্ট হবার আগেই লোকের মুখে গানটি পরিচিত হয়েছিল। ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে 'বালক' পত্রিকার (জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ১২৯২) 'গান-অভ্যাস' বিভাগে গানটি আংশিক উদ্ধৃত হয়।[১] সেখানে গানটিকে বলা হয়েছে বিখ্যাত। ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় কংগ্রেস-অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে বন্দে মাতরম্ গানটি গাওয়া হয়েছিল। কবি হেমচন্দ্র 'রাখী-বন্ধন' কবিতায় এই উপলক্ষটি স্মরণীয় করে রেখেছেন—

গাহিল সকলে মধুর কাকলি
গাহিল বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
সুখদাং বরদাং মাতরম্।

পরবৎসরে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি প্রবন্ধে বঙ্কিমের স্বপ্নে উদবুদ্ধ হয়ে লিখলেন[২]—

'সাহিত্যের বলে হৃদয়ের বলে ধর্মের বলে বলীয়ান বাঙ্গালী পৃথিবীর বুকের উপর বৈজয়ন্তী উডাইয়া দিবে—সেই জয়চিহ্নের পাদদেশে বসিয়া ভারত বাঙ্গালীর সুরে বাঙ্গালীর গান গাইবে—"বন্দে মাতরম্"।'

১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার কংগ্রেসের অধিবেশন বন্দে মাতরম্ দিয়েই শুরু হয়েছিল। সে গান গেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দেশপ্রেমের যে আবেগ অতীতের ধ্যানে উচ্ছ্বসিত হয়েছিল, আনন্দমঠে সেই আবেগ নতুন রূপ নিয়ে দেখা দিল। শুধু ধ্যানে এবং অনুভূতি-সর্বস্ব আবেগে নয় অত্যাচারী রাজার পীড়নের প্রতিবাদে অধীর বিদ্রোহে সংগঠনমূলক রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মে একটি উচ্চতম নৈতিক আদর্শ নিয়ে দেশপ্রেম এই বইতে ভবিষ্যতের দিগ্‌দর্শনী হয়ে উঠল। বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত-রচনার মধ্যেই এর ইঙ্গিত ছিল। 'অবলা কেন মা এত বলে' ও 'দ্বিসপ্তকোটীকণ্ঠভুজৈর্ধৃতখরকরবালে'—এই বর্ণনার মধ্যেই দেশজননী কর্তৃক শত্রুনিধনের কল্পনা ছিল। আনন্দমঠে তারই বাস্তবরূপ। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রথম শিক্ষা বাংলার ইতিহাস' এবং 'কমলাকান্তের দপ্তর' প্রকাশের

১ প্রতিভা দেবী সেখানে গানের আলাদা সুর নির্দেশ করেছিলেন - রাগিণী দেশ—তাল কাওয়ালি। এই সুরই সরলা দেবীর 'শতগানে' আছে।

২ ভারতী ও বালক, আষাঢ় ১২৯৪, 'আশা'

পরে বাংলাদেশ বিষয়ে বঙ্কিম বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখলেও আনন্দমঠে দেশাত্মবোধের প্রবল উন্মাদনার আকস্মিক অভিব্যক্তির কারণ হিসাবে ঐতিহাসিক বিমানবিহারী মজুমদার বোম্বাইয়ের বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কের অভ্যুত্থানের প্রেরণা ছিল বলে অনুমান করেন। তিনি লিখেছেন[১]—

There are some points of similarity between the plan of Phadke and the plot of Bankimchandra's famous novel *Anandamath.* Bankim kept himself fully acquianted with the current events in India. He must have come of Phadke in some news -paper in November 1879. He started writing his Anandamath a few months later, and its first instalment was published in Bangadarshan (1880). The background of Anandamath has been depicted in the canvas of the events of the famine of 1770 and the famine of 1876-77 proved a turning point in the life of Phadke The sannyasies of Anandamath looted the Government revenues just as Phadke planned to loot the Government revenues.'

বিমানবিহারীর এই মত সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে কিছু বলা যায় না। বঙ্কিমের কোনো রচনাতেই ফাড়কের উল্লেখ নেই, আলাপ আলোচনার বিবরণ যেটুকু পাওয়া যায় তাতেও তার নাম কোথাও পাওয়া যায় না। অপরন্তু বঙ্কিম গ্লাইগের Memoirs এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক বিবরণের উদ্ধৃতি দিয়েছেন সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের বিবরণ জানাতে। যদুনাথ সরকারের মতে সন্ন্যাসী-ফকিরদের দেশব্রতী সন্তানে রূপান্তর সম্পূর্ণরূপে বঙ্কিমেরই কল্পনা।[২] আনন্দমঠের কাহিনী রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মত আছে। বিমানবিহারী মনে করেন আনন্দমঠে মুসলমান রাজশক্তিকে উৎখাতের যে পরিকল্পনা আছে, তার লক্ষ্য বাস্তবিক ইংরেজ রাজশক্তি। প্রথম সংস্করণের 'ইংরেজ' শব্দ পরবর্তী

১ Dr. Bimanbihari Majumder' *Militant Nationalism in India* p 12. বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কের বিবরণ দ্রষ্টব্য *British Paramountcy and Indian Renaissance Part 1* (Bharatiya Vidya-Bhawan, Bombay) p 908—913. ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার ফাড়ককে বলেছেন Father of militant Nationalism in India। বিদেশী ঐতিহাসিকেরা তাঁদের দস্যু মাত্র বলে অভিহিত করেছেন।

২ আনন্দমঠ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ) ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

সংস্করণে 'যবন' শব্দ দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু প্রথম সংস্করণে আনন্দমঠের ঘটনাস্থল ছিল বীরভূম, তখন সেখানকার রাজা ছিলেন মুসলমান। তার অপশাসনের বিরুদ্ধেই সন্তানদের বিদ্রোহ। মুসলমান রাজা তৎকালীন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে সাহায্য চাওয়ায় ইংরেজ সৈন্য পাঠিয়েছে, তখন যুদ্ধ হল ইংরেজ এবং মুসলমানের বিরুদ্ধে। পরের সংস্করণে উত্তরবঙ্গ হল ঘটনাস্থল এবং সন্তানদের লক্ষ্য প্রধানত হল মুসলমান রাজা। কিন্তু প্রথম সংস্করণে ছিল, 'ইংরেজ যে ভারতবর্ষের উদ্ধারসাধন জন্য আসিয়াছিল, সন্তানেরা তাহা তখন বুঝে নাই'।[১]

সুতরাং ইংরেজ রাজত্ব উৎখাতের কল্পনা বঙ্কিমের ছিল না। বইয়ের শেষ অধ্যায়ে তাই প্রমাণিত হয়। সেই অধ্যায়ে মহাপুরুষ সত্যানন্দকে বৃথা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে নিষেধ করেছেন। মহাপুরুষের কথা—

'সত্যানন্দ, কাতর হইও না। রাজা না হইলে সনাতনধর্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই।...প্রকৃত হিন্দুধর্ম জ্ঞানাত্মক, কর্মাত্মক নহে।...ইংরেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব।'

এর দ্বারা অবশ্য এ কথা বোঝায় না যে বঙ্কিম চিরকালের জন্যই ইংরেজ রাজত্বের স্থায়িত্ব চেয়েছেন। যিনি 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা' লিখেছেন, তাঁর কাছে এটা প্রত্যাশিতও নয়। আসলে মহাপুরুষের কণ্ঠে বঙ্কিমের যুক্তিবাদী চিন্তা ধ্বনিত, সত্যানন্দের আবেগকুল প্রার্থনায় প্রকাশ পেয়েছে বঙ্কিমের নিভৃত বাসনা। ইংরেজের প্রতি কতখানি বিদ্রূপ তিনি বর্ষণ করতে পারবেন, 'লোকরহস্যে'র রচনায় তার প্রমাণ আছে। 'পলিটিকস' রচনাটিতে বঙ্কিমের প্রবণতা বোঝা যায়। 'বাঙ্গালা শাসনের ফল' প্রবন্ধেও বঙ্কিমের সুনিশ্চিত চিন্তার পরিচয় আছে। মহাপুরুষ এবং সত্যানন্দ এই দুই কণ্ঠের মধ্যে সত্যানন্দের কণ্ঠে পরবর্তী বিপ্লবীরা নিজেদের প্রতিধ্বনি খুঁজে পেয়েছিল। বঙ্কিম যখন 'আনন্দমঠ' লিখেছিলেন তখন বিপ্লবের সময় প্রস্তুত হয় নি, সেজন্য মহাপুরুষ বিদ্রোহ থামিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু প্রায় কুড়ি পঁচিশ বছর পরে বাংলার বিপ্লবীরা উপযুক্ত সময় এসে গেছে বলেই আনন্দমঠকে আদর্শ করে বিপ্লব-আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

আনন্দমঠের যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রেম পরিণতি লাভ করল। এটা বঙ্কিমচন্দ্রের মানস-জীবনেরও পরিণত পর্যায়। বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মতত্ত্ব-আলোচনায় নিরত। আবেগ ও উচ্ছ্বাসকে সংযত করে মানবজীবনের কর্তব্য ও নীতি নির্ধারণে দার্শনিক যুক্তি অবলম্বন করেছেন। তাঁর উপন্যাসে যেমন নীতিবাদের ছায়া পড়েছে, তাঁর কল্পনার রাশকেও

১ আনন্দমঠ, তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তেমনি তিনি টেনে ধরেছেন। কমলাকান্তের উন্মত্ত দেশপ্রেম আনন্দমঠের যুগে ভাবনাগভীর হয়েছে, তাতে যুক্ত হয়েছে বৃহত্তর নীতিবোধ। একদিকে বঙ্কিম মানবিক কর্তব্যগুলির মধ্যে দেশপ্রেমের একটি অতি উচ্চ মূল্যমান নির্দেশ করলেন, আর এক-দিকে তেমনি কল্যাণবোধের সঙ্গে তাকে সমন্বিত করে দিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র অন্য একটি প্রবন্ধে বলেছেন দেশবাৎসল্য বস্তুটিই আমাদের মধ্যে ছিল না। আমরা নিজের নিজের জাতিকুলকে ভালোবাসতাম মাত্র। অতএব এই দেশবাৎসল্য একটা নতুন অনুভূতি, আমাদের শাস্ত্রে তার বিবরণ নেই। বঙ্কিমকে তাই এর সংজ্ঞা উৎস এবং পরিণাম চিন্তা করতে হল। ধর্মতত্ত্বে তিনি জীবনের সর্ববিধ কর্তব্যের যুক্তি দেখিয়েছেন, তাতে স্বদেশপ্রীতির স্থান নির্দিষ্ট হল ঈশ্বরপ্রীতির নীচেই। ধর্মের প্রতিষ্ঠা সামঞ্জস্যে। দেশপ্রীতিকেও জাগতিক প্রীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যযুক্ত হতে হবে, তবেই তার সার্থকতা[১]।—

'ইউরোপীয় patriotism একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ। ইউরোপীয় patriotism-ধর্মের তাৎপর্য এই যে পরসমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির সর্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে।

স্বদেশপ্রীতির এই অন্ধ একমুখিনতা যেমন নিন্দনীয়, তেমনি স্বদেশপ্রীতিকে আচ্ছন্ন করে যে সার্বলৌকিক প্রীতি তাও গ্রহণীয় নয়।—

'ভারতবর্ষীয়দিগের ঈশ্বরে ভক্তি ও সর্বলোকে সমদৃষ্টি ছিল। কিন্তু তাঁহারা দেশপ্রীতি সেই সার্বলৌকিক প্রীতিতে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা প্রীতিবৃত্তির সামঞ্জস্যযুক্ত অনুশীলন নহে। দেশপ্রীতি ও সার্বলৌকিক প্রীতি উভয়ের অনুশীলন ও পরস্পর সামঞ্জস্য চাই।'

দেশপ্রীতিতে এই বিচার এবং সংযম রক্ষা করে চলাই বঙ্কিমের সর্বশেষ বাণী। রবীন্দ্রনাথ যে বলেছিলেন—

ছুটিয়াছে জাতিপ্রেম মৃত্যুর সন্ধানে
বহি স্বার্থতরী, গুপ্ত পর্বতের পানে।

সে এই বঙ্কিম-নিন্দিত য়ুরোপীয় পেট্রিয়টিজম্। দেশপ্রেম মাত্রই পরম প্রার্থিত, তা নয়। দেশপ্রেমে যদি নীতিবোধ হারিয়ে যায়, তবে সে-দেশপ্রীতি আত্মহনন হয়ে দাঁড়ায়। রবীন্দ্রনাথ যেমন দেশপ্রেমে বারবার বিশ্বপ্রেমের সঙ্গে সামঞ্জস্য আনতে বলেছেন, বঙ্কিম তেমনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন—[২]

১ ধর্মতত্ত্ব, ২৪ অধ্যায়

২ আনন্দমঠ ৪র্থ খণ্ড ৮ পরিচ্ছেদ

'তুমি বুদ্ধির ভ্রমক্রমে দস্যুবৃত্তির দ্বারা ধন সংগ্রহ করিয়া রণজয় করিয়াছ। পাপের কখন পবিত্র ফল হয় না। অতএব তোমরা দেশের উদ্ধার করিতে পারিবে না। আর যাহা হইবে তাহা ভালই হইবে।'

দেশপ্রীতিকে তৈরি করতে হবে জ্ঞান এবং নীতি দিয়ে। যে-জাতি অন্ধ হয়ে বিদ্রোহ করতে উদ্যত, বঙ্কিম সেই জাতিকে জ্ঞানের দীক্ষায় ব্রতী হতে বলেছেন। সে জন্য ইংরেজের সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল কারণ বহির্বিষয়ক জ্ঞানের চর্চায় ইংরেজের সমকক্ষ কেউ ছিল না। আনন্দমঠের মহাপুরুষের ছিল এই বাণী। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ জাতীয় আন্দোলনের যুগে জাতীয়তার অন্ধতায় পাশ্চাত্য সহযোগিতা বিস্মৃত হওয়ার সর্বনাশা পথ থেকে নিবৃত্ত হতে বলেছেন, বঙ্কিমের অনুশাসন তারই পূর্বাভাস।

তিন

বঙ্কিমই দেশপ্রেমের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। সর্বভারতীয় জাগরণে বঙ্কিমের মন্ত্রই যাদুশক্তির মতো বিদ্যুৎ সঞ্চার করেছে জাতির দেহে; তাও ঠিক। তথাপি এ প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্নও আসে। বঙ্কিমের দেশপ্রীতি কি সাম্প্রদায়িক চিহ্নাঙ্কিত নয়? এবং বঙ্কিম কি ভারতবর্ষের অখণ্ড জাতীয়তাবোধের তুলনায় বাংলাদেশকেই মুখ্য করে তোলেন নি?

এ কথা সত্য বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার বিভিন্ন স্থানে মুসলমান-সমাজের সম্বন্ধে কঠোর উক্তি আছে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের ভূতপূর্ব অধ্যাপক টি. ডবলু. ক্লার্ক মন্তব্য করেছেন, Bankim's references to Muslims are generally unfriendly and in many places unmistakably hostile.[১] কিন্তু এ রকম মন্তব্যে বঙ্কিমের রচনার সঠিক অনুধাবন নেই। এ প্রসঙ্গে দুটি বিষয়ে অবহিত থাকা প্রয়োজন। প্রথমত উপন্যাস এবং প্রবন্ধকে আলাদা ভাবে দেখা এবং তুলনা করা দরকার। দ্বিতীয়ত মুসলমান রাজশক্তি এবং মুসলমান জনসমাজ যে ঠিক এক নয়, এটাও মনে রাখা উচিত। বঙ্কিমের অনেকগুলি উপন্যাসই মধ্যযুগীয় পটভূমিতে পরিকল্পিত। তাদের মধ্যে মৃণালিনী (১৮৬৯), আনন্দমঠ (১৮৮২), রাজসিংহ (১৮৮২) এবং সীতারাম (১৮৮৭)-এ হিন্দু ও মুসলমান রাজাদের মধ্যে সংগ্রামই

১ T. W. Clark. "*The Role of Bankimchandra in the Development of Nationalism*" Historians of India, Pakistan and Ceylon, 1961. p 439

দেখানো হয়েছে। বিশুদ্ধ সাহিত্যিক সৌন্দর্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যের কথা ছেড়ে দিলেও মুসলমান রাজশক্তির স্বেচ্ছাচারিতা দেখানোও তাঁর উদ্দেশ্যে ছিল। বিশেষত অষ্টাদশ শতাব্দীতে মোগল-রাজশক্তি যখন ধ্বংসোন্মুখ, ইংরেজ যখন ধীরে ধীরে ক্ষমতায় আসছে সে সময় দেশের অনিশ্চিত অবস্থার জন্য বাংলাদেশের দুর্ভাগ্যের সীমা ছিল না। এ সময়ের দুঃসহ স্মৃতি দীর্ঘকাল জাগরূক ছিল। একজন ঐতিহাসিক বলেছেন[১]—

His target was not the upright Muslim, but the decadent tyrant. The question might have arisen if Bankim had dealt unjustly with an Akbar, a Sher Shah or a Hussain Shah. But he was portraying an Aurangzeb, a Katlu Khan or a Tarab Khan, and even Sir Jadunath was not able to impugn the historicity of such protrayal.

অতএব বঙ্কিম যদি ভুল করে থাকেন তবে ভারতবর্ষের ইতিহাসকেই নতুন করে রচনা করতে হয়। রাজসিংহের উপসংহারে বঙ্কিম সুস্পষ্টভাবেই তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করে বলেছেন, হিন্দু হলেই ভালো হয় না অথবা মুসলমান হলেই মন্দ হয় না।

'অন্যান্য গুণ থাকিতেও যাহার ধর্ম নাই—হিন্দু হৌক মুসলমান হৌক সেই নিকৃষ্ট। ঔরঙ্গজেব ধর্মশূন্য, তাই তাঁহার সময় হইতে মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হইল। রাজসিংহ ধার্মিক, এজন্য তিনি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি হইয়াও মোগল বাদশাহকে অপমানিত এবং পরাস্ত করিতে পারিয়াছিলেন।'

এখানে ধর্ম বলতে অবশ্যই বঙ্কিমচন্দ্র উচ্চতর মানবধর্মকেই বুঝিয়েছেন। সীতারাম উপন্যাসে চাঁদশাহ ফকির মানবধর্মের অধিকারী ছিলেন, পরন্তু তোরাব খাঁ ছিলেন না। 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা' (১৮৭৩) প্রবন্ধে বঙ্কিম আকবরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে বলেছেন ঔরঙ্গজেবের শাসনে ভারতবর্ষ সত্য সত্যই পরাধীন ছিল। একটা জাতি লক্ষকোটি মানুষকে নিয়ে গঠিত। তাদের ধর্ম, আচার, আচরণে অসংখ্য বৈচিত্র্য। এই সাধারণ লোকসমাজ থেকে রাজা যখন নিজেকে আলাদা করে ফেলেন তখন তিনি আর দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন না। রাজসিংহ উপন্যাসে বঙ্কিম দুটি রাজাকে দেখিয়েছেন—একজন অকুণ্ঠচিত্তে দেশের দীনতম ব্যক্তির সঙ্গে মিশে গিয়েছেন এবং জাতিকে আদর্শে প্রবুদ্ধ করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন, আর একজন ব্যক্তিগত

সম্মান রক্ষার জন্য আদর্শবিহীন সৈন্যদলকে নিয়ে রাজপুতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। ঔরঙ্গজেব সন্দেহপ্রবণ নিঃসঙ্গ, এমনই নিঃসঙ্গ যে নিজের পত্নীও তাঁকে ভালোবাসে না। এই স্বেচ্ছাচারী মুসলমান রাজাকেই বঙ্কিম সমালোচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রেমে যেমন অতীত-মগ্নতা ছিল তেমনি ছিল জনসমাজ-সচেতনতা। এই জনসমাজে হিন্দু এবং মুসলমান দুই-ই আছে। 'বঙ্গদেশের কৃষক'-এ বঙ্কিমচন্দ্র যে-সমস্যার চিত্র তুলে ধরেছেন তা উভয় সম্প্রদায়েরই। 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে তিনি স্বাভাবিক মুসলমানি শব্দকে গ্রহণ করতে প্রবল যুক্তি দেখিয়েছেন।

তাঁর প্রবন্ধে বঙ্কিম মুসলমান-সমাজ সম্বন্ধে কোনো বিদ্বেষ পোষণ করেন নি। ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধেও তাঁর কোন বিরূপ মন্তব্য নেই। তিনি লোকসমাজের উপরেই জোর দিয়েছেন জাতীয়তাবাদের পরিকল্পনায়। রাজা স্বেচ্ছাচারী অথবা উদার হতে পারেন আমাদের বিচার্য সাধারণ প্রজাই—তারাই জাতি বা নেশন। দেশের জন্য তাদেরই মনে প্রীতি জাগানো চাই। বঙ্গদর্শন প্রকাশের মূলে বঙ্কিমের ছিল এই কামনা। বাংলা ভাষার জন্য তাই ছিল এত আগ্রহ। বিভিন্ন প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লোকসমাজের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে বোঝাতে চেয়েছেন। 'ভারতকলঙ্ক' প্রবন্ধে তিনি মুসলমানদের দ্বারা হিন্দু-দের পরাজিত হওয়ার কারণ নির্ণয় করেছেন; 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা' প্রবন্ধে এই শব্দ দুটির তাৎপর্য নির্দেশ করে হিন্দু এবং মুসলমানের স্থান মধ্যযুগের শাসনকালে কি ছিল ব্যাখ্যা করেছেন। হিন্দুরা আগে থেকেই ছিল, মুসলমান পরে এসেছে, অতএব একটা দেশের জাতীয় ইতিহাসের প্রকৃতি বুঝতে গেলে বহিরাগত জাতি কীভাবে দেশকে নাড়া দেয় সে-দিকটা ঐতিহাসিক কারণেই দেখাতে হয়েছে। সেইজন্যই একটি বিরোধ অবলম্বন করে স্বাধীনতা ও পরাধীনতার সুফল কুফল দেখাতে হয়। অতীত ইতিহাসে হিন্দু-মুসলমানের ইতিহাসই বঙ্কিমের তত্ত্ব নির্ণয়ে সাহায্য করেছে। এখানে কোনো বিশেষ জাতির প্রতি বিদ্বেষ সূচিত হয়েছে মনে হয় না। অতীতের ইতিহাস থেকেই ভবিষ্যৎ হিন্দু-মুসলমান-জাতিকে শিক্ষা নিতে হবে।

ইংরেজপূর্ব যুগে ভারতবর্ষ এক জাতি ছিল না, এ কথা বঙ্কিম বলেছেন।[১] অতএব রাজনৈতিক দিক থেকে সামগ্রিক ভারতবর্ষকে তিনি তখন দেখাতে পারেন নি। রাজপুত মোগল অথবা হিন্দু তুরকী অথবা মুসলমান হিন্দু-সীতারাম—এইভাবেই বিভিন্ন গোষ্ঠী কল্পনা করতে হয়েছে। ইংরেজ আমলে একটি ভারতীয় জাতি গড়ে উঠছে। তার উল্লেখ তিনি করেছেন বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনায়।—

'এমন অনেক কথা আছে যে তাহা কেবল বাঙ্গালীর জন্য নহে; সমস্ত ভারতবর্ষ

১ 'এই প্রবন্ধে জাতি শব্দে Nationality বা Nation বুঝিতে হইবে'—ভারত কলঙ্ক

তাহার শ্রোতা হওয়া উচিত। ভারতবর্ষীয় নানা জাতি, একমত, একপরামর্শী, একোদ্যোগী না হইলে ভারতবর্ষের উন্নতি নাই। এই মতৈক্য, একপরামর্শিত্ব, একোদ্যম কেবল ইংরেজির দ্বারা সাধনীয়; কেন না এখন সংস্কৃত লুপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্রী তৈলঙ্গী, পাঞ্জাবী ইহাদিগের সাধারণ মিলনভূমি ইংরেজি ভাষা। এই রজ্জুতে ভারতীয় ঐক্যের গ্রন্থি বাঁধিতে হইবে।'

বঙ্কিম এখানে এক ভারতীয় জাতিগঠনের কথা বলেছেন।[১] হিন্দু সংস্কৃতির দিক দিয়ে বহু পূর্বকাল থেকেই যে একটি অখণ্ড ভারতবর্ষ ছিল এবং তার ভাষা ছিল সংস্কৃত সে বিষয়েও বঙ্কিমচন্দ্র সচেতন। সেই ভারত-চেতনা থেকেই তিনি পুরাণ, গীতা, মহাভারত, বেদ এবং দর্শন আলোচনা করেছেন। আর্যজাতির বংশসম্ভূত হতে তাঁর গর্ব।[২] কিন্তু আধুনিক যুগে নতুন শাসনরজ্জুতে বদ্ধ অখণ্ড এক ভারতীয় জাতি গড়ে ওঠার স্বপ্ন তিনি দেখছেন।

তাঁর বাংলাদেশ সম্বন্ধে একাধিক প্রবন্ধ কোনো দিক দিয়েই ভারত-বোধকে ক্ষুণ্ণ করে নি। যে বাংলাভাষায় তিনি লিখেছেন সেই ভাষা যাদের মাতৃভাষা তারা স্বভাবতই একটি গোষ্ঠীবন্ধনে বদ্ধ। সেই ভৌগোলিক চেতনা থেকেই তিনি স্বভাষীর ইতিহাস উদ্ধারে ব্যাকুল হয়েছিলেন। তার দেশচেতনা বাংলাদেশকে আশ্রয় করেই জেগে উঠেছে। আর-একটি বাস্তব তথ্য এই যে তখন কলকাতাই ছিল ভারতবর্ষের রাজধানী এবং কেন্দ্র, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিও বিস্তৃত ছিল সুদূর অঞ্চল পর্যন্ত। আমাদের জাতীয়তা বোধ বাংলাদেশকে কেন্দ্র করেই স্পন্দিত হয়েছে এবং বঙ্কিমের সূত্র অনুসারে ক্রমেই বৃহত্তর জাতীয়-চেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপ্রাপ্ত হয়েছে। তেমনি বন্দে মাতরম্ বঙ্গজননীই বটে, আবার তাঁর একান্ত বহুকাল-পোষিত আধ্যাত্মিক সংস্কারে নিহিত বিশ্বাসের সঙ্গে মিলিয়ে তিনি রচনা করলেন দেশাত্মবোধের মন্ত্র—

তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে

প্রতি মানবদেহ-ই মন্দির, আর তারই অন্তরলোকে অধিষ্ঠিত মাতৃভূমির প্রতিমা।

১ ইতিপূর্বে হিন্দুমেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মিলে সব ভারতসন্তান' এবং গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'লজ্জায় ভারত যশ গাইব কি করে' গান দুটিতে ভারত-প্রশস্তি শোনা গেছে।

২ দ্রষ্টব্য বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ

বঙ্কিমবাবু তাড়াতাড়ি সে-মালা আমার গলায় দিয়া বলিলেন, 'এ মালা ইহারই প্রাপ্য। রমেশ, তুমি সন্ধ্যাসঙ্গীত পড়িয়াছ?'

—রবীন্দ্রনাথ

সাধারণ শিক্ষিত পাঠকের কাছে বঙ্কিমচন্দ্র পরিচিত ঔপন্যাসিকরূপে যেমন রবীন্দ্রনাথ পরিচিত কবিরূপে। এ বিষয়ে সংস্কার এতই দৃঢ়মূল হয়ে আছে যে তাঁদের যে অন্যবিধ পরিচয় আছে, তা আমাদের মনে সব সময় থাকে না, অন্তত বিচারবোধ আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। তাঁদের সামগ্রিক পরিচয় গ্রহণে এই সংস্কার অনেক সময়েই দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করে থাকে। বাংলা দেশের সামাজিক ও জাতীয় ইতিহাসের দিক দিয়ে দুজনকে দুই যুগে যে ভাবে অধিনায়কত্ব করতে দেখি, তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তাঁদের এই ভূমিকার মূলে আছে এক দুঃসাধ্য মননসাধনা। তাঁদের দৃঢ় বিচারবোধ জীবন ও সমাজের বিশিষ্ট আকৃতিকে চোখের সামনে মেলে ধরেছিল। যদিও দেখা যাবে দুজনের কর্মপথ শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন দিকে ধাবিত, তথাপি মানুষের পরম মূল্যে তাঁরা বিশ্বাস অটুট রেখেছেন। এই বিশ্বাসকে আশ্রয় করেই তাঁরা মানুষের দোষ ত্রুটি এবং মহত্ত্বকে মিলিয়ে নতুন করে গড়তে চেয়েছেন। এজন্য তাঁদের মনীষার তুলনা যথেষ্ট কৌতূহলজনক হয় বলেই মনে হয় এবং তার মধ্যে শিক্ষণীয়তাও কিছু কম থাকবে না। এ বিষয়ে সোজাসুজি উদ্যোগী হওয়ার আগে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ এবং পারস্পরিক মনোভাবের সন্ধান নেওয়াও সঙ্গত।

বঙ্গদর্শনের প্রথম প্রকাশের সময়ে বালকচিত্তে তার প্রভাবের বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন জীবনস্মৃতিতে। বঙ্কিমের মৃত্যুর পর চৈতন্য লাইব্রেরীতে রবীন্দ্রনাথ যে প্রবন্ধ পড়েন তাতেও বঙ্গদর্শনের প্রথম আবির্ভাবকে তিনি সম্রাটের প্রথম সমাগমের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। প্রথম বর্ষার জলধারা বালক যুবা প্রৌঢ় গৃহিণী এবং বধূ সকলেরই হৃদয়তলকে রসসিক্ত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ তখন বালক, বয়স বারো কি তেরো। মধ্যাহ্নের শান্ত প্রহরগুলি বঙ্গদর্শনের পাতা উল্‌টে কেটে যেত— সে-তন্ময়তার কথা রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই ভুলতে পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে ঠাকুর পরিবারের পরিচয় এর আগেই হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন বঙ্কিমের বন্ধু। দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেছিলেন স্বপ্নপ্রয়াণের কোনো অংশ বঙ্গদর্শনে প্রকাশের জন্য বঙ্কিমের কাছে

পাঠিয়েছিলেন। 'বঙ্কিমবাবু বোধহয় সেগুলো ছাপান নাই, এক-আধটা ছাপাইয়াছিলেন কিনা আমার স্মরণ নাই। কিন্তু তাঁহার বিষবৃক্ষের মধ্যে ঠিক সেই রকম ছবির অবতারণা করিয়া বসিলেন।'[১] স্বপ্নপ্রয়াণের প্রথম সর্গটি অবশ্য বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়েছিল।[২] বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে যে সাহিত্যিক আদর্শ স্থাপিত করেছিলেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্রনাথ ঠিক সেই পথের পথিক ছিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম যুগে নানা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করছিলেন এবং অন্যদের উৎসাহিত করছিলেন। ইংরেজি শিক্ষার আয়োজন সম্পূর্ণ হলে বাঙালীদের মধ্যে মৌলিক চিন্তার সূত্রপাত হল বটে, কিন্তু তাদের সংহত করে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। ১৩০৮-এ রবীন্দ্রনাথ নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের সম্পাদনার ভার নিয়ে লিখেছিলেন 'তখনকার সেই নির্ঝরধারাটি বঙ্কিমের ব্যক্তিগত প্রবাহের দ্বারা পূর্ণ ছিল; তিনিই তাহাকে গতি দিয়াছিলেন এবং তিনিই তাহার দিক্ নির্দেশ করিয়াছিলেন। সেই ধারাটির মধ্যে সর্বত্রই যেন তিনি দৃশ্যমান ও বহমান ছিলেন।' এই বিচিত্র ভাবের বন্যায় বাঙালী পাঠক প্লাবিত হয়ে গেল। বঙ্গদর্শনের এই ভাবুকতার দ্বারা রবীন্দ্রনাথ কতদূর প্রভাবিত হয়েছিলেন, সেটা বলা কঠিন। তখন তাঁর বয়স অল্প। উপন্যাসের রোমান্স এবং ছবিগুলি তাঁর বালক-মনকে যতটা আকৃষ্ট করবে প্রবন্ধ তাঁকে ততটা আকৃষ্ট করবে না, এটাই স্বাভাবিক। বিশেষত রবীন্দ্রনাথের নিজের পরিবারেই একটা বিশিষ্ট চিন্তাধারা গড়ে উঠেছিল। দেবেন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তো ছিলেনই রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি অন্যান্যরাও ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের চিন্তার গ্রন্থিবন্ধন যে এঁদের দ্বারাই হয়েছিল, তার জন্য কোনো প্রমাণ-প্রয়োগের প্রয়োজন নেই।

বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় কলেজ রিইউনিয়ন উপলক্ষে মরকতকুঞ্জে। 'জীবনস্মৃতি'তে এবং 'সাধনা'র 'বঙ্কিমচন্দ্র'-প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের একটি স্পষ্ট রেখান্বিত ছবি এঁকেছেন যাতে শুধু দৈহিক রূপটি নয়, অন্তরের রূপটিও অসাধারণ তীক্ষ্ণতায় ফুটে উঠেছে। দ্বিতীয়বার দুজনের সাক্ষাৎ হয়েছিল ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি-সেপ্টেম্বর মাসে, বঙ্কিমচন্দ্র তখন হাওড়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। সেই বছরেই বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে বরণ করে নেন বাংলার প্রধান লেখকদলের মধ্যে। বঙ্কিমচন্দ্রের পাণ্ডিত্য ও রসসৃষ্টির শক্তি তাঁকে সাহিত্যক্ষেত্রে

১ বিপিনবিহারী গুপ্ত. 'পুরাতন প্রসঙ্গ', ২ পর্যায়, পৃ ১৯৩

২ স্বপ্নপ্রয়াণ 'রহস্যসন্দর্ভ' পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়েছিল। স্বপ্নপ্রয়াণের প্রথম ধারাবাহিক প্রকাশের বিবরণ দ্রষ্টব্য বর্তমান লেখকের 'কাব্যবাণী' ১৯৬৭, 'দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর'।

মহিমাপূর্ণ আসনে করেছিল প্রতিষ্ঠিত। তরুণ বাঙালীর কাছে তিনি ছিলেন শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের পাত্র। নিভৃতে রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের আদর্শ মনে মনে লালন করলেও বঙ্কিমের কাছে স্বীকৃত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা স্বভাবতই ছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম থেকেই গভীর স্নেহ পোষণ করেছেন। বঙ্গদর্শনে হেমচন্দ্র-রঙ্গলালের যে ধরনের কবিতা প্রকাশিত হত, রবীন্দ্রনাথ একেবারে প্রথম দিকে তার কিছু কিছু অনুকরণ করেছিলেন কিন্তু 'বাল্মীকি-প্রতিভা'য় (১৮৮১) কিংবা 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' (১৮৮২) সম্পূর্ণ ভিন্ন রীতি এবং আদর্শকেই অবলম্বন করেছিলেন। অথচ এই দুটি গ্রন্থ সম্পর্কেই বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছিলেন।[১] জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আহূত বিদ্বজ্জনসমাগমে (১২৮৭, ১৬ ফাল্গুন) 'বাল্মীকি-প্রতিভা' নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। এই অভিনয়ে বঙ্কিমচন্দ্র গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজকৃষ্ণ রায় উপস্থিত ছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বাল্মীকির জয়' গ্রন্থের সমালোচনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন[২]—

'যাঁহারা বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "বাল্মীকি-প্রতিভা" পড়িয়াছেন বা তাঁহার অভিনয় দেখিয়াছেন তাঁহারা কবিতার জন্মবৃত্তান্ত কখনো ভুলিতে পারিবেন না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই পরিচ্ছেদে [বাল্মীকির কবিত্বলাভ পরিচ্ছেদে] রবীন্দ্রবাবুর অনুগমন করিয়াছেন।'—বঙ্গদর্শন ১২৮৮ আশ্বিন।

পরের বৎসরেই রবীন্দ্রনাথের 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' (১৮৮২) প্রকাশিত হল। এই বই পড়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব কি হয়েছিল তার উল্লেখ রবীন্দ্রনাথ করেছেন 'জীবনস্মৃতি'তে,—

'সন্ধ্যাসঙ্গীতের জন্ম হইলে পর সূতিকাগৃহে উচ্চস্বরে শাঁখ বাজে নাই বটে কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যে তাহাকে আদর করিয়া লয় নাই তাহা নহে। আমার অন্য কোনো প্রবন্ধে আমি বলিয়াছি— রমেশ দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহসভার দ্বারের কাছে বঙ্কিমবাবু দাঁড়াইয়াছিলেন; রমেশবাবু বঙ্কিমবাবুর গলায় মালা পরাইতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময়ে আমি সেখানে উপস্থিত হইলাম। বঙ্কিমবাবু তাড়াতাড়ি সে মালা আমার গলায় দিয়া বলিলেন, এ মালা ইঁহারই প্রাপ্য। রমেশ, তুমি সন্ধ্যা-সঙ্গীত পড়িয়াছ? তিনি বলিলেন, না। তখন বঙ্কিমবাবু সন্ধ্যাসঙ্গীতের কোনো কবিতা সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করিলেন তাহাতে আমি পুরস্কৃত হইয়াছিলাম।'

১ 'চার অধ্যায়'-এর ভূমিকায় (প্রথম সংস্করণ) রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ই তাঁর কাব্যের প্রথম অকুণ্ঠিত প্রশংসাবাদ করেছিলেন।—রবীন্দ্ররচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃ ৫৪১ দ্রষ্টব্য। এই উক্তি ঠিক নয়।

২ নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত জীবনস্মৃতি ১৩৬৩, পৃ ২১১-১২

১৮৮২ খ্রীস্টাব্দেই (১২৮৯ সাল, ২ শ্রাবণ) জোড়াসাঁকোয় স্থাপিত সারস্বত সমাজে বঙ্কিমচন্দ্র হন সহ-সভাপতি। এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র-নাথ। এই সমাজের সভাপতি ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র, এবং বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়াও সহযোগী সভাপতি ছিলেন সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।[১] বিদ্যা-সাগর মহাশয়কে নেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। তিনি উৎসাহ দিয়েছিলেন, কিন্তু যোগ দেন নি। সেই বৎসরেই ২৩-এ জানুয়ারি ১১ই মাঘের উৎসবে সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রকে বাড়ি থেকে জোড়াসাঁকোয় নিয়ে যান।[২] সরলা দেবীচৌধুরাণী 'জীবনের ঝরাপাতা'য় সম্ভবত এই দিনের স্মৃতিই লিখেছেন[৩]—

'একবার একটা ১১ই মাঘের উৎসবে বাড়ির ছেলেমেয়ে গায়নমণ্ডলী আমরা গান গাইতে গাইতে হঠাৎ অনুভব করলুম আমাদের পিছনে একটা নাড়াচাড়া সাড়াশব্দ পড়ে গেছে। কে এসেছেন? পিছন ফিরে ভিড়ের ভিতর হঠাৎ একটি চেহারা চোখে পড়ল—দীর্ঘনাসা তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল দৃষ্টি, মুখময় একটা সহাস্য জ্যোতির্ময়তা। জানলুম তিনি বঙ্কিম।'

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য সরলা দেবী বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। ভারতীতে সরলা দেবীর 'রতিবিলাপ' এবং 'মালবিকাগ্নিমিত্র' পড়ে বঙ্কিম নিজেই চিঠি লেখেন প্রশংসা করে। নিজের এক সেট বইও বঙ্কিম নবীনা লেখিকাকে উপহার দিয়েছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর দীনেন্দ্র স্ট্রীটের বাড়িতে বঙ্কিম এসেছেন এবং দুই পরিবারের মধ্যে মধুর অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে। সরলা দেবী বঙ্কিমের 'সাধের তরণী' গানটিতে সুর দেন। 'শতগান'-এ তার স্বরলিপিও দেওয়া আছে।

ঠাকুরপরিবারের লেখকলেখিকা সকলের সঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্রের সৌহার্দ্য ছিল যদিও ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে উপরে উল্লিখিত ঘটনাগুলির আগে একটি ঘটনা ঘটে যা এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কবিতাপুস্তক' প্রকাশিত হয় ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে। বঙ্গদর্শন ও ভ্রমরে প্রকাশিত কয়েকটি ক্ষুদ্র কবিতা এবং বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যরচনা 'ললিতা ও মানস' এই বইতে আবার ছাপা হয়েছিল। ১২৮৫-র ভাদ্র সংখ্যার 'ভারতী' পত্রিকায় 'কবিতা-পুস্তকে'র কঠোর প্রতিকূল সমালোচনা করা হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন 'ভারতী'র সম্পাদক।—

'আমরা বলিতে বাধ্য হইলাম যে বঙ্কিমবাবুর "কবিতাপুস্তক" আমাদিগের ভাল

১ 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি' পৃ ২২০-২২

২ সাহিত্যসাধক চরিত মালা—'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' পৃ ৯৭

৩ 'জীবনের ঝরাপাতা', ১৮৭৯ শক পৃ ৪৪

লাগিল না— জ্ঞানের কথা এস্থলে উল্লেখ করাই বাহুল্য মাত্র, কিন্তু আমোদ— সাধারণ, সামান্য অকিঞ্চিৎকর আমোদ পর্যন্ত এ পুস্তকের কোন স্থান পাঠ করিয়া আমরা পাইলাম না— বঙ্কিমবাবুর কোন গ্রন্থই যে এরূপ নীরস, নির্জীব, স্বাদগন্ধহীন— কিছুই না— হইবে তাহা আমরা কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই।'

এর পরেও 'ভারতী'তে বঙ্কিম সমালোচিত হয়েছিলেন। ১২৮৭ জ্যৈষ্ঠ এবং আষাঢ় সংখ্যায় জনৈক লেখক 'শকুন্তলা'-সমালোচনাপ্রসঙ্গে বঙ্কিমের শকুন্তলা-সমালোচনার প্রতিকূল বিচার করেছিলেন। এরও প্রায় দশ বৎসর পরে ১২৯৭-এর কার্তিক মাসে 'ভারতী'তেই 'কাব্যের উদ্দেশ্য' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে বঙ্কিমের রসসৃষ্টির মতবাদকেই আক্রমণ করা হয়েছিল। বঙ্কিমের ইতিহাস-জ্ঞানকেও সমালোচনা করেছিলেন আদি ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক কৈলাসচন্দ্র সিংহ।[১] ইনি একজন ঐতিহাসিকও ছিলেন। এই সব সমালোচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোনো যোগ হয়তো ছিল না; কিন্তু বঙ্কিমের সম্বন্ধে কোনো অন্ধতাও যে ছিল না, এর থেকে সেটাও বোঝা সহজ। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ধর্মবিষয়ে বঙ্কিমের যে বিখ্যাত মতভেদ ঘটে সেটা ১৮৮৪-র ঘটনা। বঙ্কিমের উক্তিতেই জানা যায় লিখিতভাবে বঙ্কিমের মতের প্রতিবাদের পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর কোনো মনোবাদ ঘটে নি। দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমের কাব্যের এবং সাহিত্যিক মতবাদের প্রতিবাদ হলেও ঠাকুর-পরিবারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগে কোনো ফাটল ধরে নি। একালের কোনো কোনো লেখক বঙ্কিম সম্পর্কে ঈর্ষা এবং সংকীর্ণতার ইঙ্গিত করেছেন বলে এই ঘটনাগুলিকে প্রণিধানযোগ্য বলে মনে করি।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত 'নবজীবন'-এ (প্রথম প্রকাশ ১২৯১) এবং বঙ্কিমের জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'প্রচার' পত্রে (প্রথম প্রকাশ ১২৯১) বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন প্রধান লেখক। এই দুই পত্রিকাতে রবীন্দ্রনাথও গদ্যরচনা দিয়েছিলেন। ঠিক একই সময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাদবিতর্ক আরম্ভ হল। বঙ্কিমচন্দ্র সাধারণত তাঁর সমালোচনার উত্তর দিতেন না। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের লেখনী-প্রসূত বলেই বঙ্কিম উত্তর দিয়েছিলেন এবং প্রত্যুত্তরের আর উত্তর দেন নি। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে অসাধারণ শালীনতা এবং শ্রদ্ধাসহকারে সেই ঘটনার ইঙ্গিত মাত্র করে লিখেছিলেন—

'এই বিরোধের অবসানে বঙ্কিমবাবু আমাকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হারাইয়া গিয়াছে— যদি থাকিত তবে পাঠকেরা দেখিতে

১ দ্রষ্টব্য নব্যভারত ভাদ্র ১২৯১ 'বাংলার কলঙ্ক' (প্রতিবাদ) এবং পৌষ ১২৯১, 'দ্বন্দ্ব জবাব'।

পাইতেন বঙ্কিমবাবু কেমন সম্পূর্ণ ক্ষমার সহিত এই বিরোধের কাঁটাটুকু উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছিলেন।'

তার অন্য প্রমাণও আছে। এর কিছুদিন পরেই ভারতীর লেখকগোষ্ঠীতে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম বিজ্ঞাপিত হয়েছিল। আর একটি প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ জীবনের প্রায় শেষের দিকে রেখে গিয়েছেন। রবীন্দ্ররচনাবলীতে (১ম খণ্ড) প্রকাশিত 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাটে'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বঙ্কিমের একটি চিঠি স্মরণ করেছেন—

'সজীবতার স্বতশ্চাঞ্চল্য মাঝে মাঝে এই লেখার মধ্যে দেখা দিয়ে থাকবে তার একটা প্রমাণ এই যে এই গল্প বেরোবার পরে বঙ্কিমের কাছ থেকে একটি অযাচিত প্রশংসাপত্র পেয়েছিলুম, সেটি ইংরেজি ভাষায় লেখা। সে পত্রটি হারিয়েছে কোনো বন্ধুর অযত্নকরক্ষেপে। বঙ্কিম এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে বইটি যদিও কাঁচা বয়সের প্রথম লেখা তবু এর মধ্যে ক্ষমতার প্রভাব দেখা দিয়েছে— এই বইকে তিনি নিন্দা করেন নি। ছেলেমানুষির ভিতর থেকে আনন্দ পাবার এমন কিছু দেখেছিলেন যাতে অপরিচিত বালককে হঠাৎ একটা চিঠি লিখতে তাঁকে প্রবৃত্ত করলে। দূরের যে পরিণতি অজানা ছিল সেইটি তাঁর কাছে কিছু আশার আশ্বাস এনেছিল। তাঁর কাছ থেকে এই উৎসাহবাণী আমার পক্ষে ছিল বহুমূল্য।'[১]

রবীন্দ্রনাথও এই সময়ে বঙ্কিমের উপন্যাসের আলোচনা করেছেন।[২] রবীন্দ্রনাথের স্বাধীন বিচারবোধ যে জেগে উঠতে আরম্ভ করেছে এই গদ্যরচনাগুলিতে স্পষ্টতই তার আভাস আছে। স্পষ্ট ভাবণের সাহসও দেখা গেল বঙ্কিমের সঙ্গে বিতর্কে। এর পরে আরো দুটি ঘটনা যোজনা করা যায়। ১২৯৯ সালের পৌষ মাসের 'সাধনা'য় রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত প্রবন্ধ 'শিক্ষার হেরফের' প্রকাশিত হলে বঙ্কিমচন্দ্র নিজের থেকে চিঠি লিখে জানান 'প্রতি ছত্রে আপনার সঙ্গে আমার ঐক্য আছে'। ১৩০০ সালে

১ শ্রীশ মজুমদারের বঙ্কিমপ্রসঙ্গে এ সম্পর্কে আছে—'রবীন্দ্রবাবুর কথা উঠিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "তাঁর উপন্যাস কি আপনি পড়িয়াছেন?" 'উত্তর'—"পড়েছি"। স্থানে স্থানে অতি সুন্দর সুন্দর উচ্চদরের লেখা আছে কিন্তু উপন্যাসের হিসাবে সেটা নিষ্ফল হয়েছে। রবিকে সে কথা আমি বলেছি। উদীয়মান লেখকদের মধ্যে হরপ্রসাদ তুমি ও রবির মধ্যে আমার বোধ হয় রবি বেশি "গিফটেড" 'কিন্তু' "পৃকোসাস", এখনি তার বয়স ২২।২৩, সে কথা সেদিন রবিকে বলেছি।'—'বঙ্কিমপ্রসঙ্গ' পৃ ১৯৬

২ ভারতী ১২৯০ 'বাউলের গান', দ্রষ্টব্য অচলিতসংগ্রহ ২য় খণ্ড পৃ ১৩১। 'বিবিধপ্রসঙ্গ' ১৮৮৩-এর 'উপভোগ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কমলাকান্তের দ্বাদশ সংখ্যক দপ্তরের উল্লেখ করেছেন। দ্রষ্টব্য অচলিত-সংগ্রহ, ১ম পৃ ৩৯৪।

চৈতন্য লাইব্রেরীতে রবীন্দ্রনাথ 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' নামে প্রবন্ধ পড়েন। সে-সভার সভাপতিত্ব করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র।[১] সম্ভবত মৃত্যুর পূর্বে এটাই বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ সভায় যোগদান।

রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রের পারস্পরিক সম্পর্কের এই বিবরণ অসম্পূর্ণ। অনেক খুঁটিনাটি তথ্য আরও সংগ্রহ করা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বঙ্কিমের আরও বহুবার দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে। এখানে আমরা মূল আলোচনার পটভূমিরূপে দুজনের প্রতি দুজনের মনোভাবের একটা আভাস মাত্র দিলাম।

আমাদের মূল আলোচনা বঙ্কিম-রবীন্দ্রের বিতর্ক থেকেই আরম্ভ করব। এই বিতর্কের মধ্য দিয়েই বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য বোঝা সহজ হবে। তবে এটা মনে রাখা দরকার বঙ্কিমচন্দ্র তখন তাঁর মনীষার পরিণত স্তরে পৌছে গিয়েছেন। তাঁর সারা জীবনের চিন্তা তখন সুস্পষ্ট রূপ নিয়েছে। 'সত্য' বলতে কি বোঝায়, ইতিমধ্যে এ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান সম্পূর্ণ হয়েছে বলা যায়। বঙ্কিমের চিন্তার প্রণালী এবং বৈশিষ্ট্য যাঁরা অনুধাবন করেছেন, তাঁরা এটা বুঝতে পারবেন বঙ্কিমের সত্যের ধারণা 'মিসটিক্যাল' বা অতীন্দ্রিয় হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। তাঁর যুক্তি এবং বক্তব্য এতই স্পষ্ট যে এ সম্বন্ধে কোনো অনির্দিষ্টতা থাকবার কথা নয়। উপনিষদের ঋষি যে সত্য-ধর্মের কথা বলেছিলেন, যার ব্যাখ্যাতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন দার্শনিক মত গড়ে উঠেছে, বঙ্কিমচন্দ্র সেই সত্যকেও ব্যাখ্যা করে বোঝাতে যান নি। সেই ব্যাখ্যাতে সেকালের সমাজের প্রয়োজন কিছু মিটত না, পুরোনো দর্শনের বড়ো জোর আর-এক নতুন ভাষ্য হত মাত্র। সত্যের যে-পর্যায় আচার্য শঙ্কর স্থির করেছিলেন, যুক্তির দিক দিয়ে তা অনতিক্রম্য। শঙ্করের সত্য-ধারণাতে সৃষ্টির খণ্ড এবং অখণ্ড উভয়রূপেরই যথাযোগ্য স্বীকৃতি আছে। তবু শঙ্করের বৈদান্তিক মতবাদ খণ্ড-জীবনের পূর্ণ মর্যাদা দিতে শেষ পর্যন্ত আমাদের অনুপ্রেরিত করে নি। ফলে কর্মসাধনার দিক দিয়ে আমাদের জীবনে শূন্যতাই রয়ে গিয়েছে। মধ্যযুগের সমাজে বেদান্তের চর্চা হ্রাস পেয়েছে। উপনিষদেরই আর-এক ব্যাখ্যায় বৈষ্ণব দর্শনের সৃষ্টি হল। ঈশ্বর লীলাময় বলেই তাঁর বহু বিচিত্র লীলা রচনা করতে বৈষ্ণবরা অনেক নতুন আচার-অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করেছে। ভগবানকে ব্যক্তিরূপে কল্পনা করাতে ভক্তের সঙ্গে যেন প্রত্যক্ষ যোগ গড়ে উঠল। আনুষ্ঠানিকতার উদ্ভবের একটি বীজ নিহিত ছিল এখানে।

এই ধর্মবিশ্বাস একদিকে যেমন আমাদের বৈরাগ্যপ্রবণ করে তুলল তেমনি গৃহী

১ এই সভার বিবরণ আছে যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য' গ্রন্থে।

মানুষের মধ্যে ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের বিস্তার-ও ঘটাল। স্মার্ত ধর্ম নামক যে-বিশ্বাস বহু পূর্বকাল থেকে চলে এসেছে, প্রত্যক্ষ ঈশ্বরোপলব্ধির ধর্ম সেটা নয়। দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায় ব্যক্তির কর্তব্যপালনের বিধিনিষেধ দিয়ে স্মৃতির বিধান। বৈদিক গৃহ্য এবং ধর্মসূত্র থেকে স্মৃতির উদ্ভব, মধ্যযুগের জটিল আচারের জালে তার বিস্তার। আদিতে স্মৃতির ছিল তিনটি শাখা, আচার, ব্যবহার এবং প্রায়শ্চিত্ত। তার থেকে আহ্নিক, সংস্কার, শুদ্ধি প্রায়শ্চিত্ত, শ্রাদ্ধ, কৃত্য, পূজা, প্রতিষ্ঠা, দান, কাল, ব্যবহার, বিবাদ, রাজধর্ম ইত্যাদি, বহুবিধ কর্তব্য নির্দেশের ব্যবস্থা হল। প্রাত্যহিক ব্যক্তি ও পরিবারের কর্তব্য থেকে সনাতন সমাজগত কর্তব্য পর্যন্ত স্মৃতির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চৈতন্যযুগ পর্যন্ত বাংলা দেশে অন্তত চোদ্দ জন বিখ্যাত স্মার্ত পণ্ডিতের নাম পাই।[১] তাঁদের মধ্যে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের বিধানই আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনকে দীর্ঘকাল শাসন করে এসেছে। রঘুনন্দন পূর্ববর্তী বিধানের কতকগুলি গ্রহণ করেছেন, কতকগুলি মার্জনা করেছেন, কতকগুলি নিজে রচনা করেছেন। যে-কালে রঘুনন্দন এই ব্যবস্থা দিয়েছিলেন সেকালে হয়তো এর প্রয়োজন ছিল। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্টই বলেছেন—

'স্মার্ত রঘুনন্দন একজন বিষম protestant ছিলেন। তিনি গোঁড়ামির প্রতিষ্ঠাতা নহেন বরং বলিব ভারতবাসীর বৈদিক গোঁড়ামির অপহ্নব-কর্তা। তিনি ব্রাহ্মণেতর জাতি সকলের মধ্যে যে ব্যাপক সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন তাহা অপূর্ব এবং অতুল্য। তাঁহারই প্রভাবে বাংলায় আচারীদিগের "ছুৎমার্গ" দাক্ষিণাত্যের তুল্য প্রবল হইতে পারে নাই।'

তবু এই সব আচার-বিচারের পশ্চাৎপটে ঠিক কোন্ দার্শনিক গভীরতর যুক্তি ছিল, জানি না। এ নিয়ে বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচনাও অনাবশ্যক। পরবর্তী শতাব্দী-গুলিতে সমাজ যে আচারের জটিলতায় জড়িয়ে পড়েছিল তাতে অর্থহীন অভ্যাসের পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছু ছিল না। একটি চিঠিতে বঙ্কিম রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবকে লিখেছিলেন[২]—

'স্মার্ত ঋষিদিগের হাতে—বিশেষতঃ আধুনিক স্মার্ত রঘুনন্দনাদির হাতে—ইহা অতিশয় সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। স্মার্ত ঋষিগণ হিন্দুধর্মের স্রষ্টা নহেন—হিন্দুধর্ম সনাতন —তাঁহাদিগের পূর্ব হইতেই আছে।'

১ Manmohan Chakravarty *Contributions to the History of Smriti in Bengal and Mithila.* Asiatic Society Journal. Sept. 1915 (N. S.) p. 312.

২ বঙ্কিমগ্রন্থাবলী, পরিষৎ সং, বিবিধ পৃ ৪১৮

অথচ এই সব বিধি-নিয়মগুলির পিছনে হয়তো একটা সামগ্রিক সত্যোপলব্ধি ছিল। বৌদ্ধদের শীল আত্মিক উপলব্ধির জন্য নয়, ব্যক্তির মনকে সংযত করার জন্য। হিন্দু ধর্মের উচ্চতর দার্শনিক চিন্তায় যে সত্যের ধারণা ছিল, তার সঙ্গে এই আনুষ্ঠানিকতার যোগ যে কোথায় ঠিক বলা যায় না। যেখানেই থাক, এ যে অনিবার্যভাবে সত্যবোধে নিয়ে যেতে সাহায্য করে নি, এ কথা বলাই বাহুল্য। মনের যে বিকাশ ঘটলে মানব-কল্যাণে ও ব্যক্তিগত শুচিতার যুক্তিবুদ্ধি স্বয়ম্প্রকাশ হয় সেই বিকাশের দ্বার রুদ্ধই ছিল। গীতায় যে নীতিসর্বস্বতার উর্ধ্বে যাওয়ার আহ্বান আছে, সেটা তো চিত্তোন্নয়ন ছাড়া আর কিছুই নয়। এই প্রশস্ত দৃষ্টিই মানুষকে কর্তব্য নির্ধারণের ক্ষমতা এনে দেবে। আধুনিক ভাষায় বলতে গেলে; মধ্যযুগে আচারসর্বস্বতা এই অন্ধতার সৃষ্টি করে চিত্তোন্নয়নের পথে বাধার সৃষ্টি করেছিল। এই প্রসঙ্গে আর-একটি বিষয়ও লক্ষণীয়। উচ্চতর দার্শনিক সত্যবোধকে আমরা ব্যক্তিগতভাবে যদি না-ও পেয়ে থাকি, তবুও এর একটা অলক্ষ্য প্রভাব আমাদের জীবনাচরণে থেকে গিয়েছে। সত্যকে ধ্রুব বলেই জানি, তাই আমাদের প্রাত্যহিক কর্ম স্থিরতাপন্থী হয়ে সামাজিক অচলতার সৃষ্টি করেছে। আমরা বরণ করে নিয়েছি অভ্যাসকে।

সমাজজীবনের এই জড়তার বিরুদ্ধে রামমোহন যুদ্ধ করেছিলেন। মধ্যযুগের সংকীর্ণ সত্যধারণাকে অস্বীকার করে তিনি জীবনের কল্যাণবোধকে উদারতর জ্ঞান দিয়ে পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সামাজিক সংস্কার-কর্মগুলি কোন্ প্রবল সর্বব্যাপী সত্যের অনুপ্রেরণা থেকে উৎসারিত হয়েছিল, আমাদের মনে এই প্রশ্ন জাগে। কিন্তু আনুমানিক উত্তর ছাড়া এই প্রশ্নের নিশ্চিত উত্তর দেওয়া কঠিন। তিনি ছিলেন শঙ্কর-পন্থী অদ্বৈতবাদী। নির্গুণ ব্রহ্মচেতনা তাঁকে কেমন করে সংসারের কর্মভার তুলে নিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল? অর্থাৎ সত্যের কোন্ রূপ তিনি অন্তরে অনুভব করেছিলেন যার জন্য সাধক রূপান্তরিত হলেন কর্মীতে? রবীন্দ্রনাথ রামমোহনের প্রসঙ্গে বারবার সত্য-সাধনার কথা বলেছেন। তাঁর মতে যে-দেশাচার সমাজকে বিশ্বমানব থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে, রামমোহন তাকেই ঘুচিয়ে বৃহৎ ঐক্যের কথা প্রচার করতে এসেছিলেন। রামমোহনের সত্যধারণা ঐক্যবোধের উপরেই স্থাপিত। তিনি যে অদ্বৈতপন্থী হয়ে প্রতিমা-পূজা ও ধর্মের অন্যান্য সংকীর্ণতার বিরোধিতা করেছিলেন, সেটা এই ঐক্যবোধ থেকেই উদ্‌ভূত। কিন্তু এই ঐক্যবোধ এবং ব্রহ্মানুভূতি এক নয়। বরং বলা যায় তাঁর প্রখর বুদ্ধির জাগরণের ফলে যে সব দিক দিয়ে তাঁর মনে ঐক্যবোধ দেখা দিয়েছিল, ধর্ম তাদের অন্যতম। এজন্য প্রত্যাশিত শান্তরসাশ্রিত জীবন তাঁর নয়। তাঁর জীবন ছিল বজ্রদীপ্ত কর্মময়।

এই বুদ্ধি নীতিরই বুদ্ধি। রামমোহন সমাজের সংস্কারে বাঙালীকে আহ্বান করেছেন, নৈতিক চেতনাই তার প্রেরণা। প্রতি কর্মপ্রচেষ্টার মূলে বিচ্ছিন্ন ও অন্য-নিরপেক্ষ নীতির চেতনাই ছিল। তাঁর সমগ্র জীবন ব্যক্তিগত এবং সমাজগত একটি সামগ্রিক সত্যোপলব্ধি দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে,—এমন করে রামমোহনের জীবনকে ব্যাখ্যা করা না গেলেও এটা ঠিক যে, মধ্যযুগের বিকৃতি থেকে সত্যকে ঐক্যবোধরূপে রামমোহনই পুনর্জীবিত করলেন এবং সেটা যুগান্তর ঘটাল আমাদের সমাজে।

কারণ, দেখতে পাচ্ছি ডিরোজিওর ছাত্ররা রামমোহনের এই নৈতিক আদর্শকেই মেনে নিয়েছেন। রামমোহনের সহচর তারাচাঁদ চক্রবর্তী এবং চন্দ্রশেখর দেব নব্য-বঙ্গের নেতৃত্ব করেছিলেন। রামমোহনের সংস্কারকর্মে তাঁরা উৎসাহিত হয়েছেন, রামমোহনের স্মৃতিবার্ষিকী নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। নব্যবঙ্গেরা নিজেদের কোনো দার্শনিক মতবাদকে সৃষ্টি করে তুলতে পারেন নি যদিও বিদেশী শাস্ত্রের চর্চা করে প্রখর বিচারবুদ্ধিকে আয়ত্ত করেছেন; সভা স্থাপন করে, পত্রিকা চালিয়ে সমাজ ও ধর্মকে বিশ্লেষণ করেছেন। বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে এবং তার পরেও নীতিশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা খুবই বেশি হয়েছে। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'রিফর্মার' পত্রিকাটি এই প্রসঙ্গে বিশেষ-ভাবেই উল্লেখযোগ্য। খ্রীস্টান মিশনারীরা বাঙালীকে নীতিশিক্ষা দেবার মহৎ ব্রতই নিয়েছিল! ইংরেজি শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং ব্রাহ্মমনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেই নীতিশিক্ষার উপর সব সময়েই জোর দিয়েছে। ডিরোজিও ছাত্রদের ধর্মশিক্ষা দেন নি, জাগিয়ে-ছিলেন অপরিসীম নীতিনিষ্ঠা এবং বিচারশক্তি। তখন এমন কথাও শোনা যেত হিন্দু কলেজের ছাত্র মিথ্যা বলতে জানে না—Indeed the college boy was a synonym for truth. কথাটা গৌরব করবার মতো যদিও অভিভাবকেরা ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন নিজের সমাজধর্মের প্রতি নীতিপালনের অনিচ্ছা দেখে। নূতন শিক্ষা-প্রাপ্তরা চিরাচরিত সমাজনীতিকে মানতে পারে নি। তাদের বিচারশক্তিকে তারা প্রয়োগ করল নূতন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে এবং তাই দিয়ে তারা স্থির করে নিল সত্যের নূতন স্বরূপকে। রামমোহনের সঙ্গে পার্থক্য এইখানেই যে নব্যবঙ্গের যুক্তিতর্কের ভাষা ও প্রণালী বিদেশীয়; স্বদেশী সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাও অগভীর। কিন্তু সমাজের আনুষ্ঠানিকতায় যে-নীতিবোধের মৃত্যুকে তারা দেখেছিল, সেই নীতিকে অন্যভাবে তারা চেয়েছিল ফিরিয়ে নিয়ে আসতে। তাদের কাছে ভগবান নয়, লোকব্যবহারের সততাই হচ্ছে চরম সত্য। এর মধ্যে খ্রীস্টীয় আদর্শ হয় তো ছিল, তার সঙ্গে ছিল বিদেশী বিদ্যায় শিক্ষা। তাই দিয়ে তারা স্থির করেছে নৈতিক সত্যকে। স্বাধীন

বিচারবোধ সত্যই শ্রদ্ধাযোগ্য কিন্তু এর কোনো সর্বস্বীকৃত নিরিখ নেই, এটাই এর ত্রুটি। সুতরাং নৈতিক সত্য থাকল সম্পূর্ণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হিন্দু কলেজের ছাত্র হয়ে এই নৈতিক আদর্শ পুরোপুরিই পেয়েছিলেন। তিনি অধ্যাত্মবাদী হয়ে উঠলেন, বেদের অপৌরুষেয়তায় বিশ্বাসও করেছিলেন, কিন্তু পরে তাঁর মতের পরিবর্তনও হয়েছিল। আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত সত্যধর্মকে অবলম্বন করে তিনি শাস্ত্রবচন বাছাই করলেন অর্থাৎ ব্যক্তিতান্ত্রিক জ্ঞানদীপ্ত বিচারবোধই বড়ো হল। স্মরণীয় এই যে অক্ষয়কুমার দত্ত এবং কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাবেই তাঁর মত তিনি পরিবর্তন করেছিলেন। নব্যবঙ্গীয় নীতিবাদিতার সঙ্গে যুক্ত হল ধর্মবিশ্বাসের দৃঢ়তা। দেবেন্দ্রনাথের পর কেশবচন্দ্রের আদর্শও এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যপূর্ণ সত্যবোধের দ্বারাই তৈরী হয়েছিল। শেষ পরিণাম হল মরমিয়াবাদ।

মধ্যযুগের বাঙালী সত্যকে কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠান ও হৃদয়হীন সংস্কারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ও বিকৃত করে এনেছিল। সতীদাহ যারা পালন ও সমর্থন করেছে তারাও সত্যপালনের আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে, কৌলীন্য এবং বহুবিবাহের স্মার্ত নির্দেশকে মহানন্দে শিরোধার্য করেও তারা ভাবল ধর্ম পালন করল। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতে সত্যধারণার পরিবর্তন ঘটতে চলল। সত্য হল মানবনৈতিক। অর্থাৎ-সত্য দেখা দিল শাস্ত্র-পুঁথির বাইরে ব্যবহারের জগতে। সমাজ-সম্পর্কে এক নতুন চেতনার উদয় হয়েছে। বিদেশী সাহিত্য ধর্ম ও সভ্যতার সংস্পর্শে এসে মানুষের আচরণ-বিচরণের বিস্তৃত ক্ষেত্র নিয়ে এই সমাজের ধারণা গড়ে উঠেছে। এই জগতে সত্যপালনের কোনো লিখিত শাস্ত্র নেই। পুরনো সংহিতা এবং স্মৃতি থেকে আর বিধান পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। স্বভাবতই প্রামাণ্য হয়ে দাঁড়াল ব্যক্তিরই বিচারবোধ। বাংলার নতুন যুগের লব্ধ সম্পদগুলির মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ অন্যতম।

কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত যথেষ্ট সতর্ক হওয়া দরকার। পুরনো সমাজ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। ইংরেজি শিক্ষা যারা পায় নি (এবং যারা পেয়েছে তাদের মধ্যেও অনেকে) এখনো পুরনো বিধানকে তারা মেনে চলে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই বলি আর নতুন মূল্যবোধই বলি—এর উদ্ভব এবং প্রতিপত্তি শিক্ষিত-সমাজের মধ্যে। বঙ্কিম যা লিখেছিলেন, তা শিক্ষিত সমাজের জন্যই। ইংরেজি বিদ্যা এবং শাস্ত্র থেকেই তিনি প্রামাণ্যতা সংগ্রহ করেছেন, ধর্মতত্ত্বের মূল থিয়োরি তৈরী হয়েছিল ইংরেজি দর্শনের প্রভাবে। বঙ্কিম নিশ্চয়ই আশা করেন নি তাঁর রচনা সাধারণ লোকে বুঝবে। নব্যবঙ্গেরাও কি সেই আশা করেছিল? এই শিক্ষিত সমাজ স্বাধীন বিচারবোধে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। বঙ্কিম এই বিচারবোধকে শ্রদ্ধা ও লালন করতে চেয়েছিলেন। বঙ্কিম

যখন বলেছিলেন, লোকহিতৈষার লক্ষ্য সম্মুখে রেখে মিথ্যা কখনো কখনো সত্য হয়, তখন কি তিনি শিক্ষিত মনের বিচারবোধের উপরেই ভরসা রাখেন নি? এ বিষয়ে শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে একটা অনড় নীতিকে পালন করার অর্থ সেই অভ্যাসেরই বশ্যতা স্বীকার করা যে অভ্যাসের বুদ্ধিহীন বিচারহীন হৃদয়হীনতাকেই আধুনিক শিক্ষা ধিক্কার দিয়েছে। বিতর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন সত্য কোনো অবস্থাতেই মিথ্যা হয় না। এ সত্য কোন্ সত্য? এও যেন কোনো এক স্মার্ত সত্য। বঙ্কিম এই অচল সত্যকে অনুগমন করার পরিবর্তে চেয়েছিলেন বিচার-বুদ্ধি দিয়ে সত্যকে বারবার নির্ধারণ করে নিতে।

প্রশ্ন হতে পারে মিথ্যাকে যদি এমনি করে 'সত্য' করে তুলতে হয়, তবে কি তার মধ্যে অপব্যবহারের মস্ত ফাঁক থেকে যায় না? বিচারবুদ্ধির স্বাধীনতার মধ্যে সেই আশঙ্কা চিরকালই নিহিত। অশিক্ষিত মন অনেক সময়েই স্বাধীনতাকে উচ্ছৃঙ্খল স্বার্থসাধনে পরিণত করতে পারে। এইজন্যই খ্রীস্ট এবং বুদ্ধের নীতি। এই জন্যই যত অনুশাসন এবং বিধি। এক সময়ে অবস্থাবৈগুণ্যে এই বিধিও অর্থহীন হয়ে পড়ে। তখন তাকে মেনে চলাই হয় দুর্ভোগ। এ রকম অচল বিধির চেয়ে চিত্তের বিচার-বোধকে জাগ্রত রাখার,আবশ্যকতাই বেশি। অর্থাৎ চাই একটি মার্জিত সভ্য জাগ্রত মন যে মন ন্যায় এবং অন্যায়, উচিত এবং অনুচিতের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম। ধর্মতত্ত্বে বঙ্কিম মনের সেই অনুশীলনেরই বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। ধর্মতত্ত্বের (নবজীবনে ধারাবাহিক প্রকাশ ১২৯১—৯২) আলোচনার সূত্রপাতেই প্রচার পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতে (১২৯১) 'হিন্দুধর্ম' প্রবন্ধ প্রকাশ করলে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন। সরলা দেবীর সাক্ষ্য অনুসারে দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বঙ্কিমের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন।[১] এ-তথ্য মূল্যবান্।

তা হলে সত্যকে নির্ণয় করা চলে একমাত্র শিক্ষার দ্বারাই। অতীন্দ্রিয় সত্যের কথা হচ্ছে না যদিও সেই সত্য তপস্যার দ্বারাই লভ্য। যে-সত্যকে নিয়ে দ্বন্দ্ব-সংশয় বিচারবিতর্ক উনবিংশ শতকে হয়েছে, তা হচ্ছে লোকব্যবহারে প্রযোজ্যতার সত্য। আমাদের আলোচ্যও তাই। বঙ্কিম বলেছিলেন সত্যের নৈতিক রূপ আছে এবং সেই রূপকে স্থির করতে হয় শিক্ষা দিয়ে। এই শিক্ষা যে কি, বঙ্কিম তা বুঝিয়েছেন ধর্ম-তত্ত্বে। 'ধর্মতত্ত্ব' বইটা মূলত শিক্ষাবিধির দিকে লক্ষ্য নিবদ্ধ রেখেই রচিত। অনুশীলন তত্ত্ব শিক্ষারই তত্ত্ব। বৃত্তির সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুশীলনের দ্বারাই আদর্শ মনুষ্যত্ব গড়া সম্ভব।

১ সরলা দেবীচৌধুরাণী 'জীবনের ঝরাপাতা' ১৮৭৯ শক পৃ ৩৫

বঙ্কিম স্বপ্ন দেখেছিলেন, শিক্ষার দ্বারা বিবেকবান্ কর্মনিষ্ঠ মানুষকে গড়ে তুলবার।

বঙ্কিম ইংরেজিশিক্ষিত পাঠকের কাছেই এই বাণী পরিবেশন করেছিলেন। ধর্ম-তত্ত্বের জটিল যুক্তি এবং প্রমাণ কি অগণ্য সাধারণ মানুষ অনুধাবন করতে পারত?[১] বলা বাহুল্য শুধু নিরক্ষর পাঠকের কথা নয়। মোটামুটি লেখাপড়াজানা মানুষের অন্তরকেই তো জাগানো দরকার। শশধর তর্কচূড়ামণি, কেশবচন্দ্র সেন, বিবেকানন্দ বা কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের মতো জনসমাজে বক্তৃতা দিয়ে তাঁর বক্তব্য শ্রোতার কাছে প্রাঞ্জল করবার চেষ্টাও তিনি করেন নি। যাঁদের বুদ্ধিবৃত্তি শাণিত নয়, গ্রহণক্ষমতা পরিণত নয়, তাঁরা বঙ্কিমের বক্তব্য কতখানি বুঝতে পারবে সন্দেহ। আবার মাত্র বিশেষজ্ঞদের প্রয়োজনের জন্যই ধর্মতত্ত্ব রচিত হয় নি। বঙ্গদর্শনের প্রথম প্রকাশের সময়েই তিনি শিক্ষাকে দূরবিস্তৃত করার অভিপ্রায় প্রকাশ করেছিলেন। ইংরেজি-শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে দেশের বিস্তীর্ণ অবশিষ্ট সমাজের যে প্রভেদ জন্মে গিয়েছিল বঙ্কিম তার জন্য শঙ্কিত হয়েছিলেন[২]—

'সমস্ত দেশের লোক ইংরেজি বুঝে না, কস্মিন্ কালে বুঝিবে এমত প্রত্যাশা করা যায় না। সুতরাং বাঙ্গালায় যে কথা উক্ত না হইবে তাহা তিন কোটি বাঙ্গালী কখন বুঝিবে না বা শুনিবে না। এখনও শুনে না, ভবিষ্যতে কোন কালেও শুনিবে না। যে কথা দেশের সকল লোকে বুঝে না বা শুনে না সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির সমাধান নাই।'

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সময় প্রতিষ্ঠাতাদের পরিকল্পনা ছিল শিক্ষাকে পরিস্রুত করে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। বঙ্কিম এই শিক্ষাকল্পনাকে পরিহাস করে বলেছেন—

'বিদ্যা জল বা দুগ্ধ নহে যে উপরে ঢালিলে নীচে শোষিবে। তবে কোন জাতির একাংশ কৃতবিদ্য হইলে তাহাদিগের সংসর্গগুণে অন্যাংশেরও শ্রীবৃদ্ধি হয় বটে। কিন্তু যদি ঐ দুই অংশের ভাষার এরূপ প্রভেদ থাকে যে বিদ্বানের ভাষা মূর্খে বুঝিতে পারে না, তবে সংসর্গের ফল ফলিবে কি প্রকারে?'

'সংসর্গগুণে অন্যাংশেরও শ্রীবৃদ্ধি হয়ে' বঙ্কিম এই বিশ্বাসটিকে দৃঢ়ভাবেই ধরেছিলেন নিশ্চয়, তা না হলে এই দুরূহ আলোচনার অবতারণা করতেন না, 'পপুলার' বা

১ 'এই অনুশীলন ধর্ম যাহা তোমাকে বুঝাইতেছি, তাহা যে সাধারণ হিন্দুর সহজে বোধগম্য হইবে তাহার বেশী ভরসা আমি এখন রাখি না কিন্তু এমন ভরসা রাখি যে মনস্বিগণ কর্তৃক ইহা গৃহীত হইলে ইহার দ্বারা জাতীয় চরিত্র গঠিত হইতে পারিবে।'—ধর্মতত্ত্ব ২১ অধ্যায়

২ 'বঙ্গদর্শনে'র পত্রসূচনা।

লোকপ্রিয় আলোচনাই করতেন। সেই সঙ্গে বাংলাভাষাতেই যে এই সব আলোচনা হওয়া প্রয়োজন, এ বিশ্বাসও তিনি শেষ জীবন পর্যন্ত অটুট রেখেছিলেন। রাজশাহীতে ১২৯৯ সালে রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষার হেরফের' পড়লে বঙ্কিমচন্দ্র স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে চিঠি লিখেছিলেন, এ কথা আগেই উল্লেখ করেছি। সেই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য ছিল দুটি : প্রথমত বাংলাভাষা শিক্ষা দ্বিতীয়ত শিক্ষণীয় বিষয়কে জীবনের অঙ্গীভূত করে কাজে পরিণত করা। 'সাধনা'য় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন—

'এ বিষয়ে আমি অনেকবার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট উত্থাপিত করিয়াছিলাম এবং একদিন সেনেট হলে দাঁড়াইয়া কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।'

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বক্তব্য সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের আলাদা আলোচনা বিশেষ চোখে পড়ে নি। বাংলা ভাষার সাহায্যে শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করে মনুষ্যত্ব অর্জনের কল্পনা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথও 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ', শিক্ষার বিকিরণ' প্রভৃতি বহু পরিচিত প্রবন্ধে তীক্ষ্ণ ভাষায় এর প্রয়োজনীয়তাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। বস্তুত শিক্ষা সম্বন্ধে এটা ছিল রবীন্দ্রনাথের একটি প্রধান বক্তব্য। রবীন্দ্রনাথ বলছেন[১]—

'তাহাদের গ্রন্থজগৎ একপ্রান্তে আর তাহাদের বসতিজগৎ অন্যপ্রান্তে, মাঝখানে কেবল ব্যাকরণ-অভিধানের সেতু। এইজন্য যখন দেখা যায় একই লোক একদিকে য়ুরোপীয় দর্শন বিজ্ঞান এবং ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, অন্যদিকে চিরকুসংস্কারগুলিকে সযত্নে লালন করিতেছেন, একদিকে স্বাধীনতার উজ্জ্বল আদর্শ মুখে প্রচার করিতেছেন, অন্যদিকে স্বাধীনতার শত সহস্র লূতাতন্তুপাশে আপনাকে এবং অন্যকে প্রতি মুহূর্তে আচ্ছন্ন ও দুর্বল করিয়া ফেলিতেছেন—একদিকে বিচিত্রভাবপূর্ণ সাহিত্য স্বতন্ত্রভাবে সম্ভোগ করিতেছেন, অন্যদিকে জীবনকে ভাবের উচ্চশিখরে অধিরূঢ় করিয়া রাখিতেছেন না, কেবল ধনোপার্জন এবং বৈষয়িক উন্নতি-সাধনেই ব্যস্ত—তখন আর আশ্চর্য বোধ হয় না।'

একেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'শিক্ষার হেরফের'। বঙ্কিম অবশ্য হিন্দুধর্মের সু এবং কু সংস্কারগুলি বাছাই করার ক্ষমতা অর্জনের কথা একাধিকবার বলেছেন। উদ্ধৃতাংশের বক্তব্যই ছিল শিক্ষা-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য। পরে শিক্ষা-সম্বন্ধীয় সব আলোচনাতেই তিনি সামাজিক জড়তা ও আচারপরায়ণতার বদলে মুক্তবুদ্ধি মানব-ঐক্যের শিক্ষাকেই যথার্থ শিক্ষা বলেছেন। 'কালান্তরে' 'সমস্যা' এবং 'সমাধান' নামে প্রবন্ধ দুটিতে এই কথাই প্রভূততম জোরের সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে—

১ শিক্ষা, ১৯৬০, 'শিক্ষার হেরফের' পৃ ১৬-১৭

'আমাদের লড়াই অবুদ্ধির সঙ্গে, আমাদের লড়াই অবাস্তবের সঙ্গে। সেই আমাদের চারিদিকে ভেদ এনেছে, সেই আমাদের কাঁধের উপর পরবশতাকে চড়িয়ে দিয়েছে।'

'অবুদ্ধির প্রভাবে স্ববুদ্ধির প্রতি আস্থা হারিয়ে আন্তরিক স্বাধীনতার উৎসমুখে আমরা দেশজোড়া পরবশতার পাথর চাপিয়ে বসেছি। এইটেই যখন আমাদের সমস্যা, তখন এর সমাধান শিক্ষা ছাড়া আর কিছুতেই হতে পারে না।'

বুদ্ধিবৃত্তির পূর্ণ বিকাশ যেমন বঙ্কিমের শিক্ষার লক্ষ্য ছিল, রবীন্দ্রনাথের চিন্তাতেও লক্ষ্য ছিল তাই। বঙ্কিমের কাছে বুদ্ধির চর্চা ছিল সমাজস্থিতি এবং লোককল্যাণের জন্য, রবীন্দ্রনাথের কাছে বুদ্ধির চর্চা ব্যক্তিত্ব-বিকাশের জন্য। দুজনেরই কাম্য ব্যক্তিত্ববিকাশ হলেও বঙ্কিম-কল্পিত ব্যক্তিত্ব সংযমিত (controlled) কারণ সমাজ ও জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপ্রাপ্ত। রবীন্দ্রনাথের মতে ব্যক্তিত্ববিকাশের কোনো সীমা নেই কারণ বুদ্ধির সীমাহীনতা কখনোই অবাঞ্ছনীয় নয়। দুজনের মধ্যে তুলনা করবার প্রধান অসুবিধা এই যে রবীন্দ্রনাথ যেমন এ-বিষয়ে তত্ত্বগত আলোচনা করেন নি, বঙ্কিমচন্দ্রও তেমনি প্রয়োগগত আলোচনা করেন নি।

বঙ্কিমচন্দ্র শিক্ষা বলতে বুঝেছিলেন সকল ইন্দ্রিয়-মনের সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুশীলন। রবীন্দ্রনাথও শিক্ষার সঙ্গে সংস্কৃতির যোগ বোঝাতে গিয়ে বলেছিলেন[১]—

'সকল কর্মে সকল ইন্দ্রিয়মনের তৎপরতা প্রথম হতেই অনুশীলিত হোক, এইটেই শিক্ষাসাধনার গুরুতর কর্তব্য বলে মনে করতে হবে।...এই আমন্ত্রণ ইকনমিক্সে ডিগ্রি নেওয়ায় নয়, চরিত্রকে বলিষ্ঠ কর্মিষ্ঠ করায়, সকল অবস্থার জন্যে নিজেকে নিপুণভাবে প্রস্তুত করায়, নিরলস আত্মশক্তির উপর নির্ভর করে কর্মানুষ্ঠানের দায়িত্ব সাধনা করায়।'

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিন্তায় বঙ্কিমের তত্ত্ব যথাযথ পুনরাবৃত্ত হয়েছে বলা না গেলেও উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার যে পরিকল্পনা উপস্থিত করেছিলেন, তার প্রকৃতির সঙ্গে বঙ্কিমের শিক্ষাপ্রকৃতির কিছু মিল আছে। রবীন্দ্রনাথের সম্মুখে তখন দেশ ও সমাজের একটা সম্পূর্ণায়ত বাস্তব চেহারা ছিল। স্বদেশী সমাজ, জাতীয় বিদ্যালয় ইত্যাদির আদর্শ সামনে থাকাতে শিক্ষাকে একটা ছাঁচে ঢেলে ব্যক্তিত্বের সংযত বিকাশ ঘটাবার দিকে তাঁর একটা ঝোঁক ছিল। এর জন্য কতকগুলি বিশিষ্ট পন্থাও তাঁর কল্পনায় ছিল, যেমন ব্রহ্মচর্য, গুরুগৃহবাস, প্রকৃতির সাহচর্য। স্কুল কলেজের শিক্ষাকে সেকালে তিনি বলেছিলেন কল—তাতে সমান মাপের মানুষ তৈরী হয় মাত্র। প্রকৃতির সাহচর্যের

১ শিক্ষা, ১৯৬০, 'শিক্ষা ও সংস্কৃতি' পৃ ২৮৭

কল্পনা তাঁর মনকে রঞ্জিত করেছিল। মনকে স্বাভাবিকভাবে বিকাশ পেতে দিতে হবে[১]—

'নিজে চিন্তা করিবে, নিজে সন্ধান করিবে, নিজে কাজ করিবে, এমনতরো মানুষ তৈরি করিবার প্রণালী এক ; আর, পরের হুকুম মানিয়া চলিবে, পরের মতের প্রতিবাদ করিবে না, ও পরের কাজের জোগানদার হইয়া থাকিবে মাত্র, এমন মানুষ তৈরির বিধান অন্যরূপ।'

এইজন্য শুধু বই পড়ার শিক্ষাকে তিনি মনে করেছেন ক্ষতিকর। জীবনের থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তারই উপর শিক্ষার সৌধ গড়ে তোলা দরকার। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা প্রকৃতিদত্ত শিক্ষার চিন্তা এমন করে বঙ্কিম করেন নি। এজন্য বঙ্কিমের শিক্ষাপদ্ধতি পুথিঘেঁষা, তাতে মননবৃত্তির উৎকর্ষ-সাধনের উপরেই চেষ্টা নিবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাপদ্ধতিতে জোর পড়েছে অনুভূতিকে (feeling) ধারালো করবার দিকে।

পরের যুগে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা-সম্বন্ধে মূল মতের খুব বেশি পরিবর্তন না করলেও পদ্ধতির পরিবর্তন করেছিলেন। ব্রহ্মচর্য ইত্যাদির উপর মোহ কমে এসেছিল ; তাঁর উদ্দেশ্য কেন্দ্রীভূত হয়েছিল চিন্তার স্বাধীনতার উন্মেষের দিকে। এককালে শিক্ষার মধ্যে স্বাদেশিক মনোভাবের যে প্রাধান্য তিনি দিয়েছিলেন পরে তাও হ্রাস পেয়েছিল। বিদ্যার যেমন গণ্ডি নেই, চিন্তার রাজ্যের ব্যাপকতারও তেমনি গণ্ডি নেই। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত মত অবশ্যউল্লেখ্য। 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—

'আমাদের দেশের বিদ্যানিকেতনকে পূর্বপশ্চিমের মিলননিকেতন করে তুলতে হবে, এই আমার অন্তরের কামনা। বিষয়লাভের ক্ষেত্রে মানুষের বিরোধ মেটে নি, সহজে মিটতেও চায় না, সত্যলাভের ক্ষেত্রে মিলনের বাধা নেই।'

এই মতটি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে প্রবলভাবে ধ্বনিত হয়েছিল এবং রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষা আধুনিকতর শিক্ষাপদ্ধতিতে পূর্ণ হয়েছে বটে, কিন্তু যে-সময় তিনি এ কথা বলেছিলেন তখন দেশে গান্ধীজির আন্দোলন এবং জাতীয়তাবাদের মুখর উন্মাদনা (১৯২১)। বিশ্ব থেকে সঙ্কুচিত করে বাঙালী বা ভারতবাসীকে স্বাজাত্য-বোধের অন্ধতায় বন্দী করবার উদ্যমের বিরুদ্ধেই রবীন্দ্রনাথের এই প্রতিবাদ। বিংশ শতাব্দীর বিশ্বমনস্কতার সঙ্গে শিক্ষার বিশ্বতোমুখিনতাও সম্পর্কিত। তবু আধুনিক বাংলার প্রবণতাকে যাঁরা গোড়া থেকেই লক্ষ্য করে এসেছেন তাঁরা অবশ্যই জানেন

১ শিক্ষা, ১৯৬০, 'শিক্ষাসংস্কার', পৃ ৪৩

বিশ্বের সঙ্গে সহযোগিতার কথা রামমোহন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র-বিবেকানন্দ পর্যন্ত কে না বলেছেন? বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের পরে 'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধে (প্রবাসী ১৩১৫ ভাদ্র) রবীন্দ্রনাথ আধুনিক কালে পৃথিবীর দুই প্রান্তের মধ্যে ভাবের মিলনের ইতিহাস দিয়েছেন। পূর্বের সঙ্গে পশ্চিমের মিলনের কাজে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন বলে রবীন্দ্রনাথ উদাহরণ দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন রামমোহন, রাণাডে, বিবেকানন্দ ও বঙ্কিমচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ পরে যে-সব প্রবন্ধে পূর্বে-পশ্চিমে সহযোগিতার উল্লেখ করেছিলেন তার মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় 'কালান্তর' এবং 'সভ্যতার সঙ্কট'। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানকে আমরা গ্রহণ করব না, এমন প্রস্তাব সর্বনাশকর। উনবিংশ শতাব্দীর এই মূল ভাবনা বিংশ শতাব্দী পুরোপুরি গ্রহণ করে তার বিকাশ ঘটিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই শতাব্দীর উত্তরসূরী।

পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানকে গ্রহণ ও স্বীকরণের মধ্য দিয়েই আধুনিকতার সর্বময় প্রসার শুরু হয়েছে। বঙ্কিম কি তার বিরোধিতা করেছিলেন? বঙ্কিমের নবমানবতার কল্পনা ও যুক্তিবাদিতা—এ সবের মূলে পাশ্চাত্য বিদ্যার পূর্ণ প্রভাব তো ছিলই, শিক্ষার নির্দিষ্ট বিষয়গুলিও তিনি পশ্চিমী সংস্কৃতি থেকেই গ্রহণ করেছিলেন। বহির্বিষয়ক ও অন্তর্বিষয়ক জ্ঞানের মধ্যে প্রথমটি সে-দেশের Physics, Chemistry, Astronomy। তাঁর কল্পিত মনুষ্যত্ব এ সব জ্ঞানকে আয়ত্ত না করে তৈরি হতে পারে না। ধর্মতত্ত্বে বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য যন্ত্রসভ্যতার এক দানবী মূর্তি এঁকেছিলেন এবং তার বিনশ্বাস যেন আমাদের সমাজকে স্পর্শ না করে সেই সতর্কতাও তিনি সেই সঙ্গে উচ্চারণ করেছিলেন। কেউ কেউ একে বঙ্কিমের পাশ্চাত্যবিমুখতা এবং অন্ধ জাতীয়তার দৃষ্টান্ত বলে মনে করেন। এ-রকম মত যে একেবারেই ভ্রান্ত তার প্রমাণ, রবীন্দ্রনাথও অন্ধ স্বাজাত্যবোধকে যে-বইতে সমালোচনা করেছেন সেই 'মুক্তধারা' নাটকেই যন্ত্র-সভ্যতাকে তিনি ধিক্কার দিয়েছেন। 'শিক্ষার মিলনে' রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'কলকে তো আমরা আত্মীয় বলে বরণ করতে পারি নে; তা হলে কলের বাইরে কিছু যদি না থাকে তবে আমাদের যে আত্মা আত্মীয়কে খোঁজে সে দাঁড়ায় কোথায়? এক রোখে বিজ্ঞানের চর্চা করতে করতে পশ্চিমদেশে এই আত্মাকে কেবলই সরিয়ে সরিয়ে ওর জন্যে আর জায়গা রাখলে না। একঝোঁকা আধ্যাত্মিক বুদ্ধিতে আমরা দারিদ্র্যে দুর্বলতায় কাত হয়ে পড়েছি, আর ওরাই কি একঝোঁকা আধিভৌতিক চালে এক পায়ে লাফিয়ে মনুষ্যত্বের সার্থকতার মধ্যে গিয়ে পৌচচ্ছে?'

বলাই বাহুল্য এই উক্তি রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের একটা দিক্ মাত্র। 'বৈজ্ঞানিক শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি, শিল্পযন্ত্র, কলকারখানাকে রবীন্দ্রনাথ একান্ত বর্জনীয় মনে করেন

নি। তবে যন্ত্রশিল্প যদি মানুষকে অর্থগৃধ্নু ও শক্তিমদমত্ত স্বার্থান্ধ করে তোলে, তবে যে মানবঐক্যের উপর রবীন্দ্রনাথ তাঁর সত্যধারণাকে স্থাপিত করেছিলেন সেই ঐক্যই বিধ্বস্ত হবে। এ সম্পর্কে হয়তো আরও অনেক আলোচনার অবকাশ আছে, কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে তার আর দরকার নেই। এটুকুই বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার যে বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মতোই মনুষ্যত্বের সার্থকতার চিন্তাই করেছিলেন। যন্ত্রসভ্যতার নীতিহীন বিকাশে তিনি রবীন্দ্রনাথের মতোই বিরোধী।

বঙ্কিমচন্দ্র যে-যুগে 'ধর্মতত্ত্ব' রচনায় নিরত, সেই যুগেই তাঁর মনে জাতীয়তাবাদের আদর্শ স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। ধর্মতত্ত্বে (রচনা ১৮৮৪) দেশপ্রেমের স্থান ঈশ্বরভক্তির নীচেই নির্দিষ্ট হয়েছিল। 'আনন্দমঠ' ১৮৮০র পর রচিত। জাতীয়তাবাদের ধারণা এবং ধর্মালোচনা একই সঙ্গে ঘটতে থাকায় এমন অনুমান করাই স্বাভাবিক যে মানবধর্ম থেকে দেশপ্রীতিকে তিনি বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি। ধর্মতত্ত্ব বইটা থেকেই অবশ্য এ বিষয়ে সুস্পষ্ট হওয়া যায়। তবু উল্লেখ করছি এই কারণে যে, বঙ্কিমচন্দ্র দেশপ্রেমের একটা বিশিষ্ট রূপ কল্পনা করলেন যাকে অধ্যাত্মসাধনার বহির্ভূত করা চলে না। দেশপ্রেমের সঙ্গে যুক্ত হল এক গভীর পুণ্যবোধ। যারা দীর্ঘকাল সামাজিক আচার-পালনকেই জীবনের চরম কর্তব্য বলে ভেবে এসেছে তাদের কাছে তিনি এক নতুন অনুষ্ঠেয় কর্মের বাণী শোনালেন। একদিকে ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতা, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা, আর-একদিকে দেশপ্রীতির ধর্ম—এই দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য করা কঠিন না হলেও 'আনন্দমঠ' বইখানি এ বিষয়ে খানিকটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে, এ কথাও সত্য। ইংরেজ-রাজত্বকে স্বীকার করার কথা বঙ্কিমসাহিত্যের অন্যান্য জায়গায় থাকলেও আনন্দমঠের উপসংহারে যেভাবে কথাটা এসেছে সেটা আকস্মিক বলেই মনে হয়। উপন্যাসশিল্পের কথা ছেড়ে দিলেও বঙ্কিমচন্দ্র দেশের মাতৃমূর্তির সাধনায় যে-আবেগ সৃষ্টি করলেন তা সত্যই অভূতপূর্ব।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমযুগের কতকগুলি আদর্শ যে গ্রহণ করেছিলেন তা আমরা দেখেছি। ব্যক্তির বিচারবোধ-উন্মেষের জন্য শিক্ষা, মানবিকতার ধর্ম, ইংরেজের সহযোগিতা—এ সবই রবীন্দ্রনাথ মেনে নিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের একটি বড়ো আদর্শ ছিল এই দেশপ্রেম। রবীন্দ্রনাথও এই দেশপ্রেমকে সমাজকে জাগাবার একটা উপায় বলে অঙ্গীকার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথ যখন চিন্তাক্ষেত্রে অবতীর্ণ, তখন দেশপ্রেমের সঙ্গে রাজনীতির মিশ্রণ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা দেশপ্রেমের শ্রেষ্ঠ উদ্‌গাতা বললেও রাজনীতির জনয়িতা

বলতে রাজি নই। আমাদের দেশে রাজনৈতিক বুদ্ধির উদ্ভব ও বিকাশ অন্যভাবে হয়েছে। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ও জমিদার-সভার মধ্য দিয়ে অবশেষে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারাই এদেশীয় রাজনীতির সূচনা হয়েছে। দেশপ্রেম এবং রাজনীতি আলাদা বস্তু, যদিও দেশপ্রেম রাজনীতিকে আশ্রয় করেই শাসনতান্ত্রিক অধিকারকে হস্তগত করবার চেষ্টা করে। বঙ্কিমের দেশপ্রেমে অন্ধতা একেবারেই ছিল না। যিনি ইংরেজের সহযোগিতা কামনা করেছেন এবং বারবার সতর্ক করে দিয়েছেন[১]—'ইউরোপীয় Patriotism একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ। ইউরোপীয় Patriotism ধর্মের তাৎপর্য এই যে পর সমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব।'—তাঁর দেশপ্রেম যে অন্ধ ছিল না এ কথার বিস্তৃত ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। দেশপ্রীতি এবং সার্বলৌকিক প্রীতির মিলনের কথা তিনি বারবারই বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ 'মুক্তধারা' নাটকে এবং নানা রচনায় পশ্চিমী জাতীয়তাবাদের কঠোর সমালোচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে আবেগ সৃষ্টি করেছিলেন, সেই আবেগ বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন এবং সেকালের সন্ত্রাসবাদ নামে অভিহিত রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে পরে একটা পথ খুঁজে নিয়েছিল। তাতে ছিল মারাঠা নেতা বালগঙ্গাধর টিলকের গভীর প্রেরণা। বঙ্কিম দিয়েছিলেন দেশপ্রেমের আবেগ। সেটা যে রাজনৈতিক আন্দোলনকে বেগবান্ করল, ঠিক এই পথটিতে বঙ্কিমের সম্মতি থাকত কিনা সন্দেহ, অন্তত আনন্দমঠের উপসংহার থেকে এই সন্দেহ জাগে। মহাপুরুষ সত্যানন্দকে বলেছিলেন, পাপের কখনও পবিত্র ফল হয় না। লুণ্ঠনার্জিত অর্থ দ্বারা মাতৃমূর্তির প্রতিষ্ঠায় সহায়তা হবে না। গ্রন্থের সূচনাতেও দেখি, ভক্তিই শরণ্য, জীবন তুচ্ছ। এর অর্থ, লোভের বশবর্তী হয়ে মানুষ আত্মনাশও ঘটাতে পারে। কিন্তু যথার্থ ভক্তি মহত্তর কর্মে প্রেরণা দেয়। সত্যকার দেশপ্রেম ভক্তিরই লক্ষণাক্রান্ত. তাতে মানবনীতিবিরুদ্ধতা নেই।[২] রবীন্দ্রনাথও দেশপ্রেমে এই নৈতিক বুদ্ধিকে জাগ্রত রাখতে বিভিন্ন উপলক্ষে বারবার সতর্ক করে দিয়েছেন, এ কথা রবীন্দ্রচিন্তাধারার সঙ্গে যাঁর সামান্যও পরিচয় আছে তিনিই জানেন। দেশপ্রেমকে কলুষমুক্ত রাখার উদ্‌বেগ বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ কারোই কম ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ দেশপ্রেমকে রাজনৈতিক গর্ত থেকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করেছেন। সেই বঙ্কিম-সৃষ্ট দেশানুরাগ তিনি জাতিকে সংহত করবার কাজেই লাগাবার আয়োজন করেছিলেন। এই স্বপ্ন বঙ্কিমের। বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনায় বঙ্কিম লিখেছিলেন—

১ ধর্মতত্ত্ব ২৪ অধ্যায়

২ বর্তমান গ্রন্থের ১৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

'বাঙালী মহারাষ্ট্রী তৈলঙ্গী পাঞ্জাবী ইহাদিগের সাধারণ মিলনভূমি ইংরাজী ভাষা। এই রজ্জুতে ভারতীয় ঐক্যের গ্রন্থি বাঁধিতে হইবে।'

১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে এই প্রবন্ধটির পুনর্মুদ্রণের সময় পাদটীকায় বঙ্কিমের মন্তব্য ছিল, 'এখানে যাহা কথিত হইয়াছে, কংগ্রেস এখন তাহা সিদ্ধ করিতেছেন।' কংগ্রেসে তখন ইংরেজি ভাষাতেই আলাপ-আলোচনা চলত। বিদেশী ভাষার দ্বারা কার্য-পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথ পরে প্রবল আপত্তি করেছিলেন এবং তাঁর যুক্তিও প্রবল ছিল। কিন্তু বঙ্কিমের দেশানুরাগ যে একটা সংহতির কল্পনা করেছে, সেটাই লক্ষণীয়। তিনি কংগ্রেসের এই উদ্যম দেখে গেলেন মাত্র। তার পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় দেখা দিল জাতিগত সংহতিসৃষ্টির স্পষ্টতর প্রয়াস।

বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রেমে কেন যে নিবিড় অতীত-ধ্যান বল দিয়েছিল, তার কারণ জানা কঠিন নয়। ইংরেজ রাজত্বের প্রথম যুগে যে-সব ভারতবাসী রাজত্ব-স্থাপনে সহায়তা করেছিল এবং পরের যুগে যারা ইংরেজি জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বারস্থ হয়েছিল, তাদের সকলের মধ্যেই একটা মূল জিনিসের অভাব ছিল, তার নাম আত্মমর্যাদা-বোধ। একদিকে উন্নততর সাহিত্য ও জ্ঞানসাধনা আর-এক দিকে উন্নততর নৈতিক বুদ্ধি—এ দুয়ের সম্মুখীন হয়ে স্বভাবতই নিজেদের সম্পর্কে গর্ব করবার বা মর্যাদা বোধ করবার মতো বস্তু সমসাময়িক বা নিকট অতীতে কিছুই পাওয়া যায় নি। সে জন্যই একা বঙ্কিম নন, সেকালের সবাই প্রাচীন সাহিত্য ও সংস্কৃতির দিকেই বিশেষ করে চোখ ফিরিয়েছিলেন। জাতিকে আত্মসচেতন করতে হলে এ ছাড়া আর কী-ই বা করবার ছিল? রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ প্রাচীন বৈদিক ধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে বিশুদ্ধ ধর্মের প্রত্যয় সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। এ সবের মূলেও প্রচ্ছন্ন ছিল দেশানুরাগ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন এগিয়ে এলেন, তখন অবস্থার কিছু কিছু পরিবর্তন হতে আরম্ভ করেছে। ইংরেজ রাজত্ব সম্বন্ধে যতখানি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম নিয়ে আমাদের আধুনিক সমাজের যাত্রা শুরু হয়েছিল, এই শতাব্দীর শেষের দিক থেকেই তাতে ভাঁটা পড়তে শুরু হল। একটা কারণ তো খুবই আধিভৌতিক। যতটা আশা করা গিয়েছিল, শাসনকার্যে ইংরেজ বাঙালীকে ততখানি বিশ্বাস করে নি। বঙ্কিমচন্দ্রের সভাপতিত্বে পঠিত রবীন্দ্রনাথের 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধটি স্মরণীয়। ১৮৮৩-৮৪ খ্রীস্টাব্দের ইলবার্ট বিলও মোহভঙ্গ করতে সহায়তা করেছিল। তার সঙ্গে আরও কারণ অবশ্যই ছিল।[১]

ইংরেজ-চরিত্রের পরিচয় যে ভাবে উদ্‌ঘাটিত হতে লাগল, তাতে আর অতটা হীনতাবোধের প্রয়োজন হল না। দেশপ্রেম থাকল, অতীত-গর্বও হয়তো থাকল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আর-একটা দিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করলেন। ইংরেজের কাছে চাকরীর প্রত্যাশায় বা ভালো ইংরেজি বলার বাহবার লোভে আমাদের কর্ম-প্রচেষ্টাকে শিক্ষাদীক্ষাহীন লোকসমাজের বাইরে গণ্ডিবদ্ধ করে রাখলে চলবে না। অনেকদিন পরে নিজের রাজনৈতিক মতের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন[১]—

'সাধনা পত্রিকায় রাষ্ট্রীয় বিষয়ে আমি প্রথম আলোচনা শুরু করি। তখনকার পলিটিক্সের সমস্ত আবেদনটাই ছিল উপরওয়ালার কাছে, দেশের কাছে একেবারেই না। সেই কারণেই প্রাদেশিক রাষ্ট্রসম্মিলনীতে গ্রাম্যজনমণ্ডলী-সভাতে ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা করাকে কেউ অসংগত বলে মনে করতেই পারতেন না।'

কারণ এ পর্যন্ত ইংরেজি-জানা শ্রোতাই ছিল সকলের বক্তৃতা ও ভাষণের লক্ষ্য। দেশপ্রেমের বর্ষণ চলত শুধু শিক্ষিত সমাজের ক্ষুদ্র সরোবরটিতে। আর সমস্ত দেশ থাকত রসহীন নিরুদ্যম, শতাব্দীর সংকীর্ণ বুদ্ধিতে মোহগ্রস্ত। কংগ্রেস যদিও বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যোগরচনার ভার নিয়েছিল, তবু সেও ইংরেজি-শিক্ষিত সমাজ। দেশের অন্তঃস্থলে ঐক্যের যোগকে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা করলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের এসব উদ্যম দেশানুরাগমূলক বটে, কিন্তু রাজনৈতিক নয়। আমাদের পল্লীকেন্দ্রিক সমাজের মধ্যে যে অনৈক্য, আচারের যে শতধা বিচ্ছিন্নতা ও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা সমস্ত দেশকে একচিত্ত করে তোলবার পক্ষে বাধা সৃষ্টি করে আছে, রবীন্দ্রনাথ বারবার তাকে দূর করবার কথা বলতে লাগলেন। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের উন্মাদনার যুগেও তিনি একথা বলতে বিরত হন নি। ইংরেজকে দোষারোপ করবার আগে নিজেদের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধকে জাগাবার এবং সামাজিক বিভেদ দূর করে ঐক্যসৃষ্টির কথা রবীন্দ্রনাথ সারাজীবনই বারবার বলে গেলেন। সেকালে জোর পড়েছিল বাঙালী সমাজের ভূমিকার উপর, পরের যুগে জোর পড়েছিল ভারতীয় এবং বিশ্বসমাজের ভূমিকায়। গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর যেটুকু মতভেদ ঘটেছিল, তা ঠিক এই নিয়েই। নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেই রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমযুগ এবং তাঁর যুগের তুলনা করতে গিয়ে ভাবের বিচিত্রগামিতার উল্লেখ করেছিলেন। বাঙ্গালী চিত্ত যে এখন নিছক তত্ত্ব এবং চিন্তাচর্চা ছেড়ে সাধারণ লোকজীবনে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে সেই ইঙ্গিত আছে নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনায়—

'এখন বঙ্গসাহিত্য অতি দূরবিস্তৃত। এখনকার সম্পাদকের একমাত্র চেষ্টা হইবে

১ কালান্তর, 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত'

বর্ত্তমান বঙ্গচিত্তের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে উপযুক্তভাবে এই পত্রে প্রতিফলিত করা। কাজটা কঠিন। কারণ ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ হওয়াতে চিরস্থায়ী সত্যের সহিত বিচিত্র মৃগতৃষ্ণিকার প্রভেদ নির্ণয় করা দুরূহ হইয়াছে। এখন শিক্ষিত ব্যক্তিগণও স্বভাবতই নানাশক্তির দ্বারা নানাপথে আকৃষ্ট হইতেছেন।'

ইংরেজ-চরিত্রের সম্বন্ধে মোহ কেটে গেলে রবীন্দ্রনাথ আহ্বান করলেন, নিজেদের মনুষ্যত্ব গড়ে তুলবার জন্য। কিন্তু মনে রাখা দরকার এই মোহভঙ্গের ফলে ইংরেজ-চরিত্রেই যে অবিশ্বাস এসেছিল তা নয়। ইংরেজ জাতির চরিত্র-শক্তি বরাবরই শ্রদ্ধার যোগ্য ছিল। অশ্রদ্ধেয় হল স্থানীয় শাসকশ্রেণী। এইভাবে রবীন্দ্রনাথ 'ছোটো ইংরেজ' আর 'বড়ো ইংরেজ'—এই পার্থক্য টানলেন। এক সময়ে সব ইংরেজই আমাদের চোখে ছিল বড়ো ইংরেজ। বঙ্কিমের সময় থেকেই সন্দেহের যে সূচনা হয়, 'রাজা প্রজা'র প্রবন্ধগুলিতে রবীন্দ্রনাথ তাকে স্পষ্ট করে তুললেন। সমগ্রভাবে মূল ইংরেজ-চরিত্রে আস্থা রেখে ভারতবর্ষাগত ইংরেজদের সঙ্গে শুরু হল দাবীদাওয়া আর প্রতিবাদের যুদ্ধ। এরা নিজের থেকে আমাদের অভাবের শূন্য পাত্র পূর্ণ করে দেবে, এ বিশ্বাস যখন শিথিল হল, তখনই প্রশ্ন এল ঘর ইংরেজদের হাতে ছেড়ে না দিয়ে নিজেদের সামলানোর। হিন্দুমুসলমানের বিরোধমূলক কোনো ঘটনার পর, বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের পর, দেশীয় ব্যক্তির উপর ইংরেজ রাজকর্মচারীর অত্যাচারের কোনো উত্তেজনার সময় রবীন্দ্রনাথের সেই একই পরামর্শ ছিল। নিজেদের সামাজিক বিচ্ছিন্নতার অবসান করে এক হয়ে দাঁড়াতে হবেই। রবীন্দ্রনাথের আহ্বান গেল নিম্নতম লোকসমাজের কাছে, বিভেদ যেখানে রাজনৈতিক মতবাদের নয়, চিরাগত সামাজিক আচার এবং অভ্যাসের। লোকসমাজের কাছে শিক্ষিত সমাজের বাণী পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা এবং উপায় বঙ্কিমচন্দ্রও চিন্তা করেছিলেন। স্বদেশী সমাজের যুগে যাত্রাকথকতা প্রবর্তনের প্রস্তাব করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোকশিক্ষা'-প্রবন্ধে তার কল্পনা প্রথম দেখা হয়েছিল।[1]

সমাজচিন্তার দিক দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের পার্থক্যটি স্পষ্ট করেই বলা যাক। সমস্ত উনবিংশ শতাব্দীতে জাগরণের ক্ষেত্রটি ছিল কলকাতার শিক্ষিত-সমাজ। ইংরেজ সান্নিধ্যের ফল আত্মস্থ করে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন আত্মমর্যাদাবান্ মানুষ হয়ে গড়ে ওঠবার কল্পনা বঙ্কিম করেছিলেন। বঙ্কিমের আলোচনা তত্ত্বাশ্রয়ী। মর্যাদাবোধ সৃষ্টি করবার জন্য অতীতের কীর্তি ও কর্মশক্তির দিকেই তিনি তাকিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সময় অবস্থার কিছু পরিবর্তন হয়েছে। তিনি পল্লীসমাজ এবং সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাঙালী

১ বঙ্গদর্শন ১২৮৫ অগ্রহায়ণ। দ্রষ্টব্য 'বিবিধ প্রবন্ধ' ২য় ভাগ

জীবনের দিকেই দৃষ্টি ফেরালেন। তত্ত্ব বা শাস্ত্রাশ্রয়ী আলোচনা না করে সহজ মানবতা-বোধের নামে সামাজিক অনৈক্য এবং অযৌক্তিক সংস্কার দূর করবার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিলেন। লোকজীবন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক উৎসাহের দৃষ্টান্ত হিসাবে অবশ্যই লোকসাহিত্য-সংগ্রহের উল্লেখ কর্তব্য। বঙ্কিম সামাজিক সংস্কারের আলাদা আলাদা প্রয়াসকে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেন নি। রবীন্দ্রনাথ এই সংস্কার-কর্মকে আলাদাভাবেই অবশ্যকর্তব্য করে তুলেছেন। 'সমাজ' নামে বইতে সংগৃহীত প্রবন্ধ থেকেই এটা স্পষ্ট হয়। এই ব্যাপারে তিনি পূর্ববর্তী সংস্কারক রামমোহন বিদ্যাসাগর এবং কেশবচন্দ্রের অনুবর্তী, যদিও পূর্বগামীদের সঙ্গে লোকজীবন এবং লোকসংস্কৃতিরএতখানি ঘনিষ্ঠতা ছিল না। বঙ্কিম একটা সামগ্রিক জীবনদর্শনকে অনুভব করাতে চেয়েছেন; রবীন্দ্রনাথ কোনো পূর্ণাঙ্গ সর্বব্যাপী পরিশোধিত জীবনতত্ত্বের থিয়োরেটিক্যাল আলোচনা করার চেয়ে সোজাসুজি সংস্কার-কাযে হাত দেবার উৎসাহ দিয়েছেন। এর পিছনে নৈতিক বুদ্ধি থাকলেও দৃষ্টিভঙ্গি বস্তুনিষ্ঠ। রবীন্দ্রনাথ বেশি আস্থা রেখেছেন common sense বা সহজ বুদ্ধির উপর। বুদ্ধি বা যুক্তির তীক্ষ্ণতা দিয়ে অনেক সহজকে জটিল করে তোলা যায়। বিদ্যাসাগরের কর্মপ্রেরণা কোথায় ছিল সে কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি অর্থপূর্ণ উক্তি করেছিলেন,—

'বাঙালীর বুদ্ধি সহজেই অত্যন্ত সূক্ষ্ম। তাহার দ্বারা চুল চেরা যায় কিন্তু বড়ো বড়ো গ্রন্থি ছেদন করা যায় না। তাহা সুনিপুণ কিন্তু সবল নহে।'

বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্রের সম্বন্ধে বিচারবুদ্ধির স্বাধীনতা এবং তীক্ষ্ণ যুক্তির প্রভূত প্রশংসা করেও রবীন্দ্রনাথ কৃষ্ণচরিত্রকে বলেছিলেন অবাস্তব 'মূর্তিমান থিয়োরি'। এই সূত্র অবলম্বন করেই দুজনের চিন্তাপদ্ধতির পার্থক্য নির্ণয় করা সহজ। চিন্তাকে রবীন্দ্র-নাথ শাস্ত্র পুথি পাণ্ডিত্যের হাতধরা না করে রুক্ষ অভিজ্ঞতার পথে চলতে শেখালেন। জীবনযাপনের আদর্শ আর মনুর বিধানে পাওয়া যাবে না, কর্তব্য নির্ধারণের জন্য স্মৃতিশাস্ত্রের দ্বারস্থ হওয়া অনাবশ্যক। মানবসম্পর্কের সহজ সত্যকে পেতে যুক্তি যতোই অমোঘ হোক, সে কেবল নির্বস্তুকতার ধূম্রজালই সৃষ্টি করে। সত্যকে পাওয়ার উপায় জীবনের বাস্তবকে সহজ অভিজ্ঞতার আলো দিয়ে দেখা। 'ডাকঘর'-এর অমল পণ্ডিত হতে চায় নি, সে চেয়েছে রসিক হতে—জীবনের স্পর্শকে ইন্দ্রিয় দিয়ে লুটে নিতে। 'বলাকা'য় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'বঞ্চনা বাড়িয়া উঠে ফুরায় সত্যের যত পুঁজি।' সত্যকে নতুন করে সৃষ্টি করতে হয় জীবন দিয়ে। বঙ্কিম-রবীন্দ্র বিতর্কের যুগে রবীন্দ্র-নাথ সত্যের যে-ধারণা করেছিলেন, তিনি পরে তাকে পরিবর্তিত করে নিয়েছেন। বঙ্কিমের মতে সত্য পরিবর্তন শীল, পরে দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথও তাই মনে করেছেন।

বঙ্কিম যুক্তি সংগ্রহ করেছেন গ্রন্থজগৎ থেকে যদিও যেটা প্রমাণ করতে যাচ্ছেন সেটা তাঁর জীবনের উপলব্ধি। মনীষার বিচারে দেখতে গেলে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধিকে পূর্বনির্ধারিত বিধানের বশ্যতা থেকে মুক্তি দিয়ে অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছেন। শুধু স্মৃতির বা সাম্প্রদায়িক ধর্মের বিধান নয়, স্বাজাত্যবোধ এবং কর্মের অন্ধ আচার থেকেও বুদ্ধির বিকাশে বাধা দেয় এমন কোনো আচরণকেই তিনি স্বীকার করতে সম্মত হলেন না—তার তত্ত্ব যা-ই থাকুক না কেন। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য চরকাখদ্দরের দ্বারা অর্থনৈতিক বয়কটের তত্ত্বকেও তিনি মানতে পারলেন না। অত্যন্ত ঋজু কণ্ঠে বলেছেন[১]—

'সংকীর্ণ অভ্যাসের কাজে বাহ্য নৈপুণ্যই বাড়ে, আর বদ্ধ মন ঘানির অন্ধ বলদের মতো অভ্যাসের চক্র প্রদক্ষিণ করতে থাকে। এইজন্যেই যে সব কাজ মুখ্যত কোনো একটা শারীরিক প্রক্রিয়ার পুনঃপুনঃ আবৃত্তি সকল দেশেই মানুষ তাকে অবজ্ঞা করেছে। কার্লাইল খুব চড়া গলায় dignity of labour প্রচার করেছেন ; কিন্তু বিশ্বের মানুষ যুগে যুগে তার চেয়ে অনেক বেশি চড়া গলায় indignity of labour সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়ে আসছে।'

বুদ্ধির সামান্যতম ব্যাঘাতের ত্রাসে শেষের দিকে তাঁর এক আশ্চর্য স্পর্শকাতরতা এসেছিল। কর্মবাদী প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ শেষের দিকে হয়ে দাঁড়ালেন বুদ্ধিবাদী ইনটেলেকচুয়াল। নির্বাধ বুদ্ধির অগ্রসরণের শেষ পরিণাম যে কি হতে পারে, সে সম্পর্কে তাঁর শঙ্কা ছিল না।

মনীষী বঙ্কিম এবং মনীষী রবীন্দ্রনাথের তুলনায় যে কথাগুলি উপরে বলেছি তার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত পাঠকরা পাবেন বঙ্কিমের 'সাম্যে'র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি' পড়লে কিংবা বঙ্কিমের 'বঙ্গদেশের কৃষক'-এর সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর 'রায়তের কথা'র রবীন্দ্রনাথ-কৃত ভূমিকা পড়লে। কৃষকদের দুর্দশা নিবারণের শেষ ভরসা বঙ্কিম মানুষের শুভবুদ্ধির উপরেই রেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও মহাজন জমিদার বা বর্তমান কোনো শ্রেণীতে নিঃসংশয়িত হতে না পেরে সেই শুভবুদ্ধির উপরেই নির্ভর করেছিলেন। কিন্তু দুজনের আলোচনা-পদ্ধতি একেবারে পৃথক। একজন অর্থনৈতিক এবং ঐতিহাসিক তত্ত্বের সঙ্গে নানা সরকারী রিপোর্ট ইত্যাদি মিলিয়ে যে সিদ্ধান্তে এসেছেন, অন্যজন প্রত্যক্ষদৃষ্ট জীবনের থেকে সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য 'বঙ্গ-দেশের কৃষক'-এ বঙ্কিম নিছক তাত্ত্বিক আলোচনার রাজ্য ছেড়ে জীবন্ত সমস্যার চিন্তায়

১ কালান্তর 'চরকা'

ব্যাপৃত, আবার স্বদেশী যুগের প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ পারিপার্শ্বিক সমাজকে মুখ্যত উপজীব্য করলেও ইতিহাস সমাজতত্ত্ব এবং রাজনীতির প্রসঙ্গ এসেছেন বক্তব্যকে জোরালো করতে।

তবু, বঙ্কিমের প্রবন্ধ পরিমিত, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ বিস্তারিত। এই বিস্তারে বক্তব্য বা যুক্তিরও-যে বিস্তার আছে, তা নয়। মূল কথাটি খুবই সরল এবং যেহেতু সেটা একটা উপলব্ধির সত্যের মতো, সেজন্যে তাতে যুক্তির যে কিছু অনিবার্যতা আছে, তা নয়। এ হচ্ছে সহজ বুদ্ধির সত্য। কিন্তু এই কেন্দ্রীয় মূল বক্তব্যটিকে পাঠকের কাছে সোজাসুজি আনবার আগে রবীন্দ্রনাথ যে কথার বিস্তীর্ণ আয়োজন করেন তা যুক্তির নয়, পাঠকমনের আনুকূল্য লাভের উপযুক্ত পরিবেশ-রচনার। পরিবেশ রচনা করতে কখনও উপমা কখনও কৌতূহলজনকে কোনো ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা এমন কি কখনও 'প্যারাব্‌ল' জাতীয় কথিকা প্রভৃতিও ব্যবহার করেছেন। আবার কখনও সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটনাকে বিস্তারিত করতে করতে অসম্ভবতাকে বুঝিয়ে বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। বাহুল্য শিল্পেরই শোভা, বিজ্ঞানের বাহুল্য নেই। বঙ্কিমের প্রবন্ধ যে পরিমিত বাহুল্যবর্জিত তথ্যনিষ্ঠ গবেষণাধর্মী (scholarly) সে তাঁরই বৈজ্ঞানিকধর্মী যুক্তি-বাদিতার জন্য। বঙ্কিমের প্রবন্ধ পরিবেশ সৃষ্টি করে না, তর্কশক্তিকে শাণিত করে। এইজন্য তাঁর প্রবন্ধের কোনো অংশ চোখ এড়িয়ে গেলে যুক্তির শৃঙ্খলটি দুর্বল হয়ে পড়ে। মনীষার দুই ভিন্ন প্রকৃতি সৃষ্টি করেছে প্রবন্ধের দুই ভিন্ন রূপ।

পরিশিষ্ট

বঙ্কিম-মনীষার অনুবর্তন

বিপিনচন্দ্র পাল

গত শতাব্দীতে বাঙালী মনীষার মধ্যযুগীয় ধারা অবলুপ্ত হয়ে যে নতুন ধরনের চিন্তা-রীতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে, বিপিনচন্দ্র পালের মনীষাকে তারই একটি পূর্ণ পরিণত ফল বলে গণ্য করা যায়। বিংশ শতাব্দীতে চিন্তার প্রকৃতি কিছু পরিবর্তিত হয়েছে এবং এই পরিবর্তনের একটা সময় নির্দেশও করা যায়। মোটামুটিভাবে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকেই বাঙালীর চিন্তাধারার দিক্ পরিবর্তনের সূচনা পাই। একদিকে রবীন্দ্রনাথ ও আর একদিকে প্রমথ চৌধুরী—এই দুজনের মধ্যেই এই নূতনত্বের লক্ষণ পাওয়া গেল। এই পটভূমিতেই বিপিনচন্দ্র পালের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরীর চিন্তাগত সংঘাতকে অনুধাবন করার প্রয়োজন।

বিপিনচন্দ্র পাল বঙ্কিমী যুগের মূল্যমানকে স্বীকার করেছেন। রামমোহন থেকে আরম্ভ করে বিপিনচন্দ্র পর্যন্ত বাঙালীর মননপ্রকৃতির একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য সহজেই লক্ষ্যগোচর হয়—যা কিছু ভাবা হয়েছে আমাদের সমাজ জীবন ও ব্যক্তিগত অস্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত করেই ভাবা হয়েছে। ইতিহাসকে দেখা হয়েছে জাতিগত প্রবণতার সঙ্গে মিলিয়ে, ধর্মদর্শনকে দেখা হয়েছে নৈতিক আচরণের সঙ্গে যুক্ত করে, সাহিত্যকে বিবেচনা করা হয়েছে সামাজিক ও জাতীয় প্রকৃতির আত্মপ্রকাশের ভাষারূপে। মধ্যযুগে চিন্তা যেমন ছিল বিশুদ্ধ চিন্তারই জন্য কিংবা বিংশ শতাব্দীতে চিন্তা যেমন মানবকল্যাণেই নির্বিশেষ লক্ষ্যেরই জন্য, উনবিংশ শতাব্দীতে চিন্তা তার কোনোটাতেই একান্ত লক্ষ্যবদ্ধ হয় নি। চিন্তার সার্থকতা জীবনেই, আবার এই জীবনেরও একটা স্পষ্ট রূপ আছে তার জাতিগত ও সমাজগত অভিব্যক্তিতে। বঙ্কিমচন্দ্রকে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রধানতম বুদ্ধিবাদী ধরে অন্যান্য নেতৃস্থানীয়দের কথা সহজেই মনে করতে পারি। বিপিনচন্দ্র পালের সময় ঠিকভাবে ধরতে গেলে অবশ্য বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই ধরতে হয়। এই সময়ে পূর্বাগত চিন্তাধারার কিছু বৈচিত্র্য ঘটেছে। সেটা এই যে ইংরেজ রাজত্ব-সম্বন্ধে প্রত্যাশা হ্রাস পাওয়ার ফলে বুদ্ধিবাদীরা অধিকতর আত্মমুখী হয়েছেন। রাজনৈতিক চেতনার প্রাধান্য ঘটল। জাতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে গৌরববোধ আরও প্রখর হল।

বিপিনচন্দ্র বাংলাদেশের জাতীয় জাগরণের যে অপূর্ব ধারাবাহিক ব্যাখ্যা করে-ছিলেন সেগুলি 'নবযুগের বাংলা' নামে গ্রন্থে সংকলিত হয়েছিল। এই ব্যাখ্যা শুধু যে

আমাদের একটা যুগের ইতিহাসকে পরিচ্ছন্নরূপে উপস্থাপিত করেছে তা নয় এই ব্যাখ্যায় বিপিনচন্দ্রের বৈজ্ঞানিকসুলভ বিশ্লেষণপরায়ণ ব্যক্তি-মনটিরও পরিচয় পুরোপুরি পাই। বিপিনচন্দ্রের ধর্মমত যে কিছু বিচিত্র প্রকৃতির ছিল, সে-কথা অনেকেরই জানা। তিনি চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতির বিশিষ্ট আদর্শের গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন, তবু বাংলা দেশের চিত্ত-প্রবণতার ব্যাখ্যায় তাঁর ব্যক্তিগত মনোভাব কিছুমাত্র জড়িত হয় নি দেখে বিস্মিত হতে হয়। 'চরিতচিত্র' বইখানি নবযুগের বাংলার পরবর্তী ঐতিহাসিক অনুক্রম। এই বইতে তিনি এমন কয়েকজনের আলোচনা করেছেন যাঁরা বিপিনচন্দ্রের সমসাময়িক। ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে এসে তিনি রামমোহনের আদর্শ ও মত শ্রদ্ধা-সহকারে বুঝেছিলেন; বঙ্কিমচন্দ্রকে তিনি চোখে দেখেছিলেন; সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অশ্বিনীকুমার দত্ত, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ—এঁরা সকলেই বিপিনচন্দ্রের যুগের লোক, অনেকেই তাঁর সহযোগী। জাতীয় জীবনে এঁদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে, ভবিষ্যতে তাঁদের কাজের ও মতের মূল্য বিচার হয়তো হবে। বিপিনচন্দ্র তাঁদের ব্যক্তিত্বের যে বিশ্লেষণ করে গিয়েছেন তা আশ্চর্যভাবে সংস্কারমুক্ত। আধুনিক বাংলার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, সমষ্টিবাদ নীতিচেতনা ধর্মবোধ, জাতীয়তার উন্মেষ ও পরিণতি সমাজের সংস্কার-প্রয়াস ও সংস্কারবিরোধিতা আধুনিক শিক্ষিত সমাজের লক্ষণ ও চরিত্রবিচার, নানা ভাবদ্বন্দ্ব সমকালীন হয়েও যেভাবে বিপিনচন্দ্রের মনীষায় ব্যাখ্যাত হয়েছে আমাদের সমগ্র আধুনিক মননের ইতিহাসে তার তুলনা দুর্লভ। বিশেষ করে এই জন্যে বিস্ময়বোধ করতে হয় যে, এই জ্ঞান তাঁকে দূর থেকে ইতিহাস ঘেঁটে লাভ করতে হয় নি। চোখের সামনে এঁদের দেখে নিজে তাঁদের দলভুক্ত হয়েও তিনি সমসাময়িক কালের ঐতিহাসিক তাৎপর্য উদ্ধার করতে পেরেছিলেন। আধুনিক বাংলার অন্তঃপ্রকৃতি বুঝতে হলে বিপিনচন্দ্র পালের এই বইয়ের সাহায্য নিতেই হবে।

পারিভাষিক বর্ণনায় বিপিনচন্দ্রকে 'সমাজদার্শনিক' বলে অভিহিত করা চলতে পারে। তিনি তাঁর সমকালের তত্ত্বটি যেমন ব্যাখ্যা করেছেন তেমনি এই কালের চিন্তা-ভাণ্ডারে তাঁর নিজেরও কিছু দান ছিল। তাঁর দানের মূল্য বিচার করবেন তৎপরবর্তী ঐতিহাসিক। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের যুগে আমাদের চিন্তা যে বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছিল রবীন্দ্রনাথের সেকালের রচনা ও বিপিনচন্দ্রের রচনা ও বক্তৃতার সঙ্গে তুলনা করে সেই সাধারণ লক্ষণটি সহজেই বোঝা যায়। নেশন কাকে বলে—এই নিয়ে বহু আলোচনা পত্রিকায় চোখ পড়ে। উদ্ভিন্ন জাতীয়তাবাদের যুগে আমাদের জাতীয় রূপকে কল্পনা করতে গিয়ে অনেক বিদেশী মনীষীদের তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। এর

মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে কথাটি বলেছিলেন তার সঙ্গে বিপিনচন্দ্রের মতের মিল আছে। আমাদের রাষ্ট্র সমাজনির্ভর। স্থতরাং সমাজগঠনের ভিতর দিয়েই রাষ্ট্রকে গড়ে তুলতে হবে। ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতার ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ তখন থেকেই ব্যাপৃত। বিপিনচন্দ্রও বহু প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় ভারতীয় সংস্কৃতির ব্যাখ্যা করেছেন। রক্ষণশীল পণ্ডিতেরা যেভাবে এই ব্যাখ্যা করেন, তার থেকে এই ব্যাখ্যার পার্থক্য আছে। বিপিনচন্দ্রের ব্যাখ্যা শুধু তত্ত্বগত নয়, ইতিহাসগত। ভারতীয় সংস্কৃতি শুধু হিন্দুর সংস্কৃতি নয়, মুসলমানেরও সংস্কৃতি। বিপিনচন্দ্রের এই দিকটা প্রণিধানযোগ্য। বস্তুত বিপিনচন্দ্রের কোনো রচনাকে অবিমিশ্র রাজনৈতিক বলা যায় না। কারণ তাঁর বক্তৃতা উচ্ছ্বসিত বক্তৃতা মাত্র নয়। যুক্তি ও বুদ্ধির দীপ্তি তাদের মধ্যে সময়োত্তীর্ণ চিন্তনীয়তা এনে দিয়েছে। বিপিনচন্দ্রের রচনায় ভারত-সংস্কৃতির অতীত ও বর্তমান যে অনেকখানি সহজবোধ্য হয়েছে একথা অস্বীকার করা যায় না। রাজনৈতিক নেতারূপে তাঁর আবির্ভাব ভারতবর্ষে কতখানি সার্থকতা এনেছে, তার আলোচনা হয়তো বিশেষ এক দৃষ্টিকোণ থেকে হবে। কিন্তু বিপিনচন্দ্রের ভাবুকতার যে আলাদা মর্যাদা আছে, রাজনীতি যে তাঁর ভাবুকতার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত সেটাই তাঁকে প্রথম শ্রেণীর চিন্তাশীলদের মধ্যে স্থাপিত করবে। তাঁর মনন-প্রতিভা অনেকটা ব্যাখ্যানেরই প্রতিভা। তিনি যে নতুন কোনো আদর্শ আমাদের দিয়েছেন একথা বলতে পারব না। তবু এই ব্যাখ্যা-প্রবৃত্তির মধ্যেই বিপিনচন্দ্রের বিশিষ্টতা। একদিকে সেই বিশিষ্টতা আধুনিকতার বাণীবহ আর একদিক দিয়ে ঐতিহ্যচেতনায় সমৃদ্ধ। লক্ষ্য করা যায় সাহিত্য-বিষয়ক রচনাগুলিও যুগ ও সমাজের পর্যালোচনার দ্বারাই স্পষ্টতা অর্জন করেছে।

বিপিনচন্দ্রের পর বাঙালীর চিন্তাভঙ্গি ভিন্নপথে অগ্রসর হয়েছে। সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার প্রসার হয়েছে সত্য, কিন্তু বর্তমানকালে সে ব্যাখ্যাকে প্রয়োগ করা যায় না। কারণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ক্রমবিস্তার সামাজিক সংহতিকে ক্ষুণ্ণ করেছে। তবু একথা বলব, বিপিনচন্দ্রের রচনার মূল্য কোনোদিনই হারাবে না—দেশ সমাজ ও জাতিকে চিনতে গেলে যাঁদের লেখা বাদ দিলে কিছুতেই চলে না বিপিনচন্দ্র পাল তাঁদের অন্যতম হয়েই বিরাজ করবেন।

বিপিনচন্দ্র পালের চিন্তাপূর্ণ গদ্যরচনা যখন সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, তখন বাংলা গদ্যসাহিত্যের প্রথম যুগ অতিক্রান্ত। বঙ্কিমযুগ বলতে বাংলা সাহিত্যে যে যুগকে বোঝায় প্রবন্ধকাররূপে বিপিনচন্দ্রের খ্যাতি তার পরে। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগকে

বলা যেতে পারে তাঁর গদ্যরচনায় শিক্ষানবিশির যুগ। বঙ্গদর্শনকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে যে বিশিষ্ট চিন্তাপদ্ধতির আদর্শ রচিত হয়েছিল, বিপিনচন্দ্র সেই আদর্শেই নিজের গদ্যরূপকে মার্জিত করেছিলেন। তাঁর প্রধান রচনাগুলি সবই প্রায় বর্তমান শতাব্দীতেই প্রকাশিত হয়েছে। 'শোভনা' নামে একটি উপন্যাস, 'ভারতসীমান্তে রুষ' 'ভিক্টোরিয়া' এবং 'ভক্তিসাধন' প্রকাশিত হয়েছিল গত শতাব্দীতে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে। কিন্তু যে রচনাগুলি বিপিনচন্দ্রকে বাংলার চিন্তাশীল প্রবন্ধকারদের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে সেগুলি সবই প্রায় এই শতাব্দীর। 'জেলের খাতা' 'চরিতকথা' 'নবযুগের বাংলা' ছাড়াও 'সত্যমিথ্যা' নামে একটি ছোটগল্পের সংগ্রহ এবং বৈষ্ণবধর্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত রচনাগুলি বিপিনচন্দ্রের চিন্তাস্বাতন্ত্র্যের সুস্পষ্ট পরিচয় বহন করছে।

'স্বাতন্ত্র্য' কথাটা আপেক্ষিক। বিংশ শতাব্দীতে বাংলা প্রবন্ধজাতীয় রচনার মধ্যে যে ধরনের চিন্তা মুখ্য হয়ে উঠেছে বিপিনচন্দ্র ঠিক তাকে অনুসরণ করেন নি। তিনি নিজে চিন্তার একটি ভিত্তি গড়ে নিয়েছিলেন এবং যতদূর মনে হয় বিপিনচন্দ্রের বিশ্লেষণশক্তির অসাধারণ মৌলিকতা সত্ত্বেও তাঁর মূল প্রেরণা ছিল বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সমাজকল্যাণমূলক ভাবনারীতিতে। উনবিংশ শতাব্দীর পরিমণ্ডলে তাঁর প্রবন্ধ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হত সন্দেহ নেই, তবু তার একটা সাধারণ উৎস নির্দেশ করা শক্ত হত না। কিন্তু এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে সমাজে এবং যুগচিন্তায় যে পরিবর্তনটি ধীরে ধীরে ঘটছিল বিপিনচন্দ্র তার সবটুকুই গ্রহণ করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-আশ্রয়ী স্বাধীন বিচারণাতেই আধুনিকতর যুক্তিধর্মী রচনার লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে, ক্রমে ক্রমে তার প্রভাব দেশে ছড়িয়ে পড়েছে, বিশেষ করে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের সুযোগ্য সহায়তায়। আজ সেখানে বিপিনচন্দ্র পালের প্রভাব ততখানি জীবন্ত না হলেও আধুনিক বাংলার সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় তাঁর পথনির্দেশকে স্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই।

বিপিনচন্দ্র বাংলা দেশের আধুনিক ইতিহাসের যখন ব্যাখ্যা করছিলেন, তখন তাঁর সহযোগী আরও কেউ কেউ ছিলেন যাঁরা তাঁরই মত ঐতিহ্য এবং সংস্কারে পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে যুক্তিমূলক রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এবং পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর নামও মনে পড়বে। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের স্থান স্বতন্ত্র। তিনি ছিলেন বিশুদ্ধ জ্ঞানপন্থী। তিনি বিশ্বাস করতেন প্রাচীন ভারতীয় বৈদিক এবং পৌরাণিক জ্ঞান এবং কর্মকাণ্ডে। পাঁচকড়ি বা বিপিনচন্দ্র রামেন্দ্রসুন্দরের মতো বিশুদ্ধ জ্ঞানপন্থী ছিলেন না। আবেগ এবং অনুভূতি তাঁদের চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত

করেছিল। এই আবেগের উৎস ছিল দেশ সমাজ এবং ধর্ম। বাংলা ও বাঙালীর বিশিষ্টতা ধর্মে সাহিত্যে জীবনাচরণের ক্ষেত্রে সমভাবেই প্রতিফলিত বলে একটা দৃঢ় বিশ্বাস এঁদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল। এটা আকস্মিক ছিল না। দেশ-সত্তা এবং জাতি-সত্তা সম্পর্কে সচেতনতা আধুনিক মনেরই বিশিষ্টতা। মধ্যযুগীয় চিন্তায় এর আভাস ছিল না। মধ্যযুগে ছিল ধর্ম আচার এবং সংকীর্ণ সংসারযাত্রার অন্ধ সংস্কার। আধুনিক ধর্ম-সাধনাতে যুক্তি এল, অন্ধ আচার সংশয়পূর্ণ হল আর সংকীর্ণ জীবন বৃহত্তর স্বার্থবোধে মুক্তিলাভ করল। জাতি বা সমাজকে ভালোবাসাও একটা সংস্কার। কিন্তু এই সংস্কারকে নূতন করে অর্জন করতে হয়েছে। এই জগৎ এবং মানবসমাজকে ভালোবাসার জন্য হৃদয়কে নূতন করে গড়ে নিতে হল। *আমাদের সমগ্র ঊনবিংশ* শতাব্দীর আধুনিক চিন্তাসূত্রে এই ইহমুখিনতাই ছিল একটি খুব বড়ো এবং মৌলিক গ্রন্থি। রামমোহনের আবির্ভাবে বাংলা দেশে যে-আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির সূত্রপাত ঘটে তাতে ভারতীয় বা বাঙালী জাতি বলে বিশিষ্ট গর্ববোধ দেখা না দিলেও স্বসমাজমুখী ইহকেন্দ্রিক চিন্তা যে দেখা দিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। যাকে রাজনৈতিক অর্থে জাতীয়তাবোধ বলে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সেই বস্তুটি তেমন প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে নি। কিন্তু তা না হলেও নানাভাবেই তার ভূমি প্রস্তুত হচ্ছিল। স্বদেশের প্রাচীন ইতিবৃত্তের উদ্ধার-সাধনে, নূতন সমাজ-গঠনের কল্পনায়, ধর্ম এবং সাহিত্যের নবীন রূপান্তরণে স্বভাবতই একটা সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের অনুসন্ধান চলেছিল। বিপিনচন্দ্রই বলেছেন[১]—

'আপনাদিগের পুরাতন ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বাভিমান এইভাবে আমাদিগের মধ্যে জাগিয়া উঠে, তাহারই উপরে সর্বপ্রথমে আমাদের আধুনিক স্বাদেশিকতার বা Nationalism এর মূল ভিত্তি স্থাপিত হয়।'

বিপিনচন্দ্রের এই উক্তি সত্য হলে আমাদের আধুনিক নবজাগরণের প্রথম পর্যায়ে জাতীয়তাবোধের ব্যাপ্ত হওয়ার কারণও ছিল না। কিন্তু স্বদেশাভিমান যে ধর্ম এবং সমাজের সংস্কার-প্রয়াস থেকেই জেগে উঠবে, সেটাও ছিল স্বাভাবিক।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জাতীয়-চেতনা এই ঐতিহাসিক কারণেই ব্যাপকতা অর্জন করল। এই পরিমণ্ডলের মধ্যেই বিপিনচন্দ্রের প্রথম শিক্ষা এবং প্রেরণা। ইংরেজিতে লেখা আত্মজীবন-চরিতে তিনি বলেছেন—

'আমার যৌবনকালে বাঙালী যুব-সম্প্রদায় তত্ত্ববোধিনী-গোষ্ঠীর চেয়ে বরং বঙ্গদর্শন-গোষ্ঠীর সংস্পর্শেই বেশি এসেছিল। তত্ত্ববোধিনী আমাদের মত যুবকদের

১ চরিতকথা, 'সুরেন্দ্রনাথ'

কাছে ছিল গুরুগম্ভীর। বঙ্গদর্শনের উপন্যাস, কবিতা, ব্যঙ্গরচনা, ঐতিহাসিক এবং সামাজিক রচনা আমাদের হৃদয়কে অধিকতর উদ্দীপিত করত। দুর্গেশনন্দিনী আমাদের স্বদেশাভিমানকে জাগিয়ে দিল। আমাদের অন্তরের সমস্ত সহানুভূতি আমরা উজাড় করে দিলাম বীরেন্দ্রসিংহের উদ্দেশে। কিন্তু আমাদের বিশেষ প্রিয় ছিলেন হেমচন্দ্র। হেমচন্দ্রের মতো আর কারও কাব্যই জাতীয়তাবোধকে এমন করে জাগাতে পারে নি।'

বাংলার জাগরণের এই দিকটা এবার স্বাভাবিক পরিণতি পেল। স্বদেশপ্রেম দেখা দিল পরিপূর্ণ ইহচেতনার ফল হিসাবেই। কিন্তু এই স্বদেশপ্রেমে বিশেষত্ব ছিল। এতে তখনও সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রকৃতি আসে নি। বঙ্কিমচন্দ্র যে স্বদেশপ্রেমের বাণী দিয়েছিলেন, তাতে জাতি হিসাবে সর্বাঙ্গীণ জাগরণকেই কাম্য বলে কল্পনা করেছিলেন। এই জাতীয়তাবোধে জাতিবৈরিতাও ছিল না। পরবর্তী কালে জাতীয়তা কেবল রাষ্ট্রশাসনের অধিকারবোধে পর্যবসিত হয়ে বিশুদ্ধ রাজনৈতিক রূপ লাভ করল। কিন্তু এই নবজাগ্রত জাতীয়-চেতনা ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, নীতিশিক্ষা— সব কিছুকেই অবলম্বন করল। আমাদের প্রথম জাগরণের ধারাবাহিকতাই এতে অব্যাহত ছিল। প্রথম যুগে সমাজ ধর্ম এবং শিক্ষাসংস্কারে যে মানবিক বোধের উদ্বোধন, তার লক্ষ্য ক্রমশ নিবদ্ধ হল জাতীয় সচেতনতায়। সেইজন্যই উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জাতীয়-চেতনা এমন বিভিন্নমুখী উদ্যমে পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

এই বিশিষ্ট জাতীয়তাবোধকে বিশ্লেষণ করলে আরও কতকগুলি সূত্র চোখে পড়ে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সনাতনপন্থীদের হিন্দুধর্ম এবং ব্রাহ্মধর্মের সম্প্রদায়-চেতনা স্বভাবতই বেশি ছিল। ব্রাহ্মধর্মের নবীন প্রতিষ্ঠা এবং সনাতনপন্থীদের আপন শুচিতা অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টা তার প্রধান কারণ সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলা দেশে নূতন ভাববিপ্লবের ফলে এই বিভেদের তীব্রতা যেন খানিকটা গৌণই হয়ে গেল। ব্রাহ্মধর্মের আত্মবিরোধকেই শুধু এর একমাত্র কারণ বলা চলে না। মনে হয়, বৃহত্তর জাতীয় কর্তব্যবোধও এর একটা কারণ ছিল। সেই কর্তব্যের আহ্বানে রাজনারায়ণ বসু 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' রচনা করে ব্রাহ্মধর্মের অসাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন। কেশবচন্দ্রের ধর্মচেতনাও বৈষ্ণব এবং খ্রীস্টান ধর্মের প্রভাবে কতকটা বর্ণান্তরিত হল। এই সময়ে সম্প্রদায়ের সীমারেখাগুলি খানিকটা ম্লান হয়ে এল। তখন বরং নূতনতর জাতীয়তাবোধে উজ্জীবিত হয়ে সকলেই একটি সাধারণ লক্ষ্যকে স্বীকার করে নিল। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে নিভৃত আত্মজীবনের কথা বলতে গিয়েও এই জাতীয়তাবোধের উন্মাদনার কথা বলতে ভোলেন নি। বিপিনচন্দ্র কেশবের

নূতন মতের বর্ণনা করতে গিয়েও তাতে জাগ্রত দেশপ্রেমের পিপাসাকেই তৃপ্ত হতে দেখেছেন।—

'খ্রীস্টান মিশনারীদের সঙ্গে কেশবের বাদবিতর্ক শুধু তাঁর অনুগামীরাই নয়, অন্যান্যেরাও আগ্রহের সঙ্গে পড়ত। মিশনারীদের উপর জয়লাভে কেশবের মতানুবর্তীরা ছাড়াও সাধারণভাবে তাঁর স্বদেশবাসীরা সকলেই গর্ববোধ করত; তারই দ্বারা আমাদের স্বাজাত্যভিমান চরিতার্থ হত।'

সুতরাং ধর্মোন্মাদনার মধ্যেও একটা অভিনব সংকেত পাওয়া যাচ্ছে। আপন আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকেও একটা সর্বজনগ্রাহ্য আদর্শ ধীরে ধীরে জেগে উঠতে আরম্ভ করেছে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সমন্বয়-সাধনের অন্যবিধ আয়োজন সার্থক হক আর নাই হক, এই জাতীয়তার একটা স্বার্থমুক্ত রূপ গড়ে উঠতে লাগল; সেটা যে নবজাগ্রত বাঙালীর বিভিন্নমুখী প্রবণতাকে সংহত করে নিয়ে আসছিল তাতে সংশয় নেই।

বিপিনচন্দ্র এই যুগেরই মানুষ। এক অর্থে তাঁর ব্যক্তিত্বে এবং চিন্তায় এই যুগের দ্বন্দ্ব সংশয় এবং মীমাংসা এমনভাবে রূপলাভ করেছে যে, ঠিক আর কাউকে তাঁর সমধর্মী ভাবতে পারা যায় না। দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ— এঁরা বাংলার জাগরণের ফলস্বরূপ বিভিন্ন বাণী এবং আদর্শকে দিয়ে গিয়েছেন। বিপিনচন্দ্র নিজে কোনো বাণী রচনা করতে পারেন নি, কিন্তু জাগরণের বিভিন্নমুখী প্রভাবকে একসঙ্গে তিনি বহন করে গিয়েছেন। তিনি আচারনিষ্ঠ হিন্দু পরিবারের সন্তান হয়ে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, আবার বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন-ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পৌরাণিক সমন্বয়-কল্পনার দিকে ঝুঁকেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র অবতারবাদে বিশ্বাস করতেন; ব্রাহ্ম বিশ্বাসে অবতারবাদের স্থান ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্র' রচনা করতে থাকলে দেবেন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রনাথকে তার প্রতিবাদ করতে বলেছিলেন। বিপিনচন্দ্র অবতারবাদ স্বীকার করে বলেছেন[১]—

'বাহিরে যার প্রকাশ হয় না, ভিতরে তার জ্ঞান জাগে না, জাগিতে পারে না। ভগবানকে বাহিরে দেখিলে তবে ভিতরে তাঁর সত্যজ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়। এইজন্য ভগবানের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ যে-সকল মহাপুরুষের মধ্যে হয় তাঁহারাই জগতে সকল ধর্মের প্রত্যক্ষ আশ্রয় হইয়া রহেন। ইহাই অবতারের মূল অর্থ ও মুখ্য প্রয়োজন।'

ব্রাহ্ম ও পৌরাণিক ধর্মের যুগপৎ অবস্থানকে বিস্ময়কর বলে মনে হয়, কিন্তু তার পরেও বৈষ্ণবধর্মে গভীর বিশ্বাসও বিপিনচন্দ্রের অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের আর-একটি দিক।

১ চরিতকথা 'অশ্বিনীকুমার দত্ত'।

এই বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে বিপিনচন্দ্রের উদার মুক্তবুদ্ধি মননশীলতাও সমানভাবেই স্মরণীয়। বাংলার জাগরণের এমন পরিচ্ছন্ন স্পষ্ট ব্যাখ্যাও আর কেউ করেন নি। বস্তুত 'নবযুগের বাংলা'র ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলির কথা বাদ দিলেও 'চরিতকথা'র মধ্যেও তারই অনুবৃত্তি দেখতে পাওয়া যাবে। 'নবযুগের বাংলা'য় জাগরণের ইতিহাস যেখানে থেমেছে, 'চরিতকথা'য় রচিত হয়েছে তার পরের অধ্যায়। ইতিহাস এবং সমাজের পটভূমিতে ব্যক্তিকে স্থাপন করে তার আবির্ভাবকে যেভাবে অর্থপূর্ণ করে তুলতে তিনি পারতেন, তার তুলনা সত্যই বিরল। অবশ্য 'চরিতকথা'র আলোচনাতে বিপিনচন্দ্র সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ, কিন্তু বিচার এবং বিশ্লেষণের ক্ষুরধার দীপ্তি তাতেও অক্ষুণ্ণ আছে। এই যুক্তিবাদ-ও বিপিনচন্দ্রের আর একটি দিক। এইসব বিভিন্নমুখী প্রবণতা বিপিনচন্দ্রের মানসজীবনের-বিভিন্ন পর্যায়ে নয়, একই সঙ্গে তাঁর চিত্তকে অধিকার করেছিল।

এই বিচিত্র এমন কি বিরোধী বিশ্বাস এবং বৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশের বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় চিন্তানায়কদের ভিতর প্রকাশ পেয়েছিল। বাংলার জাগরণ এমন বিচিত্র সৌন্দর্য লাভ করেছিল এঁদেরই দানে। বিপিনচন্দ্র তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ এবং গ্রন্থে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সামাজিক অগ্রগতির ব্যাখ্যা করেছেন; এই বিষয়টিতে তাঁর মনীষা যত মুক্ত এবং উজ্জ্বল অন্য কিছুতেই তত নয়। সম্ভবত বিপিনচন্দ্র নিজে এই সামাজিক অভ্যুত্থানের সৃষ্টি বলেই এই বিষয়টিতে তাঁর ধারণা ছিল স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার। এই বিভিন্ন আদর্শ তাঁর চিত্তক্ষেত্রে কোনো মৌলিক জীবন-নীতির সৃষ্টি করে তুলতে পারে নি সত্য, কিন্তু বাংলা দেশের আধ্যাত্মিক অনুসন্ধান যেমন সমষ্টিগত কল্যাণধর্ম রচনা করল বিপিনচন্দ্র তেমনি ব্যক্তি-হৃদয়ের আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসাকে অপেক্ষাকৃত গৌণ করে দেশের কল্যাণ-চিন্তাকে প্রধান করে তুলেছিলেন। জাতীয়তার ধ্যান বিপিনচন্দ্রের আর-সব চিন্তাকেই আচ্ছন্ন করল। আজও বিপিনচন্দ্রের পরিচয় জাতীয়তাবাদী নেতা বলেই। কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে বিপিনচন্দ্রের কীর্তি যাই থাক্ বাংলা সাহিত্যের পাঠক জানেন বাঙালী সমাজের চিন্তাশীল ভাষ্যকাররূপে তাঁর স্থান ভূদেব-বঙ্কিমের সঙ্গেই। তাঁর এই মনীষা যে বাংলার জাগরণেরই ফল, তাও আমরা দেখেছি। তাঁর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপও সেই শতাব্দীর বিশিষ্ট জাতীয়তাবোধ থেকেই অনুপ্রেরিত, সে কথাও সত্য। বিপিনচন্দ্রের এই স্বাজাত্যবোধে বাংলা দেশ এবং সংস্কৃতির একটা বিশিষ্ট রূপ ফুটে উঠেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা দেশের ইতিহাসের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছিলেন, তাঁর পত্রিকার নাম তিনি দিয়েছিলেন 'বঙ্গদর্শন'। বাংলা দেশ সম্পর্কে তাঁর এই আগ্রহ একটা খুব স্বাভাবিক কারণেই গড়ে উঠেছিল।

মনে রাখতে হবে, এক যুগে নব্যবঙ্গদের মুখপত্রের নামও ছিল 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর'— 'বঙ্গদর্শন' নামটিকে তারই অনুবাদ বলে ধরা যেতে পারে। নব্যবঙ্গের আলোচ্য বিষয়ে ও পদ্ধতিতে সংকীর্ণতা ছিল না; তাঁরা দেশের ইতিহাস, সমাজনীতি, সাহিত্য এবং ধর্মের আলোচনা মুক্তবুদ্ধি দিয়েই করেছিলেন। তাঁদের বিষয়বস্তুতে বাংলা দেশ যদি কোনো কারণে কখনও প্রধান হয়ে উঠে থাকে সেটা ঐতিহাসিক কারণেই হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধেও সেই কথাই বলা যেতে পারে। তিনি বাংলা দেশের ইতিহাস গড়তে চেয়েছিলেন, তাঁর বঙ্গপ্রীতিও আন্তরিক, কিন্তু বাংলা দেশ নিয়ে কোন অন্ধতা প্রকাশ করেন নি। বাংলা দেশের সংস্কৃতি এবং সাধনার বৈশিষ্ট্য বিশেষ করে পর্যালোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়াল বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিপিনচন্দ্র পালের রচনাতেই। বিংশ শতাব্দীতে পূর্বেকার জাতীয়তাবাদের একটা বিস্তার ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথের ভারতীয় আদর্শের বৃহৎ উপলব্ধি ক্রমেই আরও একটা বৃহত্তর লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। এই শতাব্দীর নূতনতর যুগচিন্তা প্রকাশ পেয়েছে আন্তর্জাতিকতায়। সাহিত্যের দিক দিয়ে বলা যায় দ্বিতীয় দশক থেকেই এর প্রসার। প্রমথ চৌধুরী এবং তাঁর সাহিত্য-শিষ্যরা অনুসরণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের এই সময়ের উদ্বর্তিত চিন্তাধারাকে।

বিপিনচন্দ্র কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর স্বসমাজনিষ্ঠ জাতীয়তাবোধে অবিচল ছিলেন। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথকেও এর সঙ্গে যুক্ত হতে দেখেছি। এই আন্দোলনের মূলে শুধুই রাজনীতি ছিল না, এতে ছিল বাংলার সাংস্কৃতিক বিচ্ছেদের দুশ্চিন্তা। সেইজন্য এর মধ্যে বাঙালীর সমগ্র সত্তা যেন সাড়া দিয়েছিল। বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির চিন্তা এবং ধ্যান এরই ভিতর দিয়ে বাঙালী চিত্তকে অভিভূত করল। বিপিনচন্দ্র রাজনীতির ক্ষেত্রে বাংলা দেশকে মাত্র লক্ষ্য করেন নি, এ কথা সত্য। কিন্তু চিন্তার ক্ষেত্রে বাংলা দেশ এবং তার সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যে তাঁর প্রত্যয় ছিল অক্ষুণ্ণ। তিনি বাংলার বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং এই বৈষ্ণব ধর্মকে তিনি শুধু ব্যক্তিগত ধর্মোপলব্ধির উপায় হিসাবেই গ্রহণ করেন নি, বৈষ্ণব ধর্মকে আধুনিক আদর্শের প্রতীক রূপেও বিশ্বাস করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন কৃষ্ণচরিত্রকে পৌরাণিক অলৌকিকতা থেকে মুক্ত করে আধুনিক যুগের রুচি ও যুক্তিসঙ্গত মনোভাবের উপযোগী করে নিয়েছিলেন, বিপিনচন্দ্র তেমনি বৈষ্ণবধর্মকে অনেকটা নূতন আদর্শেই গ্রহণ করেছিলেন। বিপিনচন্দ্র যখন অবতারদের সমর্থন করেন তখন ধর্মবিশ্বাসের জন্য যতটা না হক বাস্তব প্রয়োজনের জন্য তার চেয়ে কম সমর্থন করতেন না। নারায়ণ তাঁর কাছে মানবতারই প্রতীক।

এরই ফলে বৈষ্ণবধর্ম এবং হিন্দুধর্মের তত্ত্বচিন্তার দিকে তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। মনে হয় ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসের দিক্ দিয়ে ব্রাহ্ম হলেও হিন্দুধর্মের নির্বিশেষ লজিকটাকে তিনি জাতীয় জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন। এই দিক দিয়ে বঙ্কিমযুগের মনীষারই তিনি উত্তরাধিকারী। বিপিনচন্দ্রের মনীষাকে এইভাবে বুঝতে পারলে বাংলার ভাবুক-সমাজে তাঁর স্থানটিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে যে দুটি বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি প্রধান হয়ে ওঠে, তাদের মধ্যে বিপিনচন্দ্রকে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, চিত্তরঞ্জন দাশ, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরীর পক্ষেই স্থাপন করা যায়। রবীন্দ্রনাথকে পুরোধা করে যে ব্যক্তিস্বতন্ত্র্যবাদী প্রবন্ধধারার উদ্ভব হল বিপিনচন্দ্র ছিলেন তার প্রতিপক্ষ। বিপিনচন্দ্র দেশ এবং জাতির প্রকৃতির উপর ভিত্তি করেই দাঁড়িয়েছিলেন, এবং এটা খানিকটা আসক্তিতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রবন্ধরীতির আর একটা বৈশিষ্ট্য যেটা তাঁর রচনার মধ্যে প্রকাশ পেল সেটা হচ্ছে বক্তব্য এবং ভাষার অলঙ্কারহীনতা। ভাষার শিল্পকলা ছিল তাঁর কাছে অপ্রধান। রবীন্দ্রনাথ বাংলা গদ্যভাষা-প্রকৃতিতে পরিবর্তন এনেছিলেন। ভাষাকে শুধু অর্থের ভার বহন করতে না। দিয়ে ব্যঞ্জনার ধর্মও তাতে এনে দিলেন। এই পরিবর্তন অনেকেরই পছন্দ হয় নি। গদ্যের কাজ যে তথ্য এবং যুক্তির দ্ব্যর্থহীন বক্তব্যকেই প্রকাশ করা, এ বিষয়ে তাঁদের সন্দেহ ছিল না। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ গদ্যের মধ্যে ব্যক্তিগত দৃষ্টি-বৈচিত্র্যের সূচনা করলেন, আপন কবিসত্তার প্রবল নির্দেশকে তিনি অমান্য করতে পারেন নি। 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ জীবনদেবতার উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিবাদের একটা ঝড় বয়ে যায়। বিপিনচন্দ্র রবীন্দ্রসাহিত্যে অস্পষ্টতা, বাস্তবহীনতা, জীবনবিমুখতার অভিযোগ করে একটি বড়ো প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন; রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তার সম্বন্ধে বলেছেন—

'বিপিনচন্দ্র সাহিত্যের দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথকে দেখেন নাই; তিনি তাঁহার জীবনকে ও সাহিত্যকে মিলাইয়া পড়িতে গিয়াছিলেন এবং জীবনের এমন সকল ঘটনার দিক দিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হন, যাহার সঙ্গে সাহিত্যের কোন যোগ নাই।'

সত্য সত্যই বিপিনচন্দ্র জীবন এবং সাহিত্যকে মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা করতে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রোশের ফলে তার প্রতিকূল সিদ্ধান্তে আসবার জন্যই বিপিনচন্দ্র এই পদ্ধতিকে প্রয়োগ করেছিলেন, এ কথা অবশ্য মেনে নেওয়া শক্ত। বিপিনচন্দ্রের প্রবন্ধরচনার এটাই ছিল পদ্ধতি। 'চরিতকথা' বইটিতে তিনি যে কয়জনের জীবনী আলোচনা করেছেন সবকটিতেই তিনি এই পদ্ধতি

অবলম্বন করেছেন। অবশ্য একথা বলা যেতে পারে, সমাজ-নেতাদের জীবনীর আলোচনায় এই পদ্ধতি-ই বাঞ্ছনীয় কারণ তাঁদের কর্মচেষ্টা বৃহত্তর জাতীয় জীবনের সঙ্গে জড়িত। সাহিত্য-বিচারেরও কি এই নীতিই হওয়া উচিত?

ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য-আলোচনা-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, 'কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ।' বঙ্কিমচন্দ্রের এই সূত্রটি আধুনিক সাহিত্য-সমালোচনাতে জীবন ও সাহিত্যের যোগকে ঘনিষ্ঠ করে তুলেছে। এই মনোভাবটিকে উনবিংশ শতাব্দীর সামগ্রিক দৃষ্টিরই ফল বলা যেতে পারে। স্পষ্ট প্রত্যক্ষ বস্তুআশ্রয়ী যুক্তিবাদী জীবন-নীতির প্রভাবে সাহিত্যের এই আদর্শও গড়ে উঠেছিল। কাব্যসৃষ্টির প্রেরণাস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ যখন জীবনদেবতার উল্লেখ করেছিলেন, তখন অনেকে উপহাস করেছিলেন। কিন্তু বিপিন-চন্দ্র 'জেলের খাতা'য় লিখেছেন—

'ইহা অসংখ্যবার উপলব্ধি করিয়াছি যে কে যেন অন্তরঙ্গ হইতে আমার লেখনী বা রসনাকে অবলম্বন করিয়া আমাকে অদ্ভূত সত্য শিক্ষা দিতেছেন।'

তাঁর এই উপলব্ধির মধ্যে মিস্টিসিজম্ অবশ্যই আছে, তবে রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতা-বাদের সঙ্গে প্রভেদ কি? প্রভেদ সম্ভবত এইটুকুই যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্য পাঠকের উদ্দেশ্যে রচিত আর বিপিনচন্দ্রের অদৃশ্য শক্তি তাঁর ধর্মসাধনার বিষয়। মানুষের সঙ্গে যেখানে মানুষের যোগ, সেখানে প্রত্যক্ষতা এবং বাস্তববোধ থাকা চাই। সমষ্টি-কল্যাণই জীবনের পরম লক্ষ্য। জীবনকে বুঝতে গেলে এই বস্তুগ্রাহ্য সামাজিক দিক্ দিয়েই বুঝতে হবে। বিপিনচন্দ্রের প্রবন্ধের মধ্যে একটা কঠিন যুক্তিবাদিতা আছে, যা অবশ্য গণিতের বা দর্শনের নয়। জীবনকে কল্যাণপ্রতিষ্ঠ করবার অদম্য বাসনার ফলে ইতিহাসের সংকেতকে বুঝবার চেষ্টা থেকেই তাঁর এই যুক্তিবাদিতার উদ্ভব। তাই বিপিনচন্দ্রের চিন্তা abstract বা theoretical নয়। তাঁর যা কিছু চিন্তা সমাজদর্শন নিয়েই। সে-সমাজ বাংলারই সমাজ। ইতিহাস-বোধ এই চিন্তায় প্রবল। আধুনিক বাঙালী সমাজের ধর্মগত নীতিগত এবং আদর্শগত লক্ষণগুলিকে তিনি নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এ দিকে এমন একটা সহজাত আনন্দ ও তৃপ্তি তিনি বোধ করতেন যে কখনও কখনও মূল আলোচ্য থেকে সরে গিয়েও সেই ইতিহাসকে তিনি অনুসরণ করতে ভালোবাসতেন।

এইসব আলোচনায় জাতীয় প্রকৃতিতে একটা অবিচল বিশ্বাস ধ্বনিত হয়েছে। য়ুরোপীয় সভ্যতা থেকে প্রাপ্ত ভাবগুলি তিনি জাতীয় প্রকৃতির কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিতে চেয়েছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি ইতিহাসের আলোচনা করেছেন, ততক্ষণ তাঁর

মনীষা অসামান্য বলেই মনে হবে। কিন্তু সমাজের ক্ষেত্রে তার উপযোগিতা এবং প্রয়োগের প্রসঙ্গ যখন এসেছে তখন এক অদ্ভুত দ্বন্দ্ব আসে। য়ুরোপীর চিন্তার যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ তাঁকে অনেক দিক্ দিয়ে মুগ্ধ করে। নবযুগের বাংলা-গঠনে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ ভাবসম্পদের দান যে অপরিসীম সে-কথা তিনি বিশ্বাস করেন—

'বৃটিশ ভারতের অন্য কোনো প্রদেশে যখন ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা সঞ্চার হয় নাই, বাঙালী তখনও এই মুক্তিমন্ত্র-সাধনে নিযুক্ত ছিল। আর এই জন্যই বাংলার স্বাধীনতার আদর্শের পূর্ণতা ও সজীবতা বাঙালীর স্বাদেশিকতার ধর্ম-প্রাণতা ও একনিষ্ঠতা এবং বাংলার রাষ্ট্রীয় জীবনের শুদ্ধি ও শুদ্ধতা এ সকল এ পর্যন্ত ভারতের অন্য কোনো প্রদেশে দেখা যায় নাই।'

অথচ বাঙালী সমাজের ধর্মগত এবং স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা এবং তার সম্পর্কে একটা গর্ববোধ বিপিনচন্দ্রের মনীষার আর-একটি লক্ষণ। এই দ্বন্দ্বের মীমাংসার চেষ্টা আধুনিক বাংলার চিন্তাশীল প্রবন্ধকারদেরই একটি লক্ষ্য ছিল। অনেকেই বিভিন্ন উপায়ে এই চেষ্টা করেছেন; বিপিনচন্দ্রও করেছিলেন। তিনি কর্মক্ষেত্রে যতখানি অগ্রসর হতে পেরেছিলেন, ভাব বা চিন্তার ক্ষেত্রে ততখানি অগ্রসর হন নি। তাঁর রচিত গল্পগুলি গল্প হিসাবে যে সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছে তা বলা না গেলেও সেখানেও এই দ্বন্দ্বসংশয়-চিহ্ন ফুটে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্রে'র উত্তরে তিনি যে 'মৃণালের উত্তর' রচনা করেছিলেন, তাতে স্বাভাবিক ঘটনার পরিবর্তে একটা কল্পিত এবং কৃত্রিম পরিস্থিতিতে মৃণালকে স্থাপন করে প্রাচীন পারিবারিক প্রথা এবং সামাজিক আদর্শের প্রতি অনুরাগই প্রকাশ করেছিলেন। গল্প হিসাবে তাঁর 'সত্য-মিথ্যা' সার্থক হয় নি, তার প্রধান কারণই ছিল তত্ত্বপ্রবণতা। প্রবন্ধ রচনাতেই ছিল তাঁর সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের যথার্থ মুক্তি। এবং এতেই বাংলা সাহিত্যের প্রধানদের মধ্যে তাঁর স্থান নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সেই সব সাহিত্যিকের অন্যতম যাঁরা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে থাকেন কিন্তু পঠিত হন না। প্রাচীন অনেক লেখকই এই শ্রেণীভুক্ত হলেও রামেন্দ্রসুন্দর এঁদের মধ্যে স্বতন্ত্র। ক্লাসিক নামে অভিহিত সেই সব লেখক কাব্য বা উপন্যাস রচনা করে পরবর্তী যুগরুচির কাছে উপেক্ষিত হয়ে যান। রামেন্দ্রসুন্দর সেই শ্রেণীর লেখক নন। প্রবন্ধপাঠকের সংখ্যা এমনিতেই কম, তার উপর রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞান ও দর্শন নিয়ে প্রধানত ব্যাপৃত ছিলেন, সুতরাং তাঁর পাঠকের সংখ্যা আরো কম। তবু তাঁর সম্বন্ধে বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, অপেক্ষাকৃত স্বল্পপঠিত হলেও তাঁর খ্যাতি এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ প্রায় সকল শ্রেণীর পাঠকের মধ্যে এ যুগেও অক্ষুণ্ণ। অনেক প্রবন্ধলেখকই পরবর্তীকালে শ্রদ্ধাবোধকে সমানভাবে জাগিয়ে রাখতে পারেন না। চিন্তামূল্যের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এঁদের সম্বন্ধে উৎসাহ অনেকটা নিষ্প্রভ হয়ে আসে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকার হিসাবে রামেন্দ্রসুন্দর আজও সকল শ্রেণীর পাঠকের কাছেই আদৃত হয়ে আসছেন যদিও তাঁর রচনার সঙ্গে পরিচয় তেমন অন্তরঙ্গ হয়ে উঠছে না।

প্রবন্ধরচনায় রামেন্দ্রসুন্দর মন দিয়েছিলেন বঙ্কিমযুগে। প্রথম দিকে তাঁর রচনার বিষয় ছিল শুধুই বিজ্ঞান। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে 'নবজীবন' 'সাধনা' 'দাসী' প্রভৃতি পত্রিকার প্রবন্ধগুলি সংকলন করে তিনি 'প্রকৃতি' নামে প্রকাশ করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারা যখন বাংলার শিক্ষিত সমাজে সক্রিয়, রামেন্দ্রসুন্দরও সেই সময়ে বৈজ্ঞানিক ঔৎসুক্যকে খানিকটা বিষয়ান্তরে নিবিষ্ট করলেন; দেশ জাতি সমাজ সাহিত্য নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করলেন এবং তার অনুবৃত্তি চলে নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের যুগেও। এই রচনাগুলির মধ্যে বারোটি প্রবন্ধ নিয়ে তাঁর মৃত্যুর পর 'নানা কথা' নামে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই লেখাগুলির বেশির ভাগই সাময়িক সমস্যা ও প্রেরণা নিয়ে রচিত। যদিও এদের মধ্যে যে বক্তব্য ও আদর্শবাদ প্রকাশ পেয়েছে, তা সাময়িককে অতিক্রম করেই গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'সমাজ' বা 'রাজাপ্রজা'র প্রবন্ধের সঙ্গে এদিক থেকে এদের তুলনা চলে। এর পর আরও নির্বিশেষ বিষয়ের দিকে তিনি মন দিয়েছিলেন। অবশ্য 'কর্মকথা'র গ্রন্থাকারে প্রকাশকাল অনেক পরে (১৯১৪) হলেও প্রবন্ধগুলি প্রায় একই কালে লেখা হয়েছিল। 'বিচিত্র

জগৎ'-এর রচনাগুলি অবশ্য ত্রিবেদী মহাশয়ের জীবনের শেষ কয়েক বৎসরে লেখা এবং মৃত্যুর পর গ্রন্থভুক্ত। 'কর্মকথা'য় তিনি মানবজীবনের অর্থ সন্ধান করেছেন আর 'বিচিত্র জগতে' বিশেষ করে তত্ত্বচিন্তার দিকেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। প্রথম বইটিতে রামেন্দ্রসুন্দর প্রাচীন ভারতীয় কর্মবাদকে কেন্দ্র করে পাশ্চাত্য সমাজতাত্ত্বিকদের বৈজ্ঞানিক যুক্তির পথে মানব-অস্তিত্বের ব্যাখ্যা করেছিলেন; দ্বিতীয় বইতে আছে বিশুদ্ধ জ্ঞানের পথে বিজ্ঞান ও বেদান্ত মিলিয়ে জগতের এক বলিষ্ঠ ব্যাখ্যা। রামেন্দ্র-সুন্দরের চিন্তাধারার পরিবেশটি তাৎপর্যপূর্ণ। উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্কিমযুগে বিশিষ্ট প্রকৃতির চিন্তা থেকে বিংশ শতাব্দীর নতুনতর চিন্তার যুগে এসে তিনি পৌঁছেছিলেন। এই দুই শতাব্দীর কেন্দ্রীয় জীবনদর্শনের মধ্যে যেমন ধারাবাহিকতা আছে, তেমনই পার্থক্যও আছে। রামেন্দ্রসুন্দরের মনীষা এই দুই যুগের সত্যকে কি ভাবে স্বীকার করে নিয়েছিল, সেটা এক পরম কৌতূহলপূর্ণ পর্যালোচনার বিষয়।

আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন, প্রথম জীবনে রামেন্দ্রসুন্দর নাকি নাস্তিক ছিলেন। এটা কিছু বিস্ময়ের নয়; উনবিংশ শতাব্দীর অনেক মনীষীই নাস্তিক্যবাদ দিয়ে মনোজীবনের যাত্রা শুরু করেছিলেন। শেষ পরিণাম যাই হক নাস্তিক্যবাদের আঘাতে যে-বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি টলে ওঠে না—সে-বিশ্বাস জড়তারই নামান্তর। পূর্বাগত সংস্কার ও অভ্যাসের দ্বারা অন্ধের মতো চালিত হওয়া গৌরবজনক কিনা জানি না, তবে এটা ঠিক যে যাঁর মনে প্রশ্ন জাগে নি, নতুন কিছুকে গ্রহণ করবার জন্য তাঁর মনও প্রস্তুত হয় নি। নতুন অর্থে শুধুই পূর্বাপরহীন অভিনবত্ব নয়, পূর্বাগত কোনো মূল্যমানই হয়তো প্রশ্নের আঘাত সহ্য করে নবীন শক্তিতে সমুজ্জ্বল হয়ে দেখা দিতে পারে। আধুনিক বাঙালীর ইতিহাসে এই প্রশ্নের আঘাত বড়ো কঠিন হয়ে পড়েছিল। নব্যবঙ্গের আন্দোলনের সময় থেকেই এর সূত্রপাত। ডিরোজিওর যুগের স্বাধীন বিচারশক্তিতে সমাজের পুরনো মূল্যমান অস্বীকৃত হতে যাচ্ছিল। তরুণ যুবকদল নাস্তিক্যবাদের প্রভাবে পড়েছিল যদিও এদের মধ্যে অনেকেই কোনো না কোনো ধর্মবিশ্বাসে ফিরে এসেছিল। এ যুগের সংশয় এবং অবিশ্বাস থেকে বাংলা-দেশের আধ্যাত্মিক জগতে ঘটেছে অনেক রকমের অগ্ন্যুৎপাত। নতুন ধর্মমতের প্রসার, পজিটিভিজম ইউটিলিটারিয়ানিজমের উদ্ভব, সমাজকল্যাণমূলক কাজে আত্মমগ্ন হয়ে জীবনরহস্যের বৃথা অনুধ্যান থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা—উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস এসব নানা কীর্তিকলরবে পূর্ণ।

কিন্তু এসব ঘটনাকে পুরোপুরি নাস্তিক্যবাদেরই ফল বলা কি সংগত? যে অর্থে নৈয়ায়িক নাস্তিক সেই অর্থে এ যুগে নাস্তিক্যবাদ ছিল না। আচার অনুষ্ঠান রীতি-

নীতি শাস্ত্র-ধর্মের উপযোগিতায় বিশ্বাস হ্রাস পেলেও সেটা বিশেষ এক সমাজের মাত্র, পক্ষান্তরে নিখিল মানবসমাজের প্রতি কর্তব্যবোধ জাগ্রত হয়ে উঠল। সত্যকার নাস্তিক যিনি তিনি মানুষের বিচরণযোগ্য চিন্তা এবং কর্মের প্রয়োজনবোধকে অতিক্রম করে যান। যে-ঈশ্বরে বিশ্বাস এলে ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট কর্মভারকে তুলে নিতে হয়, তাকে তারা অবিশ্বাস করতে থাকে। নব্যবঙ্গের কেউ কেউ হয়তো ঈশ্বরে বিশ্বাস হারিয়েছিল কিন্তু দেশ ও সমাজের প্রতি বন্ধনকে তারা অস্বীকার করতে পারে নি। যে বিশিষ্ট জীবনযাপনের ভিতর দিয়ে ঈশ্বরনির্ভরশীলতা এতকাল ধরে চলে আসছিল, সেই জীবনকেই যখন গ্রহণ করা গেল না, তখন তারই সঙ্গে হয়তো ঈশ্বরধারণাতেও কিছু শৈথিল্য ঘটে থাকতে পারে। তার অর্থ এই নয় যে ঈশ্বরকেই তারা অস্বীকার করতে চেয়েছে। ঈশ্বরকে তারা নতুন করে উপলব্ধি করতে চেয়েছে, যে ঈশ্বর আচার ও শাস্ত্রানুগত্যের জালে রক্তকরবীর রাজার মতো বন্দী নন, যিনি গণ্ডিমুক্ত মানুষের মধ্যে স্বয়ং-প্রকাশিত। হৃদয় একটা কিছুকে বিশ্বাস করতে চায়—পুরনো সমাজকে নয়, নতুন মানুষকে, উদার নীতিকে। এক নাস্তিক্যবাদ না বলে বলা উচিত এক নতুন আস্তিক্যবাদ।

বঙ্কিমচন্দ্রের, সম্বন্ধেও শোনা যায় প্রথম জীবনে তিনিও নাকি নাস্তিক হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর মনোজীবনের ইতিহাস তিনি দিয়েছেন ধর্মতত্ত্বে। 'এ জীবন নিয়ে কি করব' অতি তরুণ বয়স থেকেই নাকি তাঁর এই জিজ্ঞাসার উদয় হয়। এই প্রশ্ন ধর্মসাধকদের মধ্যে এক অর্থে চিরকালই দেখা দিয়াছে বটে, কিন্তু বঙ্কিমের মধ্যে সেই অর্থে এই জিজ্ঞাসা আসে নি। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনকাহিনী পড়লেই তা বোঝা যায়। বুদ্ধের মতো জীবনের নিরর্থকতার কথা তাঁর মনে আসে নি। জীবনকে ঠিক কোন কাজে প্রযুক্ত করা যায়, এটাই ছিল তাঁর জিজ্ঞাসা। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে এই প্রশ্ন যত গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে দেখা দিয়েছিল, নব্যবঙ্গের মধ্যে সেরকম ভাবে দেখা দেয় নি। তারা আবেগবশে প্রাচীনকে অস্বীকার করেছিল এবং নতুন জীবন-নীতিকে প্রশ্ন না করে সহজ ভাবেই অনুসরণ করেছিল। ইতিহাস রাজনীতি সমাজনীতি এবং বৈজ্ঞানিক শাস্ত্র দিয়ে জীবন সম্পর্কে একটা ধারণা তারা গড়ে নিয়েছিল মাত্র। এই সব য়ুরোপীয় বিজ্ঞান-শাস্ত্রকে তারা ভালোভাবেই চর্চা করেছিল। কিন্তু এ সবই ছিল বাইরের ব্যাপার। জীবনের রহস্য আরও গভীর। মানুষের কল্যাণ করব—এ একটা নতুন আদর্শ কিন্তু মহৎ হলেও এও অন্ধতা, যতক্ষণ 'কেন করব' এই উত্তরটিকে অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করতে না পারছি। সেই উত্তরটি না পাওয়া পর্যন্ত এই কল্যাণকর্মও প্রাণহীন আচার মাত্র। বুদ্ধের নীতিবাক্য বা খ্রীস্টের উপদেশ একটা কোনো মহত্তর

আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের জন্য। সেটা ব্যক্তিরই আত্মিক স্বার্থে। বঙ্কিমের প্রশ্ন অন্য রকম। ধর্মতত্ত্বে বঙ্কিমচন্দ্র এই 'কেন'র উত্তর দিয়েছেন, তাতে ব্যক্তিত্ব-ধর্ম রক্ষা করেও আধ্যাত্মিক স্বার্থকে গৌণ করে সমাজাভিমুখিতাকে বড়ো করে দেখানো হয়েছে। 'Metaphysical ego'কে বঙ্কিমচন্দ্র 'social ego'তে পরিণত করেছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের মননসাধনা এই পরিবর্তনের এক চমৎকার সিদ্ধি।

রামেন্দ্রসুন্দরের চিন্তাশক্তির জাগরণ এই যুগে বিশেষত ধর্মতত্ত্বের যুগে। তাঁর পরবর্তী রচনায় ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা আছে। মানব-অস্তিত্বকে নানাভাবে বোঝবার উদ্যম আছে। প্রথম দিকের রচনায় তাঁর সেই চেষ্টার পরিচয় বিশেষ পাওয়া যায় না। এই সময় তিনি বিজ্ঞান বিষয়ে প্রবন্ধ লিখছেন মাত্র। যুক্তির শৃঙ্খলা রচনা করবার কৌশল তিনি এই সময়েই আয়ত্ত করেছেন। শোনা যায় কালীপ্রসন্ন ঘোষের ভাষায় প্রথমে তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু অবিলম্বেই বুঝলেন এ দিয়ে তাঁর কাজ হবে না। তাঁর দরকার স্বচ্ছ ঋজু আবেগবর্জিত ভাষা। সেই ভাষা ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের। অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত 'নবজীবন'-এ রামেন্দ্রসুন্দর প্রথম রচনা পাঠিয়েছিলেন। 'সম্পাদকের ছুরিকাঘাতে ক্ষতবিক্ষত' হয়ে সেই রচনাটি প্রকাশিত হল। রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন, এতে তিনি উপকৃতই হয়েছিলেন। সম্পাদক লেখকের উচ্ছ্বাসকে সংযত করেছিলেন। শিক্ষানবিশি যুগে রামেন্দ্রসুন্দর আর-একটা বৈশিষ্ট্য আয়ত্ত করেছিলেন, বিজ্ঞানের যুক্তিশৃঙ্খলার সর্বব্যাপিতায় বিশ্বাস। দর্শন বা ধর্ম-বিষয়ক আলোচনাতেও মিসটিসিজ্‌মকে কি করে বর্জন করতে হয় সেই শিক্ষার দৃঢ় ভিত্তি তিনি পেয়েছিলেন এই যুগে। রামেন্দ্রসুন্দরের চেয়ে দু বছরের বড়ো যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বলেন, পুনরুক্তি দোষ তাঁর প্রবন্ধের ত্রুটি।

'একবার তাঁহার সহিত এ বিষয়ে আমার কথোপকথন হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন "পুনঃপুনঃ না বলিলে, নানাভাবে না বলিলে পাঠকের চিত্তে জ্ঞাতব্য তথ্য অঙ্কিত হয় না।" এ বিষয়ে আমি তাঁহার সহিত একমত হইতে পারি নাই। আমি মনে করি তাঁহার অনুসৃত পন্থায় পাঠকের চিত্তে জ্ঞাতব্য তথ্য সুনির্দিষ্টভাবে অঙ্কিত হয় না।'[১]

রামেন্দ্রসুন্দরের রচনায় বক্তব্যের বিস্তার আছে, এ কথা যথার্থ কিন্তু 'জ্ঞাতব্য তথ্য সুনির্দিষ্টভাবে অঙ্কিত হয় না' এ কথাটা সকলে হয়তো স্বীকার করবেন না। তবে কালীপ্রসন্ন ঘোষের অলংকৃত উচ্ছ্বাস বাদ দিয়ে ভাষাকে বিস্তারিত করবার আলোচনা-ভঙ্গি তিনি গোড়া থেকেই অনুসরণ করে এসেছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের স্টাইল স্বল্পাক্ষর

১ বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭০ 'রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী' পৃ ১৮১

গাঢ়বন্ধ (terse) নয়। সম্ভবত বিজ্ঞানের প্রবন্ধকে অতটা সংযত না করাতেই রচনায় সাহিত্যগুণ আসা সম্ভব হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ পুনরুক্তি-দোষবর্জিত পরিমিত ভাষাসম্পন্ন, যদিও যুক্তিবাদিতার দিক্ দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ও রামেন্দ্রসুন্দর সগোত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্বের আলোচনাতে কোথাও অলৌকিকতার প্রশ্রয় নেই। ধর্মের উপলব্ধি যদি হয় প্রত্যক্ষ কার্যকারণের জগতের বাইরে, তবে সে-ধর্ম সকলের সাধ্য হবে কি করে? সেইজন্যই বঙ্কিম ধর্মকে 'র‍্যাশনালাইজ' করতে গিয়ে প্রখর যুক্তিকে অবলম্বন করেছিলেন। বঙ্কিম বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন বটে, কিন্তু সেগুলি ছিল বালক-পাঠোপযোগী। বিশিষ্ট অর্থে তিনি বৈজ্ঞানিক ছিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র রামেন্দ্রসুন্দরের যুক্তিবাদিতার মধ্যে বড়ো পার্থক্য এই যে প্রথমোক্ত জন শেষের দিকের রচনায় হয়েছিলেন র‍্যাশনালিস্ট মননবাদী আর দ্বিতীয়জন আগাগোড়াই দিলেন অভিজ্ঞতাবাদী এমপিরিসিস্ট। রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের ছাত্র এবং অধ্যাপক। কিন্তু তাঁর বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি সংকীর্ণ ছিল না। বাল্যকাল থেকেই তিনি নানা বিষয় পড়তে ভালোবাসতেন। বিপিনবিহারী গুপ্ত বলেছেন,[১] তিনি ইতিহাস পড়তে ভালোবাসতেন। এণ্ট্রাস পরীক্ষা দেবার আগেই তিনি গ্রীন হিউম গীবন রচিত বড়ো বড়ো ইতিহাস পড়ে ফেলেছিলেন। ইতিহাস-প্রীতির দিক্ দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য গভীর। রামেন্দ্রসুন্দরের যৌবনের রচনায় (১৮৯০-১৯০০) সমাজ জাতি শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ের ভাবনাই বড়ো। 'নানা কথা'য় তাঁর মৃত্যুর পর এগুলি সংকলিত হয়েছে। পাঠকমাত্রই লক্ষ্য করবেন এই প্রবন্ধগুলির বক্তব্য কী গভীর ইতিহাসজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। কোনো কোনো প্রবন্ধে যেমন 'রাষ্ট্র ও নেশন'-এ মূল বক্তব্যটিই ইতিহাসের ব্যাখ্যা। যদিও পরে দর্শন বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতি ব্যাখ্যাতেই রামেন্দ্রসুন্দর পরিপূর্ণ মনোযোগী হয়েছিলেন, কিন্তু জ্ঞান বস্তুটা যে তাঁর কাছে নিছক abstract ছিল না, তাঁর পাণ্ডিত্যের ইতিহাসভিত্তিকতাই তার প্রমাণ।

রামেন্দ্রসুন্দরের যুক্তিবাদিতার প্রধান অবলম্বন ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর দুজন মনীষী, চার্লস ডারউইন এবং হার্বার্ট স্পেন্সার। এই দুই মনীষী ইউরোপে যেমন, আমাদের দেশেও তেমনিই আলোড়ন এনেছিলেন। সেকালে নানা পত্রপত্রিকায় ডারউইনের বিবর্তনবাদের ব্যাখ্যা ও আলোচনা চললেও এক রামেন্দ্রসুন্দর ছাড়া বোধহয় কেউ এই তত্ত্বটিকে জীবনদর্শনের ক্ষেত্রে সেভাবে প্রয়োগ করেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে ডারউইনের প্রভাব সেরকম দেখা যায় না। ডারউইনের প্রতিক্রিয়ায় পাশ্চাত্যে খ্রীস্টান জগতে যে ধরনের আন্দোলন এসেছিল, সে ধরনের চাঞ্চল্য অন্য

১ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত-সম্পাদিত 'আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর' (২ সং) পৃ ৭২

কারণে আমাদের সমাজে হয়তো হয়েছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তার যথাযোগ্য সমাধানও চিন্তা করেছিলেন।[১] কিন্তু সামাজিক বিবর্তনের প্রসঙ্গে তিনি কোমৎ এবং স্পেন্সারকে যতখানি গ্রহণ করেছেন ডারউইনকে ততখানি আমল দেওয়ার প্রয়োজন তিনি বোধ করেন নি। কিন্তু ডারউইনের তত্ত্ব সম্পর্কে বার্ট্রাণ্ড রাসেল যদিও বলেন[২],

Evolutionism in basing itself upon the notion of *progress* which is change from the worse to the better, allows the notion of time, as it seems to me, to become its tyrant rather than its servant and thereby loses that impartiality of contemplation which is the source of all that is best in philosophic thought and feeling.

তবু এ কথাও সত্য বিবর্তনবাদ মানুষের চিন্তাতে শৃঙ্খলা এনে দিয়েছে। বৈজ্ঞানিক রামেন্দ্রসুন্দর স্বভাবতই এর দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হলেন। যোগ্যতমের উদ্বর্তনের তত্ত্বটি নানা প্রসঙ্গেই রামেন্দ্রসুন্দরের রচনায় এসে পড়েছে। তাঁর যা কিছু ব্যাখ্যা এই 'যোগ্যতা'কে নির্ণয় করতেই প্রযুক্ত হয়েছে। 'জীবন যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপন' স্পেন্সারের এই সংজ্ঞা রামেন্দ্রসুন্দরের চিন্তায় ডারউইনের পরিপূরক হিসাবে দেখা দিয়েছে। এই দুই চিন্তাসূত্র আধুনিক মানুষকে সংশয়বাদ অথবা নাস্তিক্যবাদের দিকে টেনে নিয়ে গেল। তরুণ রামেন্দ্রসুন্দর তখন পাশ্চাত্য শাস্ত্র অধ্যয়নরত, তখন স্বভাবতই এই সংশয়বাদ দেখা দিয়ে থাকবে। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের মন্তব্যের তাৎপর্য এখানেই। বিবর্তনবাদকে তুচ্ছ করা যেমন তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, তেমনি বিবর্তনবাদের সঙ্গে নীতিতত্ত্বকে মেলানো ছিল একটা কঠিন সমস্যা। খুব সম্ভবত Thomas Huxleyর *Evolution and Ethics* তাঁকে এ বিষয়ে কিছু সাহায্য করে থাকবে।

রামেন্দ্রসুন্দর সংশয়বাদীই হোন অথবা নাস্তিক্যবাদীই হোন, এই সংশয় যে শূন্যতা নয় এ কথা বোঝা দরকার। যদিও তিনি বিদ্যাসাগর বা কেশবচন্দ্রের মতো কর্মীপুরুষ ছিলেন না তবু সমাজ-কল্যাণের ভাবনা তাঁর জ্ঞানের উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করেছিল। 'নানা কথা'র রচনাগুলি নানা সাময়িক সমস্যা নিয়ে রচিত। সমাজ-ভাবনার দিক দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মিল থাকলেও বঙ্কিমচন্দ্র যেমন একটা নতুন দর্শন গড়ে তুলেছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর তা করতে যান নি, এমন কি পরবর্তীকালের 'কর্মকথা' নামে

১ 'বঙ্কিমচন্দ্র ও পাশ্চাত্য মনীষা' অধ্যায় দ্রষ্টব্য

২ Bertrand Russell, *Mysticism and Logic* নাম-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য

অতি গভীর প্রবন্ধধারা-রচনার সময়েও নয়। বঙ্কিমচন্দ্র কর্মের উপর সবটুকু জোর দিয়েছিলেন, ধ্যান বা ভক্তির উপর ততটা দেন নি। কিন্তু কর্মের আদর্শকে তিনি যেভাবে কল্পনা করেছিলেন, তাতে একটা নতুন 'সিন্থেটিক-ফিলজফি'র সূচনা হয়েছিল। রামেন্দ্রসুন্দরকে সবাই ব্যাখ্যাতাই বলেছেন, কোনো নতুন জীবননীতির স্রষ্টা তিনি নন। 'কর্মকথা' কোনো নতুন সৃষ্টি নয় যদিও ব্যাখ্যার মধ্যে অভিনবত্ব আছে। সেই অভিনবত্ব এই যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের তথ্যচেতনার কিছুমাত্র বিকৃতি না ঘটিয়ে তাই দিয়ে তিনি জীবননীতিকে নির্ধারণ করেছিলেন। তাঁর সমগ্র জীবনের মননপ্রয়াসের মূল উদ্দেশ্যটির কথা তিনি নিজেই বলে গিয়েছেন। বিপিনবিহারী গুপ্ত লিখেছেন[১],—

'কলেজের অবসরকালে কথাপ্রসঙ্গে একবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ছান্দোগ্য উপনিষদে যে ঘোর আঙ্গিরস ঋষির কথা আছে, পুরাণে কিংবা অন্য কোথাও ঐ ঋষির নাম পাওয়া যায় কি? তিনি যে দেবকীনন্দন বাসুদেবকে অমৃতের আস্বাদ দিয়েছিলেন, সেই দেবকীনন্দন বাসুদেবের সঙ্গে গীতার বাসুদেবের কোনো সম্বন্ধ আছে কি? ত্রিবেদী মহাশয় উত্তর দিলেন—অন্য কোথাও তো ঘোর আঙ্গিরস ঋষির নামের উল্লেখ পাই নাই; তবে আমি কিন্তু ঐ দেবকীনন্দন বাসুদেবের সঙ্গে গীতার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখাব।·· একদিন ঐটে অবলম্বন করে Legality ও Moralityর মূল সূত্রে পৌঁছবার চেষ্টা করব।'

বিধি এবং নীতির সূত্র বোঝবার জন্যই রামেন্দ্রসুন্দর কর্মকথার অপূর্ব প্রবন্ধগুলি লিখেছিলেন। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব কোথায়, তার কর্মের স্বাধীনতা কতখানি, সমাজকে স্বীকার করব কেন—এইসব সমস্যাই তাঁর বিশেষ বিচার্য ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এই ধরনের সমস্যা-চিন্তাতেই লিখেছিলেন ধর্মতত্ত্ব, দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন কৃষ্ণচরিত্র ব্যাখ্যা করে। রামেন্দ্রসুন্দরও কল্পনা করেছিলেন কৃষ্ণচরিত্র অবলম্বন করে তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছবেন। কৃষ্ণচরিত্র সত্যই একটি রহস্যজনক চরিত্র। ভারতবর্ষের আরাধ্য এই চরিত্রটিতে বিধি এবং নীতির যে দ্বন্দ্ব আছে তার মীমাংসাতেই আমাদেরই মনীষার একটি গৌরব।

ইংরেজরা প্রথম এলে ইংরেজি শিক্ষার জন্য দেশে গভীর আগ্রহের সঞ্চার হয়েছিল। প্রাচীনপন্থী এবং নবীনপন্থী দুই সম্প্রদায়ই ইংরেজি শিক্ষা পেতে চেয়েছে। এ বিষয়ে যেটুকু সংশয় ছিল ১৮৩৫ই তার অবসান হল। ইংরেজি শিক্ষাকে স্থায়ী করল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রথম দিকে এই শিক্ষাব্যবস্থায় দেশে যথেষ্ট আশা উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল। একদিকে জ্ঞানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করল এই শিক্ষা আর এক দিকে দেশে

১ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, 'আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর' (২ সং)

কিছু জীবিকার সংস্থানও হল। কিন্তু জ্ঞানের দীপ্তি যতই আকর্ষক হুক নিত্যকার প্রয়োজনকে শেষ পর্যন্ত ভুলিয়ে রাখতে পারে না। গত শতাব্দীর শেষের দিকে নৈরাশ্যের সুর প্রকট হয়ে উঠল। রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন[১]—

'তাহাদের অধিকদিন গত হয় নাই। কিন্তু ইহার মধ্যেই বায়ু প্রতিকূল মুখে ফিরিয়াছে। চারিদিকেই এখন হতাশের আক্ষেপ। বিলাতি বিদ্যা এ দেশে ফলিল না। প্রাচীনপন্থীরা বলিতেছেন, ইংরাজি শিখিয়া ছেলেগুলা কেবল সহবৎ বর্জিত হইতেছে, ধর্মজ্ঞানশূন্য হইতেছে, নাস্তিক হইতেছে। রাজপুরুষেরা বলিতেছেন, ইহারা কেবলই চাকরি চাহিতেছে ও চাকরি না পাইলে সংবাদপত্র বাহির করিয়া দেশ-মধ্যে অসন্তোষের বীজ ছড়াইতেছে।'

শিক্ষা সম্বন্ধে দেশে তখন আলোচনা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। শিক্ষাবিধির সংস্কার যে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, অনেকেই এ কথা বুঝতে পারছেন। পুথিগত ইংরেজি শিক্ষার উপর জোর না দিয়ে শিক্ষাকে মাতৃভাষার সাহায্যে হৃদয়গত করে তোলার দরকার হয়ে পড়েছে। ১২৯৯ সালের পৌষ মাসের 'সাধনা' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধ লেখেন। বঙ্কিমচন্দ্র গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আনন্দমোহন বসু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একমত হয়ে তাঁকে পত্র দেন। শিক্ষা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মূল তত্ত্ব রামেন্দ্রসুন্দর স্বীকার করে নিয়েছিলেন। বঙ্কিমের ধর্মতত্ত্ব বইটা শিক্ষার আদর্শ নিয়েই মূলত রচিত। শিক্ষা এমন হওয়া উচিত যাতে মানবিক বৃত্তি-গুলির সামঞ্জস্যপূর্ণ স্ফুরণ ঘটে। এভাবে বিকাশপ্রাপ্ত মানুষই সমাজকে শক্তিশালী করবে। বঙ্কিমচন্দ্র specializationএর পক্ষপাতী ছিলেন না।[২] রামেন্দ্রসুন্দর বঙ্কিমের মতানুবর্তী হয়ে লিখেছেন[৩]—

'উপরে যাহাকে লিবারাল এজুকেশন বলিয়াছি সমগ্র চিত্তবৃত্তির সর্বাঙ্গীণ স্ফূর্তি সাধনই বোধ করি উহার প্রকৃত তাৎপর্য; এবং তাহাই যদি হয় তাহা হইলে উহার বিরুদ্ধে বলিবার কিছুই থাকে না। আজকাল শাস্ত্রবিশেষে ব্যুৎপত্তি অর্থাৎ specializationএর একটা ধুয়া উঠিয়াছে কিন্তু একটা বিষয়ে সে বিষয়টা যতই গুরু হউক না একটা বিষয়ে আবদ্ধ থাকিলে সংকীর্ণতা ও একদেশদর্শিতার প্রশ্রয় হয় তাহাতে সন্দেহ নাই এবং একদেশদর্শিতা ও সংকীর্ণতা ব্যক্তিগত বলবুদ্ধির পক্ষে যতই

১ নানা কথা, 'সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার' (১৩০৬) পৃ ১৩০। রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধের পরিপূরক আর একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'ব্যাধি ও প্রতিকার' (১৩০৮)

২ ধর্মতত্ত্ব, নবম অধ্যায়।

৩ নানাকথা, অরণ্যে রোদন পৃ ১৫৯

অনুকূল হউক না কেন সমস্ত জাতির সাধারণ শিক্ষায় উহা জাতীয় বলবৃদ্ধির বা মনুষ্য-বৃদ্ধির অনুকূল হইতে পারে না।'

এখানে তিনি সমগ্রভাবে জোর দিয়েছেন জাতিগঠনের উপর। অথচ ব্যক্তিত্ব সৃষ্টিকেও অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেন না[১]—

'যে ব্যক্তি যে পথে গেলে শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিবে, তাহাকে সেই পথে যাইতে স্বাধীনতা দিলে তবেই সে যথাযথ শক্তিসঞ্চয়ের অবসর পাইবে; নতুবা একটা কাল্পনিক সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ আদর্শ খাড়া করিয়া অন্ধ খঞ্জ মূক বধির সকলকেই নিজ নিজ স্বাভাবিক বিকৃতি ও হীনতা হইতে মুক্ত করিয়া সেই আদর্শের গঠন দিতে গেলে অনর্থক পরিশ্রম ভিন্ন বিশেষ ফল লাভ হইবে না।'

'ব্যক্তির জন্য সমাজ' এবং 'সমাজের জন্য ব্যক্তি' এই দুই মতের পর্যালোচনা করতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন[২]—

'ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক বিষয়ে দুইটা পরস্পর বিপরীত থিয়োরী প্রচলিত আছে। একটার ইংরাজি নাম individualism ব্যক্তিতন্ত্রতা আর একটার নাম socialism সমাজতন্ত্রতা। একদল বলেন ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ও স্বতন্ত্রভাবে স্ফূর্তিলাভ করিতে দাও; সমাজের যে-ব্যবস্থা ব্যক্তিগত স্ফূর্তির অনুকূল তাহাই বজায় রাখ; তবে কিনা সমাজ না থাকিলে ব্যক্তির উন্নতি নাই; সেইজন্য সমাজ রাখিবার জন্য যতটুকু দরকার সমাজের খাতিরে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের ততটুকু সঙ্কোচন কর। এই মতের একজন প্রসিদ্ধ প্রচারক সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সার। অন্য পক্ষ বলেন যখন সমাজের কুশলের উপরেই ব্যক্তিগত কুশল সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত তখন সমাজের মঙ্গলার্থ ব্যক্তিকে আপনার স্বার্থ সম্পূর্ণ বিসর্জনের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে বইবে। তজ্জন্য ব্যক্তিকে সর্বতোভাবে সমাজের অধীন রাখিতে হইবে।'

এই বিপরীত মতের মধ্যে সামঞ্জস্য করে রামেন্দ্রসুন্দর বলছেন[২]—

'কোন শিক্ষানীতি উৎকৃষ্ট এখন কি আর খুলিয়া বলা আবশ্যক? উহাই প্রকৃত শিক্ষানীতি যাহা প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার সমাজের তাহার রাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষণে সম্যকরূপে সমর্থ করে। সেই শিক্ষাই শিক্ষা যে শিক্ষা প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত দৌর্বল্য দূর করিয়া প্রত্যেকের ব্যক্তিগত প্রবৃত্তির বলাধান করিয়া প্রত্যেকের ব্যক্তিগত শক্তির স্ফূর্তি সাধন করিয়া তাহাকে সমাজের বা রাষ্ট্রের জন্য উপযোগী করে।'

১ নানাকথা, অরণ্যে রোদন পৃ ১৬০
২ পূর্বোক্ত

ব্যক্তি ও সমাজ কোনোটাকেই লঘু না করলেও তাঁর ঝোঁকটা সমাজতন্ত্রের দিকেই এটা বোঝা যায়। রামেন্দ্রসুন্দরের মতো বহুশ্রুত মনীষী যিনি বিজ্ঞানের নৈর্ব্যক্তিক সংস্কারমুক্ত শিক্ষা পেয়েছেন তাঁর পক্ষে স্বাধীন চিন্তার প্রতি প্রবণতা থাকাই স্বাভাবিক। স্বাধীন চিন্তাই মানুষকে ব্যক্তিতন্ত্রবাদী (individualist) করে তোলে। রামেন্দ্রসুন্দর কি এই প্রত্যাশার ব্যতিক্রম? উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকটায় সমষ্টির কল্যাণ-চিন্তাই সকলের সব উদ্যমের মূল ছিল। রামেন্দ্রসুন্দরও এই সমষ্টি-চিন্তা দ্বারাই চালিত হয়েছিলেন। কিন্তু এর মধ্যেও একটু লক্ষ্য করবার বিষয় আছে। রামেন্দ্রসুন্দরের উক্তি থেকেই বোঝা যায় সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে তিনি পার্থক্য করতে পারছেন না। এটা চিন্তার শৈথিল্য নয়। বস্তুতই প্রাচীন সমাজের শক্তি ক্ষয় হয়ে রাষ্ট্রের শক্তি বেড়ে চলেছে। সংকীর্ণ অর্থে সামাজিকতার চেয়ে জাতীয়তাবোধই আমাদের ইহচেতনার পুরোভাগে এসে দাঁড়াচ্ছে। সমষ্টিবোধ অর্থে এখন সত্যই আর বিশেষ সম্প্রদায়-চেতনাকেই বোঝায় না। রাজনৈতিক চেতনার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই এটা ঘটেছে। ব্যক্তিতন্ত্র অর্থে অথরিটির নির্দেশমুক্ত মনস্বিতাকে বোঝালেও বৃহত্তর জাতীয় কল্যাণকে লক্ষ্য করেই তার বিকাশ ঘটে থাকে। রামেন্দ্রসুন্দর শাস্ত্রের সূত্র ধরে বিচার করেন নি, করেছেন ইতিহাসের সাক্ষ্যকে প্রামাণ্য করে। এ যুগের বুদ্ধিবাদীদের মতে তাঁর চিন্তাধারা সংস্কারমুক্ত নয়। তাঁর বিচারবোধকে সংযমিত করেছে একটা সীমা, তার নাম জাতীয়তা। রামেন্দ্রসুন্দরের যুগে এই সীমাকে লঙ্ঘন করে বাঙালী মনীষা অগ্রসর হয় নি। এ বিষয়ে অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথকে মনে রাখলেই চলে, বিপিনচন্দ্র পাল বা অন্যান্যের কথা ছেড়ে দিলেও। রবীন্দ্রনাথ পরের যুগে আরও অগ্রসর হয়েছিলেন সত্য কিন্তু যে সময়ের কথা বলছি সে সময়ে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে মুক্ত হলেও সীমাবদ্ধ ছিলেন জাতীয়তাবোধে। জাতীয়তাবোধ আর সাংস্কৃতিক গৌরববোধ প্রায় ছিল একার্থক। বিশেষত ব্যবহারিক জীবনে মোহমুক্তি ঘটলে সাংস্কৃতিক মর্যাদার উপরেই জাতিগত মহত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ ব্রাহ্মণ্যগৌরব, 'বর্ণাশ্রমধর্ম' ত্যাগধর্ম প্রভৃতির উপর জোর পড়েছে। 'সাধনা' 'বঙ্গদর্শন' 'ভাণ্ডার' প্রভৃতি পত্রিকার সহযোগিতায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি উদ্যমে রামেন্দ্রসুন্দর তখন ঘনিষ্ঠ কর্মসহচর। বর্ণাশ্রম ধর্মের আলোচনাতে রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সকলেই মেতে উঠেছেন। ব্রহ্মবান্ধব বঙ্গদর্শনে (১৩০৮ বৈশাখ) 'হিন্দুজাতির একনিষ্ঠতা' প্রবন্ধ লিখে বর্ণাশ্রম ধর্মের মহিমা কীর্তন করলেন। রামেন্দ্রসুন্দর ওই পত্রিকাতেই ওই বৎসরেই চৈত্র মাসে প্রবন্ধ লিখলেন বর্ণাশ্রম ধর্ম এবং এই সময়ে

একাধিক প্রবন্ধে এর স্বপ্ন রচনা করলেন রবীন্দ্রনাথ। অবশ্য যুগের পরিবর্তনে প্রাচীন বর্ণাশ্রম ধর্মকে কিছু বদলে নেওয়া হল মাত্র।

এ সবই উল্লেখযোগ্য মনে করেছি এই জন্য যে স্বাধীন চিন্তা বলতে আজ আমরা যা বুঝি তখন হয়তো সেটা বোঝাত না। এ বিষয়ে সে কালের মনস্বী লেখক অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের সংজ্ঞাটি প্রণিধানযোগ্য[১]—

'যদি কেহ বলেন ধর্মজ্ঞান তাহারই নাম যাহা ভিতরে থাকিলে ঐ কথাগুলির অর্থ বোঝা যায়— কোনটি আপনার ধর্ম ও আপনার শাস্ত্র তাহা চেনা যায় এবং তাহা আপনার জীবনে প্রয়োগ করিতে পারা যায় তাহা হইলে কথাটা কি নিতান্তই অসঙ্গত হইবে? ইহারই নাম স্বাধীনচিন্তা এবং সে শিক্ষা ও সাধনে যে "অনুশীলনে" এই স্বাধীনচিন্তার স্ফুরণ হয় তাহাই যথার্থ ধর্মশিক্ষা ও সাধন, তাহাই অনুশীলন ধর্ম।'

আজকাল স্বাধীন চিন্তা বলতে বোঝায় মুক্তসঙ্গ বন্ধনহীন চিন্তা। বিচার করে একটা ধর্মকে স্বীকার করে নেওয়াই সেকালে স্বাধীন চিন্তার লক্ষণ। বিনয়েন্দ্রনাথের উক্তিতে বঙ্কিমের অনুশীলন ধর্ম স্বাধীন চিন্তার ফল। রামেন্দ্রসুন্দরও এমনি করে আদর্শ স্থির করে নিয়েছিলেন। নির্বিশেষ বৈজ্ঞানিকতা ও জাতীয় গর্ববোধের যে মিলন তাঁর মধ্যে হয়েছিল এ যুগের পাঠকেরা তা লক্ষ্য না করে পারবেন না। সে সময়ের ভাবুকদের এমন কি বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রকেও মনে পড়ে।

যে সময়ে 'নানা কথা'র প্রবন্ধ রচিত হচ্ছিল প্রায় সেই সময়কার রচনা 'জিজ্ঞাসা'। 'জিজ্ঞাসা' ভিন্নজাতের রচনা। এর বিষয়বস্তু এবং উপস্থাপন-পদ্ধতি দুইই ভিন্নতর। নিছক দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে লেখা এই বইতে রামেন্দ্রসুন্দরের লেখক-ব্যক্তিত্ব নতুন ধরনের। কোনো ব্যবহারিক প্রয়োজনভাবনাতে লেখা নয় বলে এই শ্রেণীর প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর এমন একটি নিরপেক্ষ সমদর্শী নৈর্ব্যক্তিক চেতনার পরিচয় দিয়েছেন যা বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় রচনায় স্বভাবতই কোনো রঙ থাকে না, কারণ বিজ্ঞানেরই কোনো রঙ নেই। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের রচনা সূর্যের রশ্মির মতো বিচিত্র বর্ণসমন্বিত হয়ে বর্ণাতীত। তুলনাটা নেহাৎ কবিত্ব নয়। এই লেখাগুলি পড়লেই দেখা যাবে বক্তব্যের এক একটা দিকের উত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে করুণ হাস্য শান্ত এমন কি আদিরসের ইশারা এসে রচনার মধ্যে লেখকের সপ্রতিভ বহুদর্শী জ্ঞানগর্ভ মনটি সঞ্চারিত করেছে। দৃষ্টান্ত স্থাপনে আকস্মিক ভাবে

১ নবপর্যায় বঙ্গদর্শন ১৩১৩ আষাঢ়, বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, 'বর্তমান যুগের স্বাধীনচিন্তা', পৃ ১১৭

সাহিত্য ইতিহাস বিজ্ঞান সমাজতত্ত্ব প্রভৃতির সাহায্য নেওয়ায় পাঠকের মনোযোগটি সজাগ থাকতে বাধ্য হয়, লেখকের মনটি অত্যন্ত আকর্ষক হয়ে ওঠে। নানা দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যাকে দেখার ফলে বিজ্ঞান বা দর্শনের তথ্যও এক এক ভাবে বর্ণিত হওয়ায় রচনার মধ্যে বহু ভাব এসে যায় বটে কিন্তু এসব মিলিয়ে লেখক-মনটি সব কিছুকে অতিক্রম করে এক অসাধারণ নির্বিকার নিরপেক্ষতা লাভ করে। রামেন্দ্রসুন্দরের স্টাইল-এর রহস্য এই। 'কোনো মিসটিক তত্ত্ব নয়— জগতের সব কিছুই মানুষেরই জ্ঞানবৃত্তির আয়ত্তে'—এই আশ্বাসে রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধগুলি উজ্জ্বল। 'নিয়মের রাজত্ব' প্রবন্ধটি হচ্ছে বৈজ্ঞানিক রামেন্দ্রসুন্দরের বাণী। জগতে কোথাও অনিয়ম নেই, মির‍্যাক্‌ল্ মানুষের কল্পনা মাত্র, যেখানে মানুষ বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারেন নি, সেখানে সে মিরাক্‌লে বিশ্বাস করেছে— সংকীর্ণ বুদ্ধির অচলায়তন ভেঙে পড়লেই সেই রহস্যও নিয়মের বাহুবন্ধনে ধরা দেবে। জগতের যে অতলস্পর্শ রহস্যের দিকে তাকিয়ে মানুষ স্তব্ধ হয়েছে, আসলে তা-ও বিজ্ঞানবন্দী হওয়ার প্রতীক্ষায় আছে মাত্র। এই বিশ্বাস রামেন্দ্রসুন্দরের রচনায় ছড়িয়ে আছে, এরই স্পর্শে পাঠকের মানসিক শক্তি যেন বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। জ্ঞানই যে শক্তি, বাংলা সাহিত্যে সম্ভবত আর কোনো সাহিত্যিকের প্রবন্ধ পাঠে এ রকম বোধ আসে না। যিনি জ্ঞানের ভিতর দিয়ে সৃষ্টিকে বুঝেছেন তিনি অসীম শক্তিতে শক্তিমান্ হয়ে উঠেছেন। (রামেন্দ্রসুন্দরের রচনায় যে বলিষ্ঠ ঋজু চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়, তা যেন তাঁর অকলঙ্ক আত্মারই বিস্ফুরিত দীপচ্ছটা। সে আত্মা শুধুই জ্ঞানময়। জীবনে তাঁর অভিযোগ নেই, সন্দেহ নেই, সংশয় নেই, সবই সুপরিচ্ছন্ন, সুবিন্যস্ত।) সেই সত্য সব সময় আমাদের আকাঙ্ক্ষিত কল্যাণবোধকে তৃপ্ত হয়তো করে না, কিন্তু জগতের সত্য হয়তো ভিন্নতর এবং তা দারুণ করুণ। মুক্তদৃষ্টিতে জ্ঞানী তারই দিকে অপলকে তাকিয়েছেন, নির্মল তাঁর দৃষ্টি, নির্ভীক দুঃসাহস তাঁর মনে; অপাপবিদ্ধ আত্মাকেই তিনি ভাষাময় করেছেন। সম্ভবত এইরূপ জ্ঞানীর অমলিন সত্তার কথাই উপনিষদে বলেছেন—

প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে।
আত্মনা বিন্দতে বীর্যং বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্।[১]

এ কথা সত্য রামেন্দ্রসুন্দরের মনীষার যে পরিবেশগত পটভূমি বোঝাবার চেষ্টা আমরা করছি জিজ্ঞাসার মধ্যে তা আমরা পাব না। 'জিজ্ঞাসা' রামেন্দ্রসুন্দরের নিভৃত-চিন্তা, তার কোনো বহির্গত সামাজিক তাৎপর্য নেই। তবে য়ুরোপের অষ্টাদশ শতাব্দীর Nature এবং Law-র আরাধ্যতার ফলে যে সংশয়বাদ এসে গিয়েছিল,

১ দেশ ১৯৫২, ২১ এ জুন: 'বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য

আমাদের সাহিত্যে রামেন্দ্রসুন্দরের রচনায় পাই তারই প্রতিরূপ। প্রকৃতি আর নীতিই ছিল রামেন্দ্রসুন্দরের ভাবনার প্রধান বিষয়। যোগেশচন্দ্র রায় বলেছেন[১]

'তাঁহার "জিজ্ঞাসা"র প্রবন্ধগুলি পড়িলে মনে হয় তিনি প্রকৃতির বিজ্ঞান হইতে সার সংগ্রহে আনন্দ পাইতেন। তিনি যখন এই সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তখন এই সকল বিষয়ই বৈজ্ঞানিকদের চিত্ত অধিকার করিয়াছিল। সে সময়ে আমারও অনেক প্রবন্ধের বিষয়বস্তু এই প্রকার ছিল। কেহ কেহ মনে করিয়াছেন বিজ্ঞান বুঝি দর্শনের বিরুদ্ধধর্মী। কিন্তু বিজ্ঞানই দর্শনের প্রথম সোপান এবং দর্শনই বিজ্ঞানের পরিণতি। রামেন্দ্রসুন্দরে বিজ্ঞান ও দর্শনের অপূর্ব সমন্বয় হইয়াছিল।'

'জিজ্ঞাসা'তে দুই শ্রেণীর প্রবন্ধ আছে, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক। দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনায় বস্তুজগতের বিধি নিয়ম কার্যকারণের ব্যাখ্যা আছে, প্রথম শ্রেণীর প্রবন্ধে তেমনি আছে মানুষের বেঁচে থাকার কতকগুলি মূল্যমান বিশ্লেষণ। 'সুখ না দুঃখ' 'অমঙ্গলের উৎপত্তি' 'আত্মার অবিনাশিতা' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলিতে মানব-অস্তিত্বের মৌলিক বিশ্বাস ও আশ্রয়কেই বোঝবার চেষ্টা হয়েছে যদিও এর কোনো গাণিতিক সিদ্ধান্ত নেই। 'নানা কথা'র রচনায় রামেন্দ্রসুন্দর সর্বজনস্বীকৃত মূল্যমানকে স্বতঃসিদ্ধরূপে মেনে নিয়েই যুক্তিক্রমকে অতিক্রম (deduction) করেছিলেন। 'জিজ্ঞাসা'য় তিনি ডেকার্টের মতো একেবারে প্রথম থেকে আরম্ভ করে নানা মতের স্থাপনা করে একটা নৈতিক ঐক্য সন্ধান করেছেন। যদিও সেই ঐক্যটিকে পান নি কিন্তু বিচারের যে পদ্ধতি তিনি আয়ত্ত করেছেন সেটি মূল্যবান। ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতার উপরে দাঁড়িয়েই তিনি জীবনকে বোঝবার চেষ্টা করেছেন। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব প্রকৃতির শৃঙ্খলার তত্ত্ব স্পেন্সার ডারউইনের অভিব্যক্তির তত্ত্ব—এই বৈজ্ঞানিক নীতি-গুলির উপর তাঁর আস্থা দৃঢ়।

'আমার আত্মবিকাশের সহিত আমার জগতের পরিধি বাড়িতেছে, দেশের সীমারেখা ও কালের সীমারেখা দূর হইতে আরও দূরে ক্রমে সরিয়া যাইতেছে। জগতের নিয়মের প্রতিষ্ঠা দৃঢ়ীকৃত হইতেছে। যাহার নিকট নিয়মের প্রতিষ্ঠা আছে তাহার আত্মা সুস্থ বলিষ্ঠ ও সামর্থ্যবান। যাহার নিকট নিয়মের প্রতিষ্ঠা নাই সে বাতুল বা পাগল।'[২]

এই প্রসঙ্গে আর একজন বৈজ্ঞানিক-দার্শনিকের উক্তি তুলনীয়[৩]—

১ যোগেশচন্দ্র রায়ের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ

২ 'জিজ্ঞাসা', 'সৃষ্টি'

৩ Bertrand Russell, *A Freeman's Worship*

The life of Man, viewed outwardly, is but a small thing in comparison with the forces of Nature. The slave is doomed to worship Time and Fate and Death, because they are greater than anything he finds in himself and because all his thoughts are things which they devour. But, great as they are, to think of them greatly, to feel their passionless splendour, is greater still. And such thought makes us free man ; we no longer bow before the inevitable in Oriental subjection, but we absorb it, and make it a part of ourselves.

যথার্থ জ্ঞানী যিনি আত্মিক বলে তিনি যে কতখানি বলীয়ান হতে পারেন এই দুই মনীষীর অন্ধতাহীন যুক্তিবাদিতাতেই তা প্রমাণীকৃত। 'জিজ্ঞাসা'য় রামেন্দ্রসুন্দর এই পর্যন্তই পৌঁছেছেন। এর পর যেতে হলে প্রত্যক্ষ অনুভূতির সীমা পেরিয়ে অধ্যাত্ম-লোকের মিস্টিসিজ্‌মের দিকে যেতে হয়। বৈজ্ঞানিক রামেন্দ্রসুন্দরের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। অথচ আত্মার পিপাসা এখানেই মেটে না। জীবনের অর্থ ব্যাখ্যা করাই বড়ো কথা নয়, বড়ো হচ্ছে আশা ও আশ্বাসকে জাগিয়ে তোলা। মানুষ নানাভাবে একেই খোঁজে। দেশপ্রেমিক শিল্পী ধার্মিক এমন কি ভোগীও নিজের নিজের দিক্‌ দিয়ে একটা কোনো মূল্যমানকে স্থির করে নেয়। বিজ্ঞান কোনো নৈতিক মূল্যমানকে দেয় না; জড়জগৎকে ব্যাখ্যা করে মাত্র। দর্শন ব্যাখ্যা করে তত্ত্বের জগৎকে। এজন্য এই দুই শ্রেণীর ব্যক্তিই ব্যবহারিক জগৎ সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়ে। এই জগৎকেই বলিষ্ঠরূপে গড়ে তোলার দিকে, এঁদের মনোযোগ নেই। এতে কল্যাণ-অকল্যাণের ভাবনা নেই, জীবনাচরণের নৈতিক চেতনা নেই। 'লিগালিটি' এবং 'মরালিটির সম্পর্ক নির্ণয় করবার প্রসঙ্গ রামেন্দ্রসুন্দর এই সময় থেকেই করেন।

বৈজ্ঞানিক ভিত্তিকে অটুট রেখে মিসটিসিজ্‌মকে বর্জন করে একটা মহৎ আদর্শ-বাদের বলিষ্ঠ সৌধ রামেন্দ্রসুন্দর গড়ে তুলেছেন 'কর্মকথা'য়। মরালিটি বস্তুটা উপদেশের আকারে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ সেটা একটা ইনটুইশনের মতো। যে বিশ্বাস করল, সে অন্ধভাবেই বরণ করল, আর যে করল না তাকে মানানোর যুক্তি নেই। কিন্তু বাইরের এই জড়জগতের বিশ্লেষণে 'মরাল' নীতি যদি স্বতঃপ্রমাণিত হয়ে যায় তবে তো আর কোনো সংশয়ই থাকে না। দর্শনের বিচারণা এবং বিজ্ঞানের বিশ্লেষণের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দর একটি মাত্রই সমন্বয়ের সেতু খুঁজে পেয়েছিলেন তার নাম কর্মবাদ। রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন, 'আমার বিশ্বাস কর্মকাণ্ডে ও জ্ঞানকাণ্ডে সে বিরোধ দেখা যায়

সেই বিরোধের মূলে সামঞ্জস্য আবিষ্কার ভগবদ্গীতায় ঘটিয়াছে। Legality ও morality এই উভয়বিধ বিরুদ্ধ ধর্মের মূলগত ঐক্যসংস্থাপনে ও সমন্বয়সাধনে গীতার মাহাত্ম্য।' ('কর্মকথা'র ভূমিকা) তিনি অবশ্য গীতাকে অবলম্বন না করে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে অগ্রসর হয়েছেন। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র থেকে প্রমাণ বা দৃষ্টান্ত আনার তাঁর দরকার হয় নি। তাঁর অবলম্বন তিনি পেয়েছিলেন বিজ্ঞানেই। বস্তুত জগতের অবশ্যম্ভাবী নীতিনিয়মের প্রতি অবিচল বিশ্বাস থেকেই কর্মের অপরিহার্যতার উপলব্ধি তাঁর এসেছিল। জীবনটা যে একটা বিরোধ, সামঞ্জস্য-স্থাপনই যে জীবনের ধর্ম, মানুষকে যে আত্মরক্ষার জন্য যোগ্যতম হয়ে উঠতেই হচ্ছে, এই সব পাশ্চাত্য সমাজতত্ত্ব ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের দ্বারাই রামেন্দ্রসুন্দর তার যুক্তির শৃঙ্খলা স্থির করে নিয়েছিলেন। বৈরাগ্যের ব্যর্থতা যেমন তিনি ঋজু ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছেন তেমনি ঋজু গভীর ভাষায় অনুভব করিয়ে দিয়েছেন জগতের মহানিয়তিকে। ধর্ম বলতে এই নিয়তিকেই বোঝায় যার অন্য নাম ঋত বা Law। ধর্মের জয় মানে এই আব্রহ্মস্তম্বব্যাপী 'Scheme of things' এর জয়। যিনি 'নিয়মের রাজত্ব' লিখেছেন তিনি যে নিয়ম ছাড়া আর কিছুই মানেন না, 'কর্মকথা' পড়লে সেটাই আরো গভীরভাবে মনের মধ্যে মুদ্রিত হয়। ঈশ্বর নামক নিয়তিকৃত-নিয়মরহিত রহস্যময় শক্তির প্রসঙ্গ রামেন্দ্রসুন্দর একবারও আনেন নি। অথচ কর্মের ভিতর দিয়ে আত্মচরিতার্থতা, মানবসেবার ভিতর দিয়ে জাতি ও ধর্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তাবোধ সমাজের প্রতি কর্তব্যপালনে ব্যক্তিত্বের বিকাশ —এ সব দিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর অস্তিত্বের একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি এঁকেছেন, যার কোথাও সহজ ভাবালুতার রঙ দিয়ে পূরণ করতে হয় নি। 'কর্মকথা' পড়ে, লেখক ঈশ্বরবাদী, এমন সিদ্ধান্ত করা যায় না। যদি রামেন্দ্রসুন্দরের কল্পিত 'ধর্ম' যাকে তিনি মহানিয়তি বলেছেন, তাকেই ঈশ্বরের নামান্তর বলে ধরা যায়, তবে ভক্তেরা হয়তো সন্তুষ্ট হবেন কিন্তু এই নিয়তি একটা অন্ধ শক্তি—এটা তাঁরা ভুলে থাকতেই চাইবেন। এই শক্তি আপনার নিয়মশৃঙ্খলায় আপনি বদ্ধ। 'Inscrutable power of nature' এই সংজ্ঞাকে রামেন্দ্রসুন্দর ভিন্নভাবে হলেও মেনে নিয়েছেন। বুদ্ধিবাদী রামেন্দ্রসুন্দরের পক্ষে এ ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না।

'আমরা যখন যথা ধর্ম তথা জয় এই নীতিবাক্যের উল্লেখ করি তখন আমরা সেই অদৃশ্য দুর্বোধ্য জগদ্বিধানকেই লক্ষ্য করিয়া উল্লেখ করি।'

মানুষকে যে কর্মানুষ্ঠান করতে হয় সে এই জগদ্বিধানেরই দুর্জ্ঞেয় নির্দেশে। কর্মের দ্বারাই ব্যক্তি সমাজ দেশ জগৎ রক্ষা পায়। কিন্তু কোন কর্ম কর্তব্য কোন কর্ম

১ 'কর্মকথা', 'ধর্মের জয়'

অকর্তব্য—এটা কি করে ঠিক করা যাবে? বঙ্কিম এখানে 'ইউটিলিটি' বা হিতবাদের আশ্রয় নিয়ে অঙ্ক কষেছিলেন।[১] রামেন্দ্রসুন্দর হিতবাদকে স্বীকার করতে পারেন নি। তিনি 'কল্পব্যাপিনী শিক্ষায় ও অভিজ্ঞতায় উপার্জিত' শ্রুতি ও স্মৃতির উপরেই নির্ভর করা নিরাপদ মনে করেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি বলছেন শ্রুতি-স্মৃতি যেখানে সংশয় নিরসন করতে পারে না সেখানে নির্দেশ নিতে হয় বিবেকের কাছে 'ইংরেজি ভাষায় যাহাকে বলে Conscience—বাঙ্গালায় যাহার নাম দিতে পারি সহজ ধর্মপ্রবৃত্তি।' এখানেও বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের উক্তিটিই স্মরণীয়।

'কর্মকথা'র বৈশিষ্ট্য এখানেই যে ধর্মকল্পনার সাবলিমিটির ফলে ব্যক্তিচেতনা যেমন জ্ঞানের দিক্ দিয়ে সঙ্কুচিত হয়ে আসে, তেমনি কর্মের দিক্ দিয়ে প্রসারিত হয়। বিশ্বের মধ্যে যে কর্মশৃঙ্খলা আছে তারই আকর্ষণে ব্যক্তিকে কর্মলিপ্ত হতে হয়। নিজেকে ক্ষয় করেই বিশ্বনীতির চরিতার্থতা করতে হয়, তারই নাম যজ্ঞ। রামেন্দ্রসুন্দর বিশ্বের সঙ্গে ব্যক্তির সামঞ্জস্য-স্থাপনে জীবনের ধর্ম ও নিয়তিকে দেখেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রও ব্যক্তি ও সমাজ, সমাজ ও দেশ, দেশ ও বিশ্ব, বিশ্ব ও ঈশ্বরপ্রীতি এদের সামঞ্জস্যে দেখেছিলেন ধর্মকে।

একথা মনে রাখা দরকার, রামেন্দ্রসুন্দরের 'কর্মকথা' আধুনিক বাঙালীর মননধারার একটি পরিণতিরূপে এসেছিল। 'কর্মকথা' একটা যুগের জ্ঞান ও যুক্তিসাধনার বাণী বহন করছে। গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন পর্যন্ত চলে এসেছে কর্মের সাধনা। মনীষীরা চেয়েছেন কর্মের উদ্দীপনাকেই জাগাতে। নতুন যুগের সঙ্গে সঙ্গে কর্মের ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে। এককালে কর্ম বলতে সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানকেই বোঝাত। সম্প্রদায়বন্ধনকে মানুষ অতিক্রম করতে যাচ্ছে। এখন কর্মের পথ নানাদিকেই ধাবিত। স্বভাবতই নতুন করে ধর্মতত্ত্বকে ব্যাখ্যা করতে হয়েছে। রামেন্দ্রসুন্দর তাই করেছেন। 'নানা কথা'র প্রবন্ধে সেকালের সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তব্য নিয়ে তিনি আলোচনা করেছিলেন। সেখানে দেখা গিয়েছে সমাজ ও রাষ্ট্রকে তিনি প্রায় একার্থবাচক করে ফেলেছেন। সত্য সত্যই তখন সম্প্রদায়দীর্ণ এক জাতীয়

১ 'মনে কর একদিকে একজনের যে পরিমাণে হিত সাধিত হইতে পারে, অন্যদিকে শতজনের প্রত্যেকের চতুর্থাংশের এক অংশ সাধিত হইতে পারে। এস্থলে এই শতজনের হিতের অঙ্ক $\frac{১০০}{৪} = ২৫$। এখানে একজনের বেশী হিত পরিত্যাগ করিয়া শতজনের অল্প হিতসাধন করাই ধর্ম। পক্ষান্তরে, যদি এই শতজনের প্রত্যেকের হিতের মাত্রা চতুর্থাংশ না হইয়া সহস্রাংশ হইত, তাহা হইলে ইহাদিগের সুখের মাত্রার সমষ্টি একজনের $\frac{১}{১০}$ মাত্র। সুতরাং এ স্থলে সে শত ব্যক্তির হিত পরিত্যাগ করিয়া এক ব্যক্তির হিত সাধন করাই ধর্ম।' ধর্মতত্ত্ব ২২ অধ্যায়।

সমাজের ধারণা গড়ে উঠছিল। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধটি অনেকের মনে আসবে।

'কর্মকথা'য় রামেন্দ্রসুন্দর আসলে 'সমাজ' কথাটার সুস্পষ্ট অর্থ নির্দেশ করেন নি। নৈর্ব্যক্তিক আলোচনা থেকে এটাও বোঝার উপায় নেই, সমাজ বলতে হিন্দু-সমাজকেই বোঝাচ্ছে কিনা। সাধারণ অর্থে সমাজ বলতে মানবসমাজকে বোঝাতে পারে। 'কর্মকথা'তে তিনি মানুষ মাত্রেরই বৃহত্তর পটভূমির সঙ্গে যোগ নিত্যস্মরণীয় রেখে আপন আপন পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কের বাধ্যতাকে বিচার করেছেন। এই বিচারে হিন্দু বা অন্য ধর্মাবলম্বীর নিজের নিজের ধর্মের প্রতি কর্তব্য পালন করেও কি করে ক্ষুদ্রতাকে চিন্তা ও অনুভূতি দ্বারা অতিক্রম করা যায় তার ইঙ্গিত ধ্বনিত হয়েছে। কর্তব্য পালন করতে গেলে কতকগুলি আচার পালন করতেই হয়। আচারের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর ধর্মীয় আচারের স্পষ্ট উল্লেখ করেন নি। দেশে এবং কালে আচারের পরিবর্তন ঘটে। রামেন্দ্রসুন্দর বলেন আচারই সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির যোগরক্ষার উপায়। তিনি বলেন[১]—

'আমার বিশ্বাস এই যে ব্যক্তিজীবনের প্রত্যেক অশোভন অসুন্দর স্বাভাবিক অনুষ্ঠানকে মহত্তর সমাজ-জীবনের সহিত কৃত্রিম সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়া কৃত্রিম বেশে ও কৃত্রিম ভূষায় সজ্জিত করিয়া সংস্কৃত শোভন ও সুন্দর করিয়া সংসারক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করাই ব্রাহ্মণ-প্রণীত শাস্ত্রের বিধানের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সর্বত্র ফললাভ করিয়াছে কিনা সে পৃথক কথা; কোন বিধানের দেশকাল পাত্রভেদে পরিবর্তন আবশ্যক কিনা সে স্বতন্ত্র কথা। এই সকল কৃত্রিম বিধানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অযথা সংযম ঘটিতে পারে, সংকীর্ণতার প্রশ্রয় হইতে পারে, এ সকলও আমি অস্বীকার করিতে পারিব না।'

সুতরাং সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে একটা সামঞ্জস্যই রামেন্দ্রসুন্দর চিন্তা করেছিলেন। 'বর্ণাশ্রম ধর্ম' ইত্যাদির যে কল্পনা সেকালে দেখা গিয়েছিল, রামেন্দ্রসুন্দর চলেছিলেন তারই অনুকূলে। সমাজ বলতে যদি একটা ব্যাপক অর্থ বোঝায় তবে ব্যক্তিকে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধন করে চলতে দিতে কারোই কোনো মতবৈষম্য থাকবে না। কিন্তু সমাজ ও সামাজিক আচার বলতে যখন সম্প্রদায়কেই বুঝিয়েছে তখন মতের বাধা হয় দুস্তর। 'কর্মকথা'র সমালোচনা করে অজিতকুমার চক্রবর্তী লিখেছেন[২]—

'মানুষের স্বাধীন প্রবৃত্তি যদি স্বাভাবিক উপায়ে নিবৃত্তিমার্গে উপনীত হয় তবে

১ 'কর্মকথা', 'আচার'

২ অজিতকুমার চক্রবর্তী, 'বাতায়ন', 'কর্মকথা,' পৃ ১২৩

তাহা সত্য হয়—তবেই তাহাতে প্রাণ আপনাকে প্রকাশ 'করে। কিন্তু যদি কৃত্রিম আচারের দ্বারা মানুষকে জবরদস্তি করিয়া নিবৃত্তি সাধন করানো হয় তবে নিবৃত্তিপ্রাণতা ঘুচিয়া গিয়া নিবৃত্তিজড়তাই রাজত্ব করিতে থাকে। মানুষ আর মানুষ থাকে না, সে পাথরের সমান হইয়া যায়। সে তখনই জড়তাকেই মুক্তি বলিয়া মনে করে, অভ্যাসের পাকে ঘুরিয়া বেড়ানোকেই মস্ত চলা বলিয়া ভ্রম করে।'

রামেন্দ্রসুন্দরের বক্তব্যের পথে যে কঠিন যুক্তিপরম্পরা এবং সূক্ষ্ম বিচারণা ছিল সমালোচক সেগুলিকে উপেক্ষা করে সহজ বুদ্ধিতে বাস্তবক্ষেত্রে যা ঘটতে দেখেছেন তাই দিয়েই রামেন্দ্রসুন্দরকে প্রতিবাদ করেছেন। এক অর্থে অজিত চক্রবর্তীই ঠিক। বিকৃতিকে চোখের সামনে দেখলে প্রকৃতি সম্বন্ধেই সন্দেহ জাগে। সমাজ-প্রকৃতিকে রামেন্দ্রসুন্দর যুক্তি দিয়ে যেভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সেভাবে তার নিরর্থকতা প্রতিপন্ন না করে বিকৃতির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে সহজ জ্ঞানে এর প্রকৃতিকেই শূন্যগর্ভ বলা হয়েছে। সর্বজনগ্রাহ্যযুক্তির জায়গায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধক চিন্তার লক্ষণ এখানে পাওয়া যায়। লোকহিতের আদর্শ সম্বন্ধেও তিনি বলেছেন—

'বর্ণাশ্রম ধর্ম বা আনুগত্যের আদর্শ এ কালে চলিবে না। এই পূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আদর্শই আমাদের দেশে এখন একান্তই চাই। আশা করা যায় যে ইউরোপের কিছুকালের অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ইতিহাসের শিক্ষা আমাদিগকে ইহার বিকৃতি হইতে রক্ষা করিবে।

'সেইজন্য নূতন করিয়া লোকহিতসাধনের আদর্শের পত্তন করিতে হইবে।

'লোকহিতসাধন মানে লোকের উপকার করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করা নহে, লোকের শক্তিকে জাগানো—লোকের এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সম্যক উদ্বোধন।'[১]

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ এবং এই আদর্শ যে সম্পূর্ণ এক, এটা লক্ষণীয়। অজিত চক্রবর্তী রামেন্দ্রসুন্দরকে স্থিতিশীল সমাজের মুখপাত্র বলে ধরে নিয়েছিলেন এবং স্থিতিশীল সমাজ হচ্ছে সমাজতন্ত্রবাদী আর গতিশীল সমাজ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী।

১৯১৪তে যখন 'কর্মকথা' প্রকাশিত হয় বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে জাতীয় উন্মাদনা তখন অনেকটাই শান্ত হয়ে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ রাজনীতি থেকে সরে এসেছেন। নতুন চিন্তাধারা দেখা দিয়েছে। প্রাচীন ভারতের আকর্ষণ কমে এসেছে। সমসাময়িক ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে। এখানেই শেষ নয়। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি পড়েছে ইউরোপীয় সমাজের উপর। বিশ্বমানব সম্পর্কে এক নতুন কৌতূহল

১ অজিতকুমার চক্রবর্তী, 'লোকহিতের আদর্শ' (১৩২১)

'পথের সঞ্চয়'এর রচনায় দেখা যাচ্ছে। বিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারা হিন্দু অথবা বাঙালী সমাজকে অতিক্রম করে সর্বমানবিক অনুভূতিলোককে স্পর্শ করবার উপক্রম করল। প্রথম মহাযুদ্ধ এবং গান্ধীজির আফ্রিকায় আন্দোলন আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে নিয়ে গেল মানবসমাজের মর্মকেন্দ্রে। সমাজের সীমা যখন ভেঙে যাচ্ছে, তখন আর সমাজানুগত্যের আদর্শ আঁকড়ে ধরে থাকলে কি হবে? মানুষ এখন কোনো সামাজিক বা রাজনৈতিক শাস্ত্রের নির্দেশ মেনে চলতে পারে না। তার কর্তব্য সে নিজের বিচার দিয়েই স্থির করে নেবে। অজিত চক্রবর্তী এই নতুন জাতির কথাই বলেছেন। প্রমথ চৌধুরীর অধিনায়কতায় 'সবুজপত্র' এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী চিন্তাভঙ্গির প্রবর্তন ব্যাপক করে তুলল। পরবর্তীকালে বিশেষ করে যে দুজন এই চিন্তাধারার নেতৃত্ব করেছেন তাঁরা হচ্ছেন পরলোকগত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়।

রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর শেষজীবনে এর সূচনা দেখতে পেয়েছিলেন। এই বিশুদ্ধ জ্ঞানপন্থীর মনের উপর সামাজিক সমস্যা কি রকম ছায়া ফেলেছিল জানি না। জ্ঞানের দিক্ দিয়ে তিনি পৃথিবীর দিকে তাকিয়েছিলেন। হয়তো শ্রেণীগত মানুষের ধারণা বদলে গিয়ে ব্যক্তিমানুষের ধারণার অভ্যুত্থানের ফলে চিন্তা ও অনুভূতির নৈরাজ্যবাদের সঙ্কেত তিনি পেয়েছিলেন। এই সময় রামেন্দ্রসুন্দরের জ্ঞানের তপস্যা এক নতুন লক্ষ্যের সন্ধান দিল। 'বিচিত্র জগতে' (১৩২১-১৩২৮) একদিকে তিনি ঘোষণা করলেন 'প্রজ্ঞার জয়' আর একদিকে সন্ধান দিলেন গড়-মানুষের (average man)[১]—

'ইন্দ্রিয়ের উপর বিশ্বাস করিবার উপায় নাই। আগেই বলিয়াছি বৈজ্ঞানিককে বহু লোকের সাক্ষ্য সংগ্রহ করিতে হয় স্পষ্টত যাহারা অসুস্থ একেবারে তাহাদিগকে বর্জন করিয়া বহুসংখ্যক সুস্থ প্রকৃতিস্থ মাঝারি মানুষের সাক্ষ্য লইয়া average কষিতে হয়। বহু লোকের average কষিয়া একটা কাল্পনিক Mean Man খাড়া করিতে হয় এবং সেই কাল্পনিক Mean Man বাহ্য জগতের যে পরিচয় দিবে তদনুসারে তাঁহাকেও বাহ্য জগতের পরিচয় দিতে হয়, কিন্তু এই Mean Manও যেমন কাল্পনিক তিনি যে জগতের পরিচয় দেন সে জগৎটাও তদনুসারে ততটা কাল্পনিক।'

একালের বহুব্যক্তিবাদ, চলৎব্যক্তিত্ববাদ, অস্তিবাদ মানুষের চিন্তা ও অনুভূতিকে শতধা বিদীর্ণ করেছে; এ যুগে রামেন্দ্রসুন্দরের গড়-মানুষের কল্পনা কতখানি সত্য, নতুন করে তার সন্ধান প্রয়োজন।

১ 'বিচিত্র জগৎ', 'জড়-জগৎ'

উল্লেখ-সূচী

এতে কেবল ব্যক্তি, প্রবন্ধ এবং গ্রন্থের উল্লেখ নির্দেশ করা হল। বিশেষ প্রয়োজনীয় বোধে কয়েকটি সংস্থাও তালিকাভুক্ত করা হল। প্রবন্ধের নাম উদ্ধৃতি-চিহ্নাঙ্কিত। ইংরেজি প্রবন্ধ ও গ্রন্থ ইংরেজি অক্ষরে এবং অবাঙালি হলেও লেখকের নাম বঙ্গাক্ষরে দেওয়া গেল।